(কাভার পৃষ্ঠা)

খ্রিস্ট যে তুমি

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির নবায়ন

(প্রচ্ছদ)

বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সি.এস.সি.

চট্টগ্রামের বিশপ (১৯৫২-১৯৬৭)

(ব্লাঙ্ক পৃষ্ঠা – কাভারের পেছন)

(ব্লাঙ্ক পৃষ্ঠা)

(ব্লাঙ্ক পৃষ্ঠা)

(ভেতরের কাভার পৃষ্ঠা)

খ্রিস্ট যে তুমি

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির নবায়ন

(প্রচ্ছদ)

বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সি.এস.সি.

চট্টগ্রামের বিশপ (১৯৫২-১৯৬৭)

প্রকাশনা তথ্য

মুল গ্রন্থ: **The Christ That You Are :**
The Aggiornamento of Spiritual Outlook

By: Bishop Raymond Larose, CSC, DD
Bishop of Chittagong (1952-1967)
Cyclostyled Manuscripts
Date: 22nd July 1967
(Golden Jubilee of His Entrance to the Novitiate)

অনুবাদক: **মন্টু ডি'কস্তা**
ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদনায়: **কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি**

বর্ণবিন্যাসে: **এল.এইচ.সি. সিস্টারগণ**

অঙ্গসজ্জা: **জেমস গোমেজ**

প্রকাশক: **মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ**
৫নং সদর রোড, বরিশাল ৮২০০

স্বত্বাধিকার: **মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ**

প্রকাশনা কাল: ২২শে জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ: মূলগ্রন্থ রচনার ৫৬তম বার্ষিকী

মুদ্রণে:

শোভন মূল্য:

প্রাপ্তিস্থান: **মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ**
৫নং সদর রোড, বরিশাল ৮২০০

সূচিপত্র

ধর্মপালের বাণী
প্রধান অধ্যক্ষার বাণী পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা
প্রাক-কথন
অবতরণিকা

প্রথম ভাগঃ পরিত্রাণের নিগূঢ় রহস্য
সর্বপবিত্র ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর
দেহধারণের নিগূঢ় রহস্য
পরিত্রাণের নিগূঢ় রহস্য
পুনরুত্থান - পবিত্র আত্মার যুগ
স্বর্গলোক
স্বর্গের সূচনা
স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার পথ

দ্বিতীয় ভাগঃ খ্রিস্টমণ্ডলী – খ্রিস্টীয় জীবন – ঐশ্বরিক গুণাবলি
খ্রিস্টমণ্ডলী ঃ খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহ
নিগূঢ় দেহ
সর্বজনীন পবিত্রতা
খ্রিস্ট-ভক্তজনগণের যাজকত্ব
খ্রিস্টীয় জীবন
ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্বাস সক্রিয়
বিশ্বাস এবং কর্ম
মিশনারি প্রেরণা

তৃতীয় ভাগঃ খ্রিস্টীয় মনোভাব ও আধ্যাত্মিকতা
বাইবেল ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা
প্রকৃত বাস্তববাদ
যিশুর হৃদয়ের ঐশতত্ত্ব
প্রভুর দাসী
কার্যকরী আধ্যাত্মিকতা
ইচ্ছাশক্তির সিদ্ধতা
আমাদের জীবনে খ্রিস্টযাগ
ভক্তিমূলক পাপস্বীকার

চতুর্থ ভাগ : ধর্মপ্রদেশ ও পালকীয় নির্দেশনা
ধর্মপ্রদেশের নীতি-নির্দেশনা
একসঙ্গে কাজ করার মনোভাব

মূল গ্রন্থের ইংরেজী পবন্ধের তালিকা

মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের পরিচিতি

বিশপ রেমণ্ড লারোজ সিএসসি-এর জীবন-বৃত্তান্ত

ধর্মপালের বাণী

প্রধান অধ্যক্ষার বাণী

বিশপ রেমন্ড লারেজ সিএসসি – আমাদের কাছে যার প্রথম পরিচয় তিনি আমাদের সংঘ-পিতা। মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। বিশপ লারোজ একজন ঐশ্বতত্ত্ববিদ, জ্ঞান পিপাসু। তিনি ঈশ্বরকে পেয়েছেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর The Chittagong Letter নামে ধর্মপ্রদেশে একটি নিউজ লেটারের যাত্রা শুরু হয়। বিশপীয় দায়িত্ব গ্রহণের ছ'বছর পরে আর দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পাঁচ বছর আগে। নিউজ লেটারের কয়েকটি সংখ্যার পর প্রায় নিয়মিত ভাবেই আধ্যাত্মিক জীবন, খ্রিস্টীয় জীবন ও খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তার অনুধ্যানগুলি প্রকাশ করে গিয়েছেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তার লেখাগুলি একত্র করে বইয়ের আকারে বের করা হয়। কাকা বাবু নামে খ্যাত একজন Lay Missionary, Mr. Macanarny ছিলেন Chittagong Letter এর সম্পাদক। এই ভদ্রলোক এক সময়ে বরিশাল জেলার ডিষ্টিক কমিশনার ও পরে বরিশাল বি.এম.কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন।

বিশপ লারোজ Chittagong Letter এর প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মটো *"ভালবাসার পথধরে আলোর অভিমুখে"* তিনি শুধু তাঁর নিজের জীবনের জন্যই নয় বরং ধর্মপ্রদেশ-পরিচালনা, মিশনারি, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ খ্রিস্টভক্ত, এমনকি দূরদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী দাতা বন্ধুদের জন্যও মটোটি বেছে নিয়েছেন।

তাঁর বইয়ের লেখায় প্রকাশ পায় তিনি অসংখ্য বই পড়েছেন। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। অনেক গভীর জ্ঞান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের পরিচয় তিনি লাভ করেছেন। মানবজীবনের যাত্রায় ঈশ্বর কে, ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার, স্বর্গ কী, পবিত্র ত্রিত্ব কী, প্রেরণকাজে অংশগ্রহণ, মা-মারীয়ার নম্রতা, পাপী হয়েও কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়, খ্রিস্টের দেহধারণ রহস্যের বাস্তবায়ন করা যায়, সর্বোপরি ইহজগত ও পরজগতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের সুনির্দিষ্ট নিমন্ত্রণ রয়েছে বিশপের লেখায়। সত্যিই তিনি একজন খাঁটি প্রবক্তা। যিনি আন্তরিক ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। বর্তমান সিনোডাল চার্চ এর স্বপ্ন তিনি অনেক আগেই দেখেছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তার আধ্যাত্মিক পিতা ফাদার মরোর কাছ থেকে পাওয়া Team Spirit এর ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। একসাথে কাজ করার পক্ষে তিনি হচ্ছেন আমাদের অনুপ্রেরণা।

তিনি নিজে যে মুক্তার সন্ধান পেয়েছেন সেই মুক্তা সকল স্তরের সকল বিশ্বাসীকে উজার করে দিয়েছেন যেন সকলেই সেই মুক্তা লাভ ক'রে নিজ জীবনকে উজ্জ্বলতায় পবিত্র করে তুলতে প্রয়াসী হয়। আমার দৃঢ় প্রত্যাশা যে, প্রতিষ্ঠাতার ধ্যানপূর্ণ ও জ্ঞানপূর্ণ এই বইয়ের প্রতিটি বিষয় মনোযোগসহ আমরা পাঠ করব এবং প্রতিটি বিষয় থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করব; তা আমাদের আত্মাকে শান্তি ও মুক্তির আনন্দে সুসজ্জিত করতে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে ঈশ্বর তার দিকে দৃষ্টিপাত করে স্বর্গের কৃপারাশি প্রচুর পরিমাণে তার ওপর বর্ষণ করবেন। এই কৃপারাশি দিনের পর দিন উজ্জ্বল হয়ে পবিত্রতায় পরিণত হবে আর আমরা পবিত্র ও খাঁটি সন্ন্যাসী হয়ে উঠব।

সংঘের অষ্টম সাধারণ সভা থেকে প্রতিষ্ঠাতার জীবনী লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাবনা চলে আসছে (১১-১৭ মে ২০০৪ খ্রি:), ৯ম সাধারণ সভা ২১-২৬ জুলাই-২০০৮ খ্রি: একই প্রস্তাবনা আবার করা হয়েছে। অতঃপর সংঘের আশু চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা পালন করছেন আমাদের প্রাক্তন প্রধান অধ্যক্ষা, সংঘের কর্ণধার সিস্টার আরতি ডি'কস্তা, এলএইচসি। বিশপের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন, তাঁর প্রতি অনুরাগ সব কিছু নিয়ে তিনি ভাবতেন ও সহভাগিতা করতেন। তাই তিনি বিশপের লেখাগুলি বাংলায় অনুবাদ করার প্রস্তাব করেন এবং কিছু কিছু অংশ প্রারম্ভিক অনুবাদ করে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছেন। তার এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য আমি তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পরবর্তীতে সিস্টার আরতি, সংঘের পক্ষ হয়ে, তার ভাই মন্টু ডি'কস্তাকে অনুবাদের কাজটি করার জন্য অনুরোধ করেন। আমি গভীরভাবে আনন্দিত যে, বইটির অনুবাদের কাজে মি: মন্টু ডি'কস্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, এলএইচসি সংঘের জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছেন এবং তিনি আপন করে নিয়ে ভাইয়ের পরিচয় দান করেছেন। একজন ফ্রান্সভাষী ব্যক্তির ঐশ্বতাত্ত্বিক ধ্যান, ইংরেজী থেকে বাংলা করা একটি দুরূহ কাজ ছিল। আর তিনি অনেক যত্ন, অধ্যাবসায় ও বিচক্ষণতা দিয়ে সে কাজটি করেছেন। তার এই নিরলস দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য আমরা এলএইচসি সংঘ মি: মন্টু ডি'কস্তার কাছে চির ঋণী ।

আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমাদের মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র প্রতি। তিনি তার মুল্যবান সময় ব্যয় করে অতীব যত্ন সহকারে ভাষাগত ও ঐশতাত্ত্বিক শব্দের যথার্থ ব্যবহার এবং বিষয়বস্তু বিন্যাস করে গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্ব স্ব-উদ্যোগে গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের পাশে থেকে সাহস, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহোযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আন্তরিকতার সাথে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংঘের নামে আমি কার্ডিনাল মহোদয়কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তার কাছে আমরা যে ঋণী তা কৃতজ্ঞ অন্তরে ও আনন্দের সাথে স্বীকার করছি।

সংঘের বেশ কয়েক জন সিস্টার বইটি প্রকাশনায় কম্পিউটার কম্পোজ, বানান-সংশোধন, অক্ষর বিন্যাস, ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য অনেক শ্রম দান করেছেন। তাদের প্রতিও আমার ধন্যবাদের ডালি নিবেদন করি।

পরিশেষে বিশেষ ভাবে মি. জেমস গোমেজকে আমাদের কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চাই, কারণ তিনি গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা ও ছাপানোর কাজে তদারকির জন্য শত ব্যস্ততার মধ্যেও অনেক সময় ও শ্রম দিয়েছেন।

আমার ঐকান্তিক আশা যে, আমরা এলএইচসি সংঘ তথা সকল স্তরের জনগণ এই বইটি পড়ার আগ্রহ রাখব ও ঈশ্বরের প্রত্যাশিত মুক্তির স্বাদ সকলেই পাব।

খ্রিস্টেতে,

সিস্টার রিনা পালমা, এলএইচসি
প্রধান অধ্যক্ষা
মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ

অনুবাদকের কথা

প্রথমেই আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই

স্বর্গীয় ফাদার ম্যাথু শিলিংস এস.জে.-কে

অনুবাদের কাজে তার কাছে আমার হাতেখড়ি এবং তারই অসীম ধৈর্য্য ও যত্নে ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ।

এরপর আমি নিঃসংকোচে এবং বিনিতভাবে স্বীকার করছি যে, *The Christ That You Are* বইটির অনুবাদে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আর যদি বা সামান্যতম কৃতিত্ব থেকেও থাকে তবে তা লোহিত সাগর ভাগ করে তার মধ্য দিয়ে পথ তৈরী করার ক্ষেত্রে মোশীর লাঠির যে কৃতিত্ব ছিলো এই অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার কৃতিত্বও ততটা। আর সেই কৃতিত্ব যদি ১শতাংশও হয়, তবে তার বেশীর ভাগ তাদের, যারা আমার এই অনুবাদের কাজে সাহায্য করেছেন:

সিষ্টার আরতি এল.এইচ.সি. অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মূল লেখার প্রতিটি বাক্য আমার অনুবাদের সাথে মিলিয়ে প্রয়োজনে নিজ মতামত দিয়ে ভাষার আড়ষ্ঠতা ও জটিলতা ধরিয়ে দিয়ে সহজ সরল ভাষায় সাবলীল করে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

এল.এইচ.সি. সংঘের কয়েকজন সিষ্টার অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমার দূর্বোধ্য হাতের লেখা, যা কাটাকাটি করতে করতে এমন এক অবস্থায় পৌছায় যে, আমি নিজে তা দ্বিতীয়বার পড়তে গেলে পদে পদে হোঁচট খাই, সেই লেখা পাঠোদ্ধার করে কমিম্পউটারে টাইপ করে পাঠযোগ্য করে তুলেছেন।

এদিকে মূল লেখা পড়তে গিয়ে দেখা যায় "যিশু হৃদয়ের ঐশতত্ত্ব" রচনাটি ফরাসী ভাষায় লেখা। এই অধ্যায়টি ফরাসী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় ফাদার গিলবার্ট লাগু, সিএসসি। আমি তাকে চিনি না, তবে যিশু তাকে চিনেন। সেই ইংরেজী লেখা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সি.এস.সি। শুধু তাই নয় "সর্বজনীন পবিত্রতা" অধ্যায়ের শেষ অংশটি তিনিই অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও তিনি বাংলা পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পুংখানুপুংখরূপে পাঠ করে প্রতিটি বাক্য মূল লেখার সাথে মিলিয়ে ত্রুটিহীন করতে নানা শব্দ, বাক্য, সংযোজন ও সংশোধন করেছেন যাতে তা কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুযায়ী হয়।

এছাড়াও আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি শ্রদ্ধেয় ফাদার জো, ডি'সুজা এস.জে, প্রভু যিশুর গীর্জার দীলিপ গমেজ এবং ড: গৌতম পাল – এদের কাছ থেকে।

এত গেলো ১শতাংশের কথা – বাকি ৯৯ শতাংশ পবিত্র আত্মার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং প্রজ্ঞার আসন, মাতা মারীয়া ও স্বর্গীয় বিশপ লারোজের আর্শীবাদ, আর প্রভুর এই আশ্বাস বানী – তোমাকে কিছুই করতে হবে না, তুমি শুধু খাতা কলম নিয়ে বস, বাকিটা আমি দেখব। আসলে আমাদের সকলকেই প্রভু যিশু এই আশ্বাস বাণী দেন যখন তিনি কোন দায়িত্ব দেন। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি ভুলত্রুটি কিছু থেকে থাকে তার কৃতিত্ব ষোলআনাই আমার।

শেষ কথা – *The Christ That You Are* বইটি পাঠ করে অনুভব করেছি বিশপ লারোজ আধ্যাত্মিকতার সোপান পেরিয়ে যে স্তরে উর্ত্তীন হয়েছিলেন, আমাদের মত সাধারণ সাংসারিক মানুষদের সেখানে পৌঁছানো কঠিন হলেও দুঃসাধ্য নয়। উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সাংসারিক ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতার এক সুনিপুন মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন জামা কাপড় পরা, চুল আচড়ানো – এসব দৈনন্দিন মামুলী কাজও কীভাবে প্রার্থনা হয়ে উঠতে পারে।

বইটির বাংলা অনুবাদ পাঠ করে পাঠকের মনে শ্রদ্ধেয় বিশপ লারোজের আধ্যাত্মিকতার সামান্যতম অনুভূতি যদি জাগে তাহলেই অনুবাদের কাজে হাত লাগানো সংশ্লিষ্ট সকলেরই পরিশ্রম সার্থক হবে।

মন্টু ডি'কস্তা

প্রাক-কথন

"খ্রিস্ট যে তুমি" বইটির শিরোনামই সংক্ষেপে বলে দিচ্ছে আমার পরিচয়, খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমার পরিচয় – আমি খ্রিস্ট। খ্রিষ্টেতে দীক্ষিত হয়ে আমি যে হয়ে উঠেছি "খ্রিস্ট" আর সবাই মিলে আমরা হয়েছি "খ্রিস্টরা" যেমন বলেছেন সাধু আগস্তিন। এই নামটির মধ্যে নিহিত আছে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে নবায়িত হওয়ার আহ্বান হচ্ছে বইটির উপ-শিরোনাম: ***"আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির নবায়ন"***। বইটির নামের মধ্যে মরমীবাদের একটি স্পষ্ট ভাব রয়েছে। খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান, খ্রিস্ট ও ভক্ত, বর ও বঁধু, প্রভৃতির মধুর মিলনের একাত্মতা, পরস্পরের সাথে এক ও একাকার হয়ে যাওয়ার অভিপ্রকাশ- এর মধ্যে রয়েছে।

বইটির রচয়িতা হচ্ছেন একজন কানাডাবাসী পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক, বাংলাদেশের একজন আজীবন মিশনারী পুরোহিত (১৯২৬-১৯৮৪), পরবর্তীতে যিনি ছিলেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ (১৯৫২-১৯৬৭)। নাম তাঁর বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি। কানাডা দেশের কুইবেক অঞ্চলে, সেন্ট হাইয়াসিন্থ নামে খ্যাত একটি মিশনারী-ধর্মপল্লীতে তাঁর জন্ম ১০ই জানুয়ারি, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। রেমণ্ড লারোজ পবিত্র ক্রুশ সংঘের নবিশিয়েটে প্রবেশ করেন ২২শে জুলাই, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। নবিশিয়েটে প্রবেশের পঞ্চাশ বছর-পূর্তিতে (২২ জুলাই ১৯৬৭ খ্রি.) বিশপ লারোজ ***"খ্রিস্ট যে তুমি"*** বইটি ইংরেজিতে টাইপ করে প্রকাশ করেছেন কিন্তু কোন দিন বইটি মুদ্রিত হয় নি।

ফাদার রেমণ্ড লারোজ সিএসসি ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যাজকীয় পুণ্যপদে অভিষিক্ত হন এবং চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস হওয়ার এক বছর পূর্বে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৃহত্তর ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নারিকেলবাড়ি প্যারিশের পালপুরোহিত ছিলেন। কানাডার ফরাসী-ভাষী পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক-প্রভিন্সের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট -এর তিনি সুপিরিয়র ছিলেন ১৯৩৮-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়োর, সিএসসি-এর উত্তরসূরি হিসেবে ফাদার রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি, চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের বিশপ রূপে ২রা জুলাই, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূণ্যপদে অভিষিক্ত হন। বিশপীয় জীবনে তাঁর মটো ছিল : "ভালবাসার পথধরে আলোর অভিমুখে"। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং ষোল বছর ধ্যানী জীবনযাপন করার পর ১৭ই মে, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামে ৮৭ বছর বয়সে, ৫৮ বছরের একজন স্বনামধন্য মিশনারি হিসেবে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন এবং বাংলার বুকে শায়িত হন। তাঁর জীবনের এই ক্ষুদ্র আলেখ্য সাক্ষি দেয় তাঁর লিখনীতে প্রকাশিত চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তবতা এবং জীবনের বিশাল অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট।

আরেকটি মহৎ ঘটনা না বললেই নয়। বাংলাদেশের মানুষের ভাষা, সঙ্গীত, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মবোধ, সামাজিক কাঠামো, অধ্যাত্মবাদ তিনি জেনেছেন, অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তারই প্রেক্ষিতে তিনি মণ্ডলীর নির্দেশনা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মণ্ডলীর প্রতি পবিত্র আত্মার একটি বিশেষ দান – "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ" নামে একটি সন্ন্যাসব্রতী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টার আলফন্স লিগোরী, সিএসসি-এর নিকট পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তীতে তিনি মাদার আলফোন্স নামে পরিচিত হন এবং সংঘের সহ-প্রতিষ্ঠাত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এই সন্ন্যাস সংঘটিকে বিশপ লারোজ দেখতে চেয়েছেন সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টীয় এবং সম্পূর্ণভাবে দেশীয় রূপে। এই পুস্তকটির লেখাগুলি পাঠ ও সম্পাদনা করতে গিয়ে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি, কী চিন্তা ও ভাবনা রচয়িতার মধ্যে ছিল যা "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ" প্রতিষ্ঠায় অভিব্যক্ত হয়েছে! অথচ তিনি একবারও তাঁর এই রচনায় সংঘটির নাম উল্লেখ করেন নি। এটি বলতেও আমি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করি না যে, "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ"-এর মূল আধ্যাত্মিকতা এই পুস্তিকাটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আধ্যত্মিকতার ঐশতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং বাস্তবতা-ভিত্তিক – এই তিনটি দিক বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করা হয়েছে।

তাঁর গ্রন্থ পাঠে আমার কাছে এটা খুবই স্পষ্ট যে, তিনি ছিলেন একজন ঐশতত্ত্ববিদ। বিগত শতাব্দীর চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাট দশকের ঐশতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে যে সমস্ত খ্যাতনামা ঐশতত্ত্ববিদ ছিলেন এবং যে ঐশতাত্ত্বিক ভাবজগতে তাঁরা বিচরণ করছিলেন তা যেন বিশপের কাছে সবই জ্ঞাত, অনায়াসে তিনি তাদের কথা বলেছেন, তাদের চিন্তাধারা উল্লেখ করেছেন; স্বাচ্ছন্দে তাদের ভাবনায় বিচরণ করে তিনি খুবই সহজভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। অসাধারণ তাঁর জ্ঞান ও প্রকাশ নৈপুন্য।

সৌভাগ্য বিশপ লারোজের যে, তিনি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার প্রতিটি অধিবেশনে (১৯৬২-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মোট চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়) যোগদান করেছেন। এই পুস্তিকার প্রতিটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। আজ এতো বছর ধরে আমরা দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার যে শিক্ষাগুলো বলার চেষ্টা করছি সেগুলো যেন বিশপ লারোজ ঐ সময়ে খুবই সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর লেখার এমন একটি প্রবন্ধ নেই যেখানে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা, প্রভাব ও প্রেরণা তুলে ধরা হয়নি।

শ্রদ্ধেয় বিশপ লারোজ যে একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ও মরমী সাধক তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। এই গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর আধ্যাত্মিক ও মরমী চিন্তাধারা মণ্ডলীর পিতৃগণ, মণ্ডলীর মহান সাধু-সাধ্বীগণ, এবং বিশেষ করে মরমী সাধু-সাধ্বীগণের চিন্তা, ভাব ও উক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাদের মধ্যে ছিলেন সাধু আগস্তিন, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, ক্রুশভক্ত সাধু যোহন, আভিলার সাধ্বী তেরেজা,

ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা প্রমুখ আরও অনেকে। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের নিগুঢ় রহস্য ব্যক্ত করতে গিয়ে মানবদেহধারী খ্রিস্টের পরে সর্বোচ্চ স্থান তিনি দিয়েছেন কুমারী মারীয়াকে যিনি ছিলেন প্রভুর দাসী। তাছাড়া ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক ও পারস্পরিকতা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর আলোচনার মধ্যে।

"খ্রিস্ট যে তুমি" *গ্রন্থে* রচনা ও বাচনভঙ্গির যে স্টাইলটি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তা হল সংলাপ। কোনো সময় ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যিশু, কোনো সময় ঈশ্বর ও ভক্তজন, আবার কোনো সময় বিশপ লারোজ ও পাঠক-এর মধ্যকার সংলাপ, কথোপকথন ও আলোচনায় একটা স্বাভাবিক স্টাইল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপের এই স্টাইলটি বিষয়বস্তুর আলোচনা সহজ, মধুর ও বোধগম্য করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উদ্ধৃতির কোন চিহ্ন নেই অথচ উক্তির মাধ্যমে সংলাপ চলছে অনর্গল। রচনার এই স্টাইল আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মণ্ডলীতে আরেকটি ধারা আর সেটা হল ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে ঐশপ্রত্যাদেশ ব্যক্ত করার ধারা। এই স্টাইল শুধু বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গি নয় বরং এটি হচ্ছে পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্ক, অনেকটা মরমী সম্পর্ক এবং ঐশপ্রকাশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন আর সেটা হচ্ছে ঐশতাত্মিক ও ধর্মতাত্ত্বিক গভীর সংলাপের উপসংহারে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে ভক্তের অন্তর থেকে প্রার্থনা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা, যা হয়ে উঠেছে তার যোগ্য সাড়াদান, সম্মতি বা আমেন। এই বিশেষত্বটাও আমাকে আকর্ষিত করেছে অনেক।

অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু না বললে আমার কথা অপূর্ণ থেকে যাবে। অনুবাদক মন্টু ডি'কস্তা একজন দক্ষ অনুবাদক। তাঁর অন্যান্য অনুদিত গ্রন্থ আমি পড়েছি। সেগুলো অনুবাদ বলে মনে হয় না বরং যেন নিজের কথারই সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। তবে ***"খ্রিস্ট যে তুমি"*** অনুবাদ করতে গিয়ে হয়তো তাঁকে অনেক হিমশিম খেতে হয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ও অনেক শ্রম তাকে দিতে হয়েছে, কারণ আদি রচনার মধ্যে আছে লম্বা লম্বা বাক্য, একাধিক ভাষার মিশ্রন (ইংরেজী, লাতিন, ফরাসী) ও শব্দচয়ন, বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং মাণ্ডলিক পরিভাষার স্বতন্ত্রতা। একজন পাঠক ও সম্পাদনার কাজে সাহায্যকারী হিসেবে আমিও সে সমস্যাটা উপলব্ধি করেছি। তবে কষ্টসাধ্য হলেও অনুবাদক কাজটি সম্পন্ন করেছেন এবং ভালোভাবেই তা করেছেন। এ কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন সিস্টার আরতি এল.এইচ.সি, যিনি তার উদ্যোগ ও শ্রম, রচনার সংশোধন ও পরিশোধন, দুই বাংলা ভাষার মধ্যে মিলন সৃষ্টি, ইত্যাদি দ্বারা অনুবাদককে অনেক সহায়তা দিয়েছেন।

ইংরেজীতে লেখা আদি রচনায় প্রতিটি প্রবন্ধ এক একটি বিষয় হিসেবে, কোনো ধারাবাহিকতা ব্যতীত তালিকাভুক্ত ছিল। পাঠকের সুবিধার্থে সব প্রবন্ধগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে এই *গ্রন্থে* সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

পরিসমাপ্তিতে, আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি খুবই সংক্ষেপে ব্যক্ত করার সুযোগ নিচ্ছি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লারোজকে ব্যক্তিগত ভাবে তেমন একটা চিনতাম না। তবে স্মরণ আছে বিগত শতাব্দির পঞ্চাশ ও ষাট দশকে তিনি যখন পাদ্রীশিবপুরে আসতেন তখন শ্রীমঙ্গ নদীর ঘাট থেকে গান-বাজনা করে গির্জায় বরণ করে নিয়ে আসতাম এবং তাঁরই হাত থেকে হস্তার্পন সংস্কার গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সোনাতলাসহ দক্ষিণ অঞ্চলে যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হয়েছিল সেখানে আমি নিজেও আক্রান্ত হয়েছিলাম। উক্ত বিধ্বস্ত এলাকা থেকে প্রায় ২৩টি পরিবার পাদ্রীশিবপুরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরকে গ্রহণ করার এবং বাসের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সুদূর চট্টগ্রাম থেকে পাদ্রীশিবপুরে আসেন। তাঁর উপস্থিতির স্মৃতি আজও চোখের সামনে ভাসছে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘে শেষব্রত গ্রহণ করার পর লাজারুস ও আমি ডিকন পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য চট্টগ্রামে যাই। তৎকালীন কার্যরত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সি.এস.সি.-এর সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধেয় বিশপ লারোজ কর্তৃক ডিকন হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

পরবর্তীতে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন পাদ্রীশিবপুরে অবসর জীবন যাপন করছিলেন তখন আমি সাময়িকভাবে পাল-পুরোহিত ছিলাম এবং চট্টগ্রাম পবিত্র ক্রুশ ডিসট্রিক্টের ফাদারদের সুপিরিয়র ছিলাম। একসঙ্গে দশ মাস একই যাজকগৃহে বাস করেছি। সেই সময়ে তাঁকে দেখেছি ধ্যানী, প্রার্থনাশীল, বিনম্র, অনুগত একজন অবসরপ্রাপ্ত ধর্মপাল এবং একই সময়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন সদস্য।

ওপরের কথাগুলো বলার পেছনে যে কারণটা আছে তা হল আমি যতনা ***"খ্রিস্ট যে তুমি"*** বইটি পড়ে বিশপ লারোজকে জেনেছি তাঁর চাইতে অনেক কম চিনেছি তার পূর্বে। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ও আধ্যাত্মিক মহান পুরুষ, একজন ধর্মপাল যিনি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ পালক, যিনি ছিলেন ঐশতত্ত্ববিদ ও অধ্যাত্ম সাধক, যিনি মণ্ডলীর শিক্ষাপরম্পরার ওপর দাঁড়িয়ে নতুনকে আপন করে নিয়েছেন এবং তা গভীর প্রত্যয়ের সাথে তৎকালীন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলার সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়ে জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, কাঠামো-অবকাঠামো, কর্মকাণ্ড ও পদ্ধতি, আধ্যাত্মিকতা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সংস্কৃত্যায়নের একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করে গেছেন। এই সবকিছুর কারণে বিশপ লারোজের এই *গ্রন্থ* থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি যা আগে জানতাম না, নতুন অনেক কিছু শিখেছি যা পূর্বে আয়ত্ত করতে পারিনি, অনেক প্রেরণা পেয়েছি বৃহত্তর চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশকে নতুন করে দেখতে ও উপলব্ধি করতে।

সর্বোপরি "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ"-টি পবিত্র আত্মার যে কত ব্যতিক্রমধর্মী দান, এই দানের ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তি যে কত শক্ত এবং এর আধ্যাত্মিকতা যে কত গভীর, স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য এ দানের গুরুত্ব যে কত সাম্প্রতিক, ব্যাপক ও বিশাল তার আরেকটু স্পর্শ পেলাম, সংঘের প্রতিষ্ঠাতা পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রেমণ্ড লারোজ সি.এস.সি কর্তৃক রচিত ***"খ্রিস্ট যে তুমি"*** নামক *গ্রন্থ* পাঠে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ
পঞ্চাশত্তমী পর্ব, ২৮শে মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অবতরণিকা

একবার এক প্রচারককে তিরস্কার করা হয়। কারণ তিনি অন্য একজনের উপদেশ তার স্বীকৃতি ছাড়াই প্রচার করছিলেন। নিজেকে নির্দোষ দাবি করে প্রচারক বললেন, "আপনারা কি লক্ষ্য করেননি যে, উপদেশের শুরুতে এবং শেষে আমি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করছিলাম, আসলে ওগুলো ছিল উদ্ধৃতি চিহ্ন"!

এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলো লেখার সময় আমি প্রায়ই অন্যের লেখার সাহায্য নিয়েছি, যদিও তা হুবুহু এক না হলেও আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব লেখকের মূল লেখা ও ভাবের কাছাকাছি থাকতে এবং চেষ্টা করেছি তার উৎস যেন সহজে বুঝতে পারা যায়; কিন্তু লেখাগুলির এমনই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন হয়েছে যে তাকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা যায় না। এটা যদি নিন্দনীয় ব্যাপার হয় তবে আমি বলবো যে, এ রকম উদ্ধৃতি সাধু ফ্রান্সিসের রচনা কৌশল। তবে কোন প্রকার বিতর্কে যাতে জড়িয়ে না পড়ি, তাই আমি সম্পূর্ণ বইটিকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখলাম।

এমন কে-ই বা আছে যে দাবি করতে পারে তার নিজস্ব কোন জ্ঞান আছে? "সব জ্ঞানের একটি উৎস; সময়ের সূচনার পূর্বেই তা ছিল প্রভু পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে"। (উপদেশক ১:১) যথাযথ ভাবে বলতে গেলে, দোষ ত্রুটি ছাড়া আমাদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই এবং খ্রিস্ট যে জ্ঞান প্রকাশ করেছেন আমরা তা আমাদের "নিজস্ব করে নিতে" এবং কাজে লাগাতে জীবন ভর চেষ্টা করে যাব।

জ্ঞানার্জন এক কথা এবং তা বিতরণের চেষ্টা আর এক কথা। সত্তর বছরের চেষ্টায় আমি যে শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি এখন তা আমার বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছে তুলে ধরছি। এর কি কোন কার্যকারিতা আছে? আছে, যদি ঐশ অনুগ্রহ পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই আমার পাঠকদের অনুরোধ করছি তোমরা প্রার্থনা দিয়ে শুরু কর; এবং একজনও যদি সামান্য উপকৃত হয়, তবে আমার পুরস্কারের ঝুড়ি উপচে পড়বে।

+ রেমন্ড লারোজ, সিএসসি

চট্টগ্রামের বিশপ (১৯৫২-১৯৬৭)

২২ জুলাই ১৯৬৭

নবিসিয়েটে প্রবেশের সুবর্ণ জয়ন্তী

প্রথম ভাগঃ পরিত্রাণের নিগূঢ় রহস্য

সর্বপবিত্র ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর

(১) নিগূঢ় রহস্যের গুরুত্ব

মানব দেহধারণ, মানব মুক্তিসাধন এবং পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্যগুলি প্রকাশ করে ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছেন এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের আহ্বান করেন। আমাদের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আমাদের সাহায্য ছাড়া তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন না। পবিত্র ত্রিব্যক্তি প্রকাশ করে পরমেশ্বরের আপন সত্তা। এটি এমনই এক গোপনরহস্য যা তিনি পিতৃসুলভ ভালবাসায় আমাদের সঙ্গে ভাগ করেন। আমাদের ধর্মবিশ্বাসে এটিই হল গূঢ়তম রহস্য। ঈশ্বর চান না তিনি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে যে উপহার নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করতে আমরা যেন শুধু তাঁর হাতের দিকে নজর না দিই, বরং তিনি নিজে আসলে কী তা বুঝতে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে আমরা যেন তাঁর মুখের দিকে ও অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করি। ঈশ্বর-পালিত সকল সন্তানদের অন্তরের আকাঙ্খার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে: তারা সবাই সামরচয়িতাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে ওঠে: "জীবিত ঈশ্বরের জন্য তৃষিত আমার প্রাণ, কবে পাব তাঁর শ্রীমুখের দর্শন?" তারা সাধু আগস্টিনের সঙ্গে বলে ওঠে, "তোমার নিজের জন্য, হে প্রভু, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ, তাই আমাদের অস্থির হৃদয় স্বস্তি পাবে না যতক্ষণ না তা তোমাতে আশ্রয় পায়"। কাজেই তাঁকে আরও বেশী করে জানার চেষ্টা করলে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট হন। তিনি সেই জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়– তাঁকে যেন জানতে পারি এবং তাঁর মহত্ত্ব ও আনন্দের সহভাগী হতে পারি।

(২) শ্রেষ্ঠতর ঐশজ্ঞান

তিন ব্যক্তি এক সত্তা--ঈশ্বরের এই নিগূঢ় রহস্য আমাদের বোধগম্যের অতীত হলেও আমরা যেন তাঁর সম্বন্ধে জানতে কখনও বিরত না হই। খ্রিস্ট এবং তাঁর মণ্ডলীর রাজ্যের কর্তব্যপরায়ণ সন্তানের মত আমরা নিতান্তই তা বিশ্বাস করি। আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বর 'কী' তা জানা অসম্ভব হলেও ঐশ ত্রিত্বের জীবন এবং তাদের সঙ্গে আমরা যে অপূর্ব সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, ঈশ্বর তা আন্তরিক ভাবে প্রকাশ করার পর, তিনি 'কে' তা জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। ঈশ্বর যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, সেই প্রেমপূর্ণ প্রকাশ কিন্তু প্রাক্তন বিধানের মনোনীত জাতির মানুষের কাছে করা হয়নি। বহু দেবতা পূজারী পৌত্তলিক জাতি দ্বারা বেষ্টিত ইহুদীরা হয়তো খুব সহজেই প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হ'ত; তারাও হয়তো তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। সেই জন্য পরমেশ্বর জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনিই একমাত্র সত্য ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই। বর্তমান ইহুদী এবং মুসলমানদের সঙ্গে আজও আমরা এই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু পবিত্র ত্রিত্বের প্রকাশ সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে বাক্য দেহধারণের সময়, এবং এটিই হল পৃথিবীতে নিয়ে আসা সুসমাচারের মূল বিষয়। দূতসংবাদে পিতার কাছ থেকে কুমারী মারীয়ার নিকট বার্তা এসেছে যেন সে পবিত্র আত্মার কাজ গ্রহণ ক'রে পুত্রকে গর্ভে ধারণ করে। যিশুর দীক্ষাস্নানের সময় পিতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "তুমি আমার প্রিয় পুত্র" এবং একটি কপোতের অবয়বে পবিত্র আত্মা নেমে এসে তাঁর উপর অধিষ্ঠান করলেন। স্বর্গারোহণের পূর্বে যিশু তাঁর শিষ্যদের এই গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দিলেন: "যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর! তোমাদের যা-কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও" (মথি ২৮ ঃ ১৮-২০)।

(৩) আমাদের জন্য মঙ্গলাশিষ

পিতাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পুত্রের আগমন, কিন্তু তাঁর প্রকাশের মাধ্যমে অনেকেই শুধুমাত্র পুত্র সম্বন্ধেই জ্ঞান অর্জন করেছে। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পিতার কাছে জীবন-লক্ষ্যে উপনীত না করে পথিমধ্যেই তাদের ধর্মমত থেমে গেছে। ঈশ্বরের এক সত্তা হোক বা তিন সত্তা, তাতে যে কিছু যায় আসে না সে কথা নয়। এভিলি লিখেছেন, "ঈশ্বরকে ঈশ্বর হতে হলে বহুধা হতেই হবে। ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ হতে হলে একাধিক হতে হবে। ঈশ্বরকে দান স্বরূপ হতে হলে বহু হতে হবে। ঐশত্রিত্ব একে অপরের সঙ্গে সত্তাগত ভাবে সম্পর্কযুক্ত। শুধুমাত্র পুত্রকে জাত করেই পিতা সত্যিকারে পিতা হয়েছেন। পুত্র আসলে পুত্র হয়েছেন শুধুমাত্র নিজেকে পিতার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এবং এর ফলে নিজে হয়ে উঠেছেন দান স্বরূপ। পিতা-পুত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ক'রে এবং অপরের কাছে দান হয়ে পবিত্র আত্মা নিজে পবিত্র আত্মা হয়েছেন"। ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন যে তিনি একাকী নন, তিনি একজন "বিশ্বচরাচরের চিরকুমার নন", তিনি অনন্তকালীন স্বীয় সত্তা-আবিষ্ট ঈশ্বর নন। ঈশ্বর চির-উৎসরণ, তিনি সংলাপময়, তিনি অনন্য আত্মদান-স্বরূপ। প্রতি রবিবার ধন্যবাদিকা স্তুতিতে আমরা আনন্দ করি যখন যাজক গান করেন, এক ব্যক্তির এককে নয়, কত বড় কৃপা যে তুমি একাকী নও, কত বড় কৃপা যে তুমি বহুধা, কী আনন্দ যে তুমি প্রেমস্বরূপ পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা!

এমনটা নয় যে, ঈশ্বরের এক সত্তা হোক বা তিন সত্তা তাতে কোন তফাৎ হতো না, কারণ ঈশ্বর তিনের মধ্যে অবস্থান করার ফলে, এই ভাবে বলা যেতে পারে যে, তিনি আপনাতে আপন, অপরকে ভালবাসায় আপন এবং আমাদের জন্য ভালবাসায় আপন। ঈশ্বর ত্রিব্যক্তি না হলে আমরা বুঝতে পারতাম না যে তিনি সৃষ্ট জগতের সাথে সম্পর্ক রেখে আপন অস্তিত্বে অস্তিত্ববান; তিনি ত্রিব্যক্তি না হলে

আমরা চিন্তাই করতে পারতাম না যে, তিনি সৃষ্ট জগতের মধ্যে নিজে বিলীন না হয়ে সৃষ্টি করতে পারেন (নিজে দেহধারণ করতে পারেন)। সেই জন্য যারা ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিতে বিশ্বাস করে না, তারা ঈশ্বরকে সৃষ্টির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, ফলে অস্বীকার করে ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় সত্তা এবং হিন্দুদের মতো সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে; অথবা গোঁড়া মুসলমানদের মতো দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে,ভালবাসায় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক করা কোনও ভাবে সম্ভব নয়।

(৪) ঐশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

বলা হয় যে, ত্রিব্যক্তি নিয়ে ভাবতে ভাবতে সমুদ্র তীরে হাঁটার সময় সাধু আগষ্টিন দেখতে পেলেন একটি শিশু ঝিনুক দিয়ে সমুদ্রের জল সেঁচে একটি ছোট বালির গর্তে ফেলে সমুদ্র খালি করে দিতে চাইছে। বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্রবিদ যখন বললেন যে, এই কাজটি অসম্ভব, উত্তরে সেই শিশুটি (মানুষ-বেশী স্বর্গদূত) বলল যে, পবিত্র ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে জানা আরও বেশী অসম্ভব। তবুও এই ধর্মশাস্ত্রবিদ সাধু আমাদের জন্য এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে গেছেন মানবাত্মার তুলনা দিয়ে, যে মানবাত্মা হল আধ্যাত্মিক সত্তা এবং সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে, বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছাশক্তি এই দুটি গুণ নিয়ে। এই ব্যাখ্যা যা সাধু টমাস তাঁর লেখা "সংক্ষিপ্তসারে" লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা পাঠ করলে বুঝা যায় যে, এই গূঢ় রহস্য আমাদের বিচারবুদ্ধির উর্ধ্বে হলেও তা অযৌক্তিক নয়। ঐ সকল মহাচার্যগণ লিখেছেন, "পিতা ঈশ্বর এমনই এক সত্তা, যিনি অসীম বুদ্ধিমান এবং সক্রিয়, এমন একটি মুহূর্ত নেই যখন তিনি নিজের প্রতি সজাগ নন"। কাজেই এই অসীম, বিশুদ্ধ, ঈশ্বর স্বরূপ, অথচ অভিন্ন জ্ঞান, তথাপি তাঁর থেকে স্বতন্ত্র হ'ল তাঁর প্রজ্ঞা বা তাঁর বাক্য, যিনি আবশ্যিক ভাবে স্বতন্ত্র বাস্তবরূপ ধারণ করেছেন এবং তিনিই হলেন পুত্র। পিতা ঈশ্বর জানেন যে, তাঁর পুত্র, যিনি তাঁরই নিখুঁত প্রতিমূর্তি এবং তাঁরই মত অসীম পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তাঁকে ভাল না বেসে পারেন না। অন্যদিকে এই পুত্র একই ভাবে জানেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে স্বর্গীয় অসীম ভালবাসায় ভাল না বেসে পারেন না। তাহলে পিতা এবং পুত্রের মধ্যে এই যে ঈশ্বরীয় পারস্পরিক প্রেম তা অবশ্যম্ভাবী বাস্তব সত্য এবং তা-ই হ'ল তৃতীয় ব্যক্তি বা পবিত্র আত্মা। তিনি একই সময় পিতা এবং পুত্র এই উভয়ের মধ্য থেকে নির্গত হন এবং তিনিও তাঁদেরই মত অসীম শাশ্বত ঈশ্বর। ফাদার টেম্পেলস্ তার নিরক্ষর ব্যান্টু-ভাষী খ্রিস্টভক্তদের জিজ্ঞেস করতেন, "তোমরা কি ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও জানতে চাও? তারা উত্তর দিত, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই চাই"। ফাদার তখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তুলনা করে তাদের বোঝাতেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি একই সঙ্গে তিন ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে যখন সেই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য দুই ব্যক্তির তুলনা করা হয়; সে তার নিজ সন্তানদের পিতা, সে তার নিজ পিতার পুত্র এবং তার স্ত্রীর স্বামী। একই ভাবে একজন মহিলা একই সময় মা, কন্যা এবং স্ত্রী, যদিও ঐ তিন রূপ একই প্রকৃতির তিন ব্যক্তিকে বোঝায় না। এরকম আরও অনেক তুলনা আছে কিন্তু সেগুলো সেই গূঢ় রহস্যের অনেকগুলো দিক বোঝাতে অক্ষম।

(৫) ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

পবিত্র ত্রিব্যক্তির বিষয়ে জ্ঞানের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক। যদিও তাঁরা সকলেই সমরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং দেহধারণ ও মানব মুক্তিসাধন যা শুধু পুত্রের বিশেষ কাজ, সেই কাজ ব্যতীত সকল কাজ অভিন্ন, আমরা প্রতিটি ব্যক্তিকে আরও ভালভাবে জানতে পারি প্রতিটি সত্তার স্বভাবগত প্রবণতার উপর বিশেষ গুণ আরোপ ক'রে। সেইরূপে, সৃষ্টির কাজ বর্তানো হয় পিতার উপর, মানব মুক্তিসাধন বর্তানো হয় পুত্রের উপর যদিও অন্য দুই ব্যক্তি সেই কাজে সহযোগিতা দান করেন এবং পবিত্রীকরণ কাজ বর্তানো হয় পবিত্রআত্মার উপর। লেখক ভেরক্রোইজ ক্রুশের চিহ্নের উপর ধ্যান করতে আমাদের শিক্ষা দেন এই ব'লে: "পিতা, 'যিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতে আমায় সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ রাজ্যের জন্য' এবং পুত্র, 'যিনি অসীম ভালবাসায় তাঁর রক্ত দিয়ে আমায় মুক্তি দিয়েছেন' এবং পবিত্র আত্মার নামে, 'যিনি আমায় পবিত্র করেছেন এবং পালন করছেন ঈশ্বর সন্তান' হিসেবে"। এমন আরও অনেক বৈশিষ্ট্যগত গুণ আছে যা প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য দুজনের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা জানতে সাহায্য করে। আমরা তাই শক্তিকে পিতার গুণ, প্রজ্ঞা পুত্রের গুণ, এবং প্রেম বা দয়া পবিত্র আত্মার গুণ বলে আরোপ করি। একইভাবে চিরন্তনতা, সৌন্দর্য, আনন্দ, ঐক্য, সাম্য, মিলন পবিত্র আত্মার গুণ বলে বিবেচনা করি কারণ সমস্ত কিছু আসে তাঁর কাছ থেকে, তাঁর মাধ্যমে, তাঁরই মধ্যে যেখানে সবকিছু অবস্থান করে। পাপের বিষয়ে আমরা ঠিক একই ভাবে পার্থক্য করে দেখি: দুর্বলতা আমরা পিতার বিরুদ্ধে পাপ বলে বিবেচনা করি; অস্বীকার আমরা পুত্রের বিরুদ্ধে পাপ বলে বিবেচনা করি; অনিষ্টকামনা আমরা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ বলে বিবেচনা করি এবং তা কম মার্জনীয়। তিন ব্যক্তিতে বিদ্যমান বলেই ঈশ্বর নিজে প্রেমস্বরূপ এবং আমাদের যাবতীয় ভালবাসার আধার।

(৬) সমবেত উপাসনা

পবিত্র ত্রিত্বের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও ভক্তি সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় সমবেত উপাসনায়। ঈশ্বর মিলনসমাজ স্বরূপ, এবং তিনি চান যেন তাঁর ভক্তরা, যাদেরকে নিয়ে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মণ্ডলী, তারা তাঁর উপাসনা করবে সমবেত ভাবে। প্রত্যেক রবিবার পবিত্র ত্রিত্বের পর্বের নবীকরণ হয়। খ্রিস্টযাগের বেশির ভাগ প্রার্থনা নিবেদন করা হয় পবিত্র ত্রিব্যক্তি পরমশ্বেরের উদ্দেশ্যে, যেমন মহিমা স্তোত্র, বিশ্বাস স্বীকারোক্তি, ধন্যবাদিকা স্তুতি এবং মহিমা কীর্তন–পুণ্য পুণ্য। উপরন্তু, পুরো খ্রিস্টযাগ স্পষ্টতই উৎসর্গ করা হয় পবিত্র ত্রিত্বের উদ্দেশ্যে: "হে পবিত্র ত্রিত্ব, গ্রহণ কর".....'হে পুণ্যতম ত্রিত্ব,এই পরিশ্রমের ফল যেন তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়"। গির্জার জনগণের উপাসনায় আরও বেশি করে ভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত ভাবে কাম্য, যাতে পোপ দশম পিউসের কথায়, খ্রিস্টীয় চেতনা ও ধর্মনিষ্ঠার অবিরত পুনঃনবীকরণ ঘটে।

(৭) পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর তাঁর অসীমত্ব এবং অতীন্দ্রিয় গুণে আমাদের থেকে অনেক উর্ধ্বে হলেও তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান ক'রে অনেক কাছে চলে এসেছেন। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের মধ্যে, তাঁদের আপন মন্দির হয়ে বাস করতে এসেছেন। বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে, বিশেষত: খ্রিস্টপ্রসাদের মাধ্যমে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের উপস্থিতি পুনঃনবীকরণ ও পরিবর্ধন করা হয়। খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী সংস্পর্শ, ত্রিব্যক্তির প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের মিলন সুদৃঢ় করে তোলে। আমাদের প্রতিটি মঙ্গলকর আচরণও এই উপস্থিতি আরও বাস্তব করে তোলে, কারণ এই আচরণের মাধ্যমে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করি, যিনি অবিরত "তাঁর আপনজনের কাছে আসেন"। যিশু বললেন, "যে-কেউ আমাকে ভালবাসে, সে আমার বাণী মেনে চলবে। তাহলে আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন এবং আমার পিতা ও আমি তার কাছে আসব ও তার সঙ্গেই বাস করব" (যোহন ১৪: ২৩)। ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজা এই বাণীর উপর ধ্যান করে তাঁর মূলমন্ত্র পেয়েছেন: "ভালবাসার মাধ্যমে জীবনযাপন" এবং রচনা করেছেন পনের স্তবকের একটি গান, যেখানে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেয়ে উঠেছেন "হে ত্রিত্ব! তুমি আমার ভালবাসায় বন্দী"। আরেকজন কার্মেলীয় সিস্টার, পবিত্র ত্রিত্বের এলিজাবেথ, এমনই এক ঐশ আহ্বান পেয়েছিলেন যার ফলে চিন্তা-ধ্যানে, আরাধনায় এবং ভালবাসায় অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারতেন এবং সে বিষয়ে অন্যদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর জীবন স্মৃতি উচ্চ মাপের একটি আধ্যাত্মিক বই হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিশ্বাসমন্ত্রে আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরে আমাদের বিশ্বাসোক্তি উচ্চারণ করি। তাছাড়া পবিত্র ত্রিত্বের সম্মানে আরও দুটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমৃদ্ধ প্রার্থনা আছে। দুর্ভাগ্য যে, তা প্রায়শঃ উচ্চারণ করা হলেও, মনোযোগের অভাবে সেই প্রার্থনা দু'টি তার মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্রুশের চিহ্ন হ'ল চিঠির ডান দিকে লেখা ঠিকানার মত, যার অর্থ সবকিছু ঈশ্বরের জন্য এবং ঈশ্বরের সহায়তায় সম্পন্ন হবে। আবার, তা হল এমন একটি দলিল যেখানে রয়েছে রাজার অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তির দস্তখত। একমাত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিস্টভক্তের এই চিহ্ন ব্যবহারের অধিকার আছে। অন্য অর্থপূর্ণ প্রার্থনাটি হল "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক"। এটি হ'ল নিঃস্বার্থ ভালবাসার সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ, যেখানে আমাদের অনুকূলে কোন অনুরোধ জুড়ে দেওয়া হচ্ছে না। এর অর্থ, "হে ঈশ্বর! সীমাহীন রূপে এবং চিরকালব্যাপী প্রসন্ন হও! এতেই আমার আনন্দ"। আমরা প্রকাশ করি যে, তাঁর সৃষ্ট সবকিছুর মহিমা কীর্তন ছাড়াই, ঈশ্বর তাঁর নিজের মধ্যে ও নিজের দ্বারা আপন গৌরবে গৌরবময়, "আদিতে যেমন হইত"। দৈনন্দিন প্রার্থনা এবং জপমালা প্রার্থনার সময় এই সুন্দর প্রার্থনাটি হাজার বার উচ্চারণ করা হয়। এই ভাবে তোতা পাখীর মত আবৃত্তি করার ফলে, অন্তর পড়ে থাকছে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে আর প্রার্থনাটি বার বার বঞ্চিত হচ্ছে তার সঠিক মূল্য থেকে ।

(৮) সর্বদা খ্রিস্টের মাধ্যমে

একথা সত্যি যে, ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে আমরা খ্রিস্টেতেই থেমে থাকব না, আবার একথাও সত্যি যে, পিতার কাছে পৌঁছতে হ'লে খ্রিস্টকে বাদ দিয়েও করা যাবে না। আমাদের ধর্ম যদি সঠিক ভাবে খ্রিস্ট-কেন্দ্রিক হয়, তাহলে তা সঠিক ভাবে পবিত্র ত্রিত্বের দিকেই নির্দেশ করবে। পবিত্র ত্রিত্বের ভক্ত সিস্টার এলিজাবেথ সেই একই প্রার্থনা এই ভাবে শুরু করেছেন: "হে আমার প্রভু, ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর, আমি তোমার আরাধনা করি" এবং এর ঠিক পরেই তিনি এই প্রার্থনায় বলেন যে, তিনি যেন খ্রিস্টের জন্য "খ্রিস্টের আর এক মানব-রূপ" হতে পারেন, যার মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট তাঁর সকল কাজের পুনঃনবীকরণ করতে পারেন। খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহের জীবন্ত অঙ্গ হয়ে এবং তাঁর সঙ্গে আরও বেশি অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম হয়ে, আমরা তাঁর উদ্দেশ্য জীবন্ত রাখতে পারি যাতে অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে খ্রিস্ট তাঁর পিতার মহিমা প্রকাশ করতে পারেন। খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে পিতার কাছে এই গমন খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনার শেষে মহিমা স্তুতিতে খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যখন যাজক আর্শীবাদ করা রুটি পানপাত্রের উপর ধরে রেখে বলেন: "তাঁর (খ্রিস্টের) দ্বারা এবং তাঁর সঙ্গে এবং তাঁরই মধ্যে, পবিত্র আত্মার সংযোগে, হে সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বর, সমস্ত গৌরব ও মহিমা তোমারই"। খ্রিস্ট বলেছেন তাঁর নামে প্রার্থনা করতে। তাঁর সেই কথা মেনে মণ্ডলীর প্রার্থনার সমাপ্তিতে বলা হয়: "আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে, যিনি তোমার (পিতার) সঙ্গে পবিত্র আত্মার সংযোগে জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান, আমেন"।

দেহধারণের নিগূঢ় রহস্য

॥ ক ॥ মারীয়ার মধ্যে

দূতসংবাদের সেই চির পরিচিত দৃশ্যটি আমরা একবার খুব মন দিয়ে চিন্তা করে দেখি: মহাদূত গাব্রিয়েল কুমারী মারীয়াকে অভিবাদন জানিয়ে বলছেন: ঈশ্বরের বাক্য দেহধারণ ক'রে যে ত্রাণকর্তা জন্ম নেবেন, মারীয়া যেন তাঁর মা হন; তিনি কুমারী, তাই প্রস্তাবে প্রথমে তাঁর অসম্মতি এবং শেষে পবিত্র আত্মার প্রভাবের প্রতি সম্মতি দান। অতুলনীয় একটি ক্ষণ! স্বর্গলোক এবং স্বয়ং ঈশ্বর উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষা করছেন সেই কুমারীর সম্মতির জন্যে! ধন্য সেই অনুকম্পা! ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন। মারীয়ার সম্মতি ও সহযোগিতা ছাড়া এই রহস্যাবৃত সত্য বাস্তবায়িত হতে পারতো না।

কত সুযোগ সুবিধার উৎস মারীয়ার মাতৃত্ব! ঈশ্বর পুত্র যিশুর নিবিড় নৈকট্য লাভ, ন-মাস ব্যাপী তাঁকে গর্ভে ধারণ এবং ত্রিশ বছর ব্যাপী তাঁর সংসারে বাস! ধন্যা কুমারী মারীয়ার জীবনে এই সহযোগিতার প্রভাব কতোটা? তিনি হয়ে উঠেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত কুমারী, "দেখ আমি প্রভুর এই দাসী" এতে তিনি কখনও ব্যর্থ হননি।

॥ খ ॥ আমাদের মধ্যে

(১) মানব দেহধারণের উদ্দেশ্য: আমাদের অমরত্ব লাভ

ঈশ্বর পুত্র কেন মানবদেহ ধারণ করলেন? এই জন্য যে, আমরাও যেন তাঁর ঐশ জীবনের অংশীদার হতে পারি। ঐশ্বরিক পরিবারকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর আগমন; আত্মিক দিক থেকে ঈশ্বর সন্তান হওয়ার যে অধিকার আমাদের আদি পিতামাতা হারিয়েছিল, সেই অধিকার পুনরুদ্ধার করতে তাঁর আগমন। কাউকে নিজের করে পেতে হলে প্রথমে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে; কাজেই "হবা"র হতভাগ্য সন্তান এই আমাদের কাছে যিশু নিজেকে সমর্পণ করেছেন। নব আদম যিশু এসেছেন বৃহত্তর এক পরিবার গড়ে তুলতে। স্তবগীতিতে যেমন উল্লেখ আছে "পিতার আগমন হবে যুগ যুগান্তরে" যিশু-ই কি সেই নবজীবনপ্রাপ্ত পরিবারে পিতা রূপে আগমন করবেন? পরে তিনি তাঁর আপনজনদের সম্বোধন করবেন "সন্তান" বলে। কিন্তু প্রথমে তাঁকে হতে হবে শিশু, আমাদের মতো মানবসন্তান ও আমাদের ভ্রাতা। তিনি শুনতে চান আমাদের এই সংসারের অতি প্রিয় এবং স্নেহপরায়ণ সম্বোধন -- বাবা, মা, ভাই, গুরু, রাজা, বন্ধু এবং বঁধু। যে পরিবার তিনি গড়তে এসেছেন, তার বংশ পরিচয় হবে না আমাদের এই সাংসারিক পরিচয় পিতা মাতার সম্পর্ক দিয়ে, বরং তার পরিচয় হবে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক দিয়ে। যিনি ঈশ্বর সন্তান হওয়ার অধিকার আমাদের দিতে এসেছেন, সেই কাজের তিনি সূচনা করেছেন, ধন্যা কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায়, মনুষ্য প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে।

(২) প্রতিটি মানুষের কাছে নতুন দূত–সংবাদ

এই কাজ সম্পন্ন হবে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর অভ্যন্তরীণ দেহধারণের মাধ্যমে। আমিও পাই সেই বিস্ময়কর শুভ সংবাদ, সত্যিকার অর্থে মঙ্গলসমাচার। ঐশবাণী আমায় বলছে, "যে পুণ্য পরিবার আমি গড়তে এসেছি সেই পরিবারে "ঈশ্বরের সন্তান হতে হলে, সেই পরিবারের একজন হতে হলে, আমাকে তোমার মধ্যে আবার নতুন ক'রে জন্ম নিতে হবে। আদমের পতনের ফলে তুমি আমার স্বর্গীয় জীবন, অনুগ্রহ ও গৌরবের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছ। জল ও পবিত্র আত্মার দ্বারা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমি আর এক নবজন্মের ব্যবস্থা করেছি। এই নবজীবন লাভ করার জন্য তোমাকে এক প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল, তোমার উপর শয়তান এবং তার কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এবং আজীবন আমার সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল। সেই দিন থেকে তুমি আমার জীবনে বাস করতে শুরু করেছ; কিন্তু তোমার স্বাধীনতাকে আমি সম্মান করি; তাই তোমার সম্মতি ছাড়া আমি তোমার মধ্যে জন্ম নিতে পারি না, পারি না তোমাকে রূপান্তরিত করে আমার মতো করতে বা আমার ঐশ সত্তার অংশীদার করতে। এই হল তোমার কাছে আমার বার্তা, আমার শুভ সংবাদ। আমি ইতিমধ্যে সেই বার্তা ঘোষণা করেছি, কিন্তু তুমি এখনও তা বুঝে উঠতে পারনি। তবুও আমি আমার আহ্বান অবিরত পাঠাতে থাকব তোমার কাছে আমার বার্তাবাহকের মাধ্যমে, তাদের লেখার মাধ্যমে এবং আমার ঐশ প্রেরণার মাধ্যমে; যাতে তুমি আমার মঙ্গলবার্তার মর্ম অনুধাবন করতে পার। এই মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার জন্য দিনে তিন বেলা দূতসংবাদের ঘন্টা বাজিয়ে জানান দেওয়া যথেষ্ট নয়। তোমার কাছে আমার অনুনয়, আমার একান্ত অনুরোধ: তুমি কি হবে আমার মন্দির, আমার নিয়মসন্ধির সিন্দুক, আমার অপর আমি।

(৩) আমাদের সম্মতির জন্য আবেদন

এই হল আমার প্রস্তাব, আমার মায়ের কাছে মানবিক আকারে যেমনটি রাখা হয়েছিল, সেই রকমই একটি প্রস্তাব। এই আবেদন সকলের কাছেই রাখা হয়, কিন্তু সবাই তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আরও স্পষ্টভাবে বলছি: আমি আমার মানবজন্ম আবার বজায় রাখতে চাই তোমারই মধ্যে এবং স্বাভাবিক দৈহিক মানবজন্মের থেকেও বেশি একান্ত হতে চাই তোমার সঙ্গে। আমাকে গ্রহণ করতে এবং আমার মধ্যে ধীরে ধীরে তোমার রূপান্তর ঘটাতে সহায়তার জন্য তোমার সম্মতির প্রতীক্ষা করব। ঠিক যেমন আমার মায়ের বেলা হয়েছিল, তোমার বেলাও তেমনি -- এক অনির্বচনীয় হৃদ্যতা! তুমি কি রাজি?

রক্তের সম্পর্কে আমার যে ভাই বোনেরা ছিল বা আমার প্রতিবেশী ও আমার স্বদেশবাসীর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল, এই আত্মিক সম্পর্কের সঙ্গে তার কোনও সাদৃশ্য নেই। পার্থিব এ সম্পর্কগুলি ছিল প্রতিবন্ধকতা, আমার আপনজন আমায় বিশ্বাস করল না, তারা গ্রহণ করল না আমায়। আর তাই আমি পারলাম না আত্মিকভাবে তাদের মধ্যে জন্ম নিতে, তাদের মধ্যে বাস করতে। রক্তের সম্পর্ক যথেষ্ট নয়, এমন কি আমার মা, যিনি আমার প্রথম শিষ্য, তার ক্ষেত্রেও নয়। আমার মাতার কতই না আনন্দ হয়েছিল আমার কথায় ও কাজে বিশ্বাস করে তা সযত্নে অন্তরের মনিকোঠায় পুষে রেখে তার স্বভাব আমার স্বভাবের অনুবর্তী করতে! আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্কে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছিলেন। তার হৃদয়, তার আত্মা, সে তো আমারই হৃদয়, আমারই আত্মা। এ তো তার গৌরব! আমার মায়ের পরে যে সকল পুণ্যাত্মা আমার নিভৃত আবাস হবে, তাদের কাছে আমি আমার মাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরব। স্বাভাবিক মাতৃত্বের উপরে এই স্বর্গীয় সম্পর্কের প্রাধান্য, আমি দুটি ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেছি। ভিড়ের মধ্য থেকে যখন এক নারী বলে উঠেছিল, "ধন্য সেই গর্ভ, যে গর্ভ তোমাকে ধারণ করেছিল"; তখন উত্তরে আমি বলেছিলাম, "ঠিকই, তবে যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে এবং তা পালন করে, তারা আরও ধন্য"। এই কথা বলে আমি আমার মাতার অনন্য যোগ্যতার প্রশংসা করেছিলাম, যার মধ্যে উর্বর জমিতে পরা শস্যদানার মতো আমার ঐশজীবন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর একবার আমায় বলা হলো যে, আমার আত্মীয়রা বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই প্রেক্ষিতে আমি বললাম, "কে আমার মা, কে আমার ভাই? আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা"। আমার চার পাশে যারা ভিড় করেছিল, তাদের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে আধ্যাত্মিক পিতৃত্বে আহ্বান করলাম। শিশু যিশু-ভক্ত আমার প্রিয় তেরেজা, ধন্যা কুমারী মারীয়ার উদ্দেশ্যে লেখা কবিতায় বলেছে: "হে নিষ্কলঙ্কা কুমারী, হে কোমলপ্রাণা মা, খ্রিস্টের এই কথা শুনে, ভীত হওনি তুমি বরং উল্লসিত হয়েছ এই ভেবে যে, এই ধরাতলে আমাদের হৃদয়ও হতে পারে তাঁর আবাস, এ কথা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন"।

(৪) আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মহত্ত্ব

কাজেই আমার প্রথম শিষ্য, আমার মাতার সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক সম্পর্কের সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও অমূল্য যা কিছু ছিল, তা আমি তোমায় দিতে চাই এবং তোমার সম্মতির জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। তুমি কি রাজী? অন্তরঙ্গতার নিরিখে এই দুই রকম সম্পর্কের তুলনা করে দেখ। রক্তমাংসের সম্পর্কের সূত্রে আমি আমার মাতার গর্ভে নয় মাস ছিলাম এবং ত্রিশ বছর তার সঙ্গে কাটিয়েছি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বিবেচনায়, আমি তোমার অন্তরে আমার আবাস গড়তে চাই এবং সেখানে তোমার ইহজীবন এবং অনন্তজীবন যাবৎ বাস করতে চাই। তুমি কি এই মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী? যেহেতু এই মিলন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং অদৃশ্য বলে আমার বাস্তব উপস্থিতি বিশ্বাস করা তোমার কাছে কঠিন লাগবে, সেহেতু আমার মা, যিনি নিজের মধ্যে আমাকে উপলব্ধি করেছেন বলে, তুমি কি তাঁকে ঈর্ষা করবে ?

এই সব কথা আমি আগে থেকেই জানতাম, তাই সাধু পলের মাধ্যমে আমার উত্তর-ও দিয়ে দিয়েছি: "দৃশ্য সকল বস্তুই বিলিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অদৃশ্য বস্তু চিরন্তন"। আর সাধু টমাসকে বলেছিলাম, "ধন্য তারা, যারা আমায় না দেখেও বিশ্বাস করে"। তথাপি, আমার মা-কে যাতে ঈর্ষা না কর এবং তোমার অন্তরে আমার বাস্তব উপস্থিতি ও অধিষ্ঠান যাতে অনুভব করতে পার -- তোমার এই ঐকান্তিক মনষ্কামনা পুরণার্থে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে –– আমার দেহ, আত্মা এবং ঈশ্বরত্ব বিতরণ ক'রে প্রতিষ্ঠা করেছি পুণ্য খ্রিস্টযাগ। "যে আমার দেহ খায় এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে বাস করে এবং আমি তার মধ্যে বাস করি"। আমার বাস্তব উপস্থিতির –– এই চিহ্নের মাধ্যমে তুমি এই মিলন বন্ধন নবীকরণ করতে পার। এই ক্ষণস্থায়ী নবজীবন, যা আসলে তোমার এই দেহের মধ্যে শুরু হয়, তা যেন তোমার প্রত্যয় এবং বিশ্বাস আরও গভীর ক'রে তোলে। এই নবজীবনের উদ্দেশ্য হল তোমার মধ্যে আমার স্থায়ী বাস নিশ্চিত এবং হৃদ্যতা আরও বৃদ্ধি করে তোলা; আমি কেবল তোমার অন্তরের এক কোণে থাকতে চাই না; আমি চাই তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়। আমি চাই তুমি তোমার দেহ জীবন্ত ও পুণ্য নৈবেদ্য রূপে উৎসর্গ কর; সর্বোপরি আমি চাই তোমার হৃদয় ও আত্মা, কারণ আজ আমি তোমার মধ্যেই বাস করব।

(৫) সম্মতি নিবেদন

বা! সত্যি! হ্যাঁ প্রভু, আমার সঙ্গে থাক, কারণ আমার জীবনে তোমায় চিনতে অনেক দেরী করেছি। কী সুন্দর, হে চির নতুন! আমি শুনতে পাই তুমি আমার অন্তরে কথা বলছ -- তোমাকে ঐশ্বরিক করতে এবং আমার সঙ্গে অভিন্ন হতে, আমি তোমার মধ্যে আবার জন্ম নিতে চাই, যা আমার ঐতিহাসিক আগমনের চেয়ে ঘনিষ্টতর। তোমার প্রতি এই হ'ল আমার অপরিবর্তনীয় সত্য বার্তা: তুমি আমার পিতার অনুগ্রহ লাভ করেছ। তোমার নিম্নতর স্বভাবটাকে ত্যাগ করে তোমার মধ্যে জন্ম দিতে হবে ঈশ্বর সন্তানকে। আমি চাই তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়। তুমি নিজেকে যত অস্বীকার করবে, আমার ঐশ্বরিক জীবন তোমার মধ্যে তত বিকশিত হবে, আমি তোমার মধ্যে বাস করব এবং তোমাকে আমাতে রূপান্তরিত করব। আজ যদি তুমি আমার কণ্ঠস্বর শোন তা হলে কঠিন ক'রে না তোমার হৃদয় তাহলে তোমার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে আমার অস্তিত্ব। এ সবই নির্ভর করছে তোমার সহযোগিতা কতটা আন্তরিক তার উপর; কারণ, "যে কেহ আমায় ভালবাসে সে আমার আদেশ পালন করে, এবং আমার পিতাও তাকে ভালবাসে আর আমরা তার কাছে যাই ও তার মধ্যে গড়ে তুলি আমাদের আবাস"। এই আহ্বান পাপীদেরও দেওয়া হয়েছে, এমন কি যারা তাদের হৃদয় কঠিন পাষাণ করে রেখেছে তাদেরকেও। সেই পাষাণের মধ্য থেকেও তো অতি চমৎকার শিশুর জন্ম হয়। মঙ্গলবার্তায় এবং মণ্ডলীর ইতিহাসে চমকে দেওয়ার মতো উদাহরণ আছে –– সক্কেয়, সামরীয় নারী, অপব্যয়ী পুত্র, শৌল যিনি পল নামে পরিচিত, তার উক্তি, "প্রভু, আমায় কি করতে হবে"? যার সমতুল্য উক্তি হল, "আমি প্রভুর দাসী" এবং, *"Fiat"* (আমি রাজী)। আমার প্রথম অনুসারী ভক্তরা যে একমন একপ্রাণ হয়েছিল, তার কারণ তারাই প্রথম আমায় গ্রহণ করেছিল, আর তাই তারা আমাতে একমন একপ্রাণ হয়েছিল। তাদের ভ্রাতৃপ্রেমের

ভিত্তি ছিল ঐশ্বরিক পিতৃত্বের বন্ধন। সাধ্বী তেরেজা ও তার এক ভগ্নির মধ্যে যে পার্থিব সম্পর্ক ছিল যিশুর প্রতি তাদের ভালবাসার ফলে সেই সম্পর্ক আধ্যাত্মিক নিবিড় সম্পর্কে উন্নীত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "আত্মিক ভাবে আমরা ভগ্নি হয়ে উঠলাম"। কাজেই আমার আবির্ভাবের ধারাবাহিকতা নির্ভর করছে তোমার উপর এবং তা দাবী রাখে তোমার ব্যক্তিগত সহযোগিতা, তোমার সম্মতি এবং তোমার বিশ্বস্ততার উপর। তোমাকে আমার দাবীর উত্তর দিতে হবে প্রেমপূর্ণ "হ্যাঁ" দিয়ে, "এই যে আমি" এবং আরও বেশী সঠিক "আমেন" বলে।

(৬) সহযোগিতা

সাহস রাখ! বহুমুল্য আমার অন্তরঙ্গতা, যা ক্রয় করা হয়েছে আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে -- পুরাতন মানুষটার মৃত্যু ঘটিয়ে। তোমার দিকে আমি স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল সেই যুবকটির প্রতি যে অনন্ত জীবন লাভের আকাঙ্খায় ভাল কিছু করতে ইচ্ছুক ছিল। উর্ধ্বলোকে তোমার নাম নিবন্ধিত করা আছে। একমাত্র তুমি-ই নিশ্চিত করতে পার এই ঐশ আহ্বান, যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে আমার ছবি, আমার নাম মুদ্রিত এবং তোমার অন্তরাত্মায় অঙ্কিত করতে দাও। আমার আহবানে যদি তুমি অটল বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাড়া দাও, তবে বাইরের কোনো কিছুই, -- কোনো ব্যক্তি বা বস্তুই হোক -- আমার পবিত্রীকরণের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কারণ যারা পরমেশ্বরকে ভালবাসে, সব কিছুই তাদের মঙ্গলার্থে ঘটে। তাই আমার শিষ্যের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তুমিও বলতে পার: "খ্রিস্টের ভালবাসা থেকে কেই-বা আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে?"। তবে তোমার মধ্যে যদি আমার অনুকরণে গর্ব ত্যাগ এবং বিনম্রতার উদয় হয়, এবং তুমি যদি অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে সেই মতো জীবনযাপন কর, তাহলে তোমাকে যারা ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের তুমি মনে করবে ভাস্কর, যারা তোমার অন্তরে আমার মূর্তি খোদাই করে দিচ্ছে; যারা তোমায় উৎপীড়ন করে, তাদের মনে করবে চিকিৎসক বা ধারালো অস্ত্রের মতো যা তোমার মধ্যে এখনও যে অধার্মিকতা রয়ে গেছে তা ছেটে ফেলে। তথাপি, তোমায় কিন্তু আমি ক্রীতদাস হিসাবে পেতে চাই না, বরং এমন এক মানুষ হিসাবে পেতে চাই যে খ্রিস্টের উদ্দীপনায় বলিয়ান ও পূর্ণ। "আমি বৃদ্ধি পেতে থাকব, আর তুমি হ্রাস পাবে"; প্রকৃত পক্ষে, তোমাকে নিজের কাছে মৃত হতে হবে, যাতে শুধু আমি তোমার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারি।

তোমাকে হতে হবে রিক্ত, মৃত অথবা এমন একজন যে যথার্থরূপে জীবিত। কারণ, যে আমার প্রতি বিশ্বস্ত, তার "জীবন রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি"! তুমি আমাতে রূপান্তরিত হবে, সুন্দর হবে তুমি শিশু-যিশুর মতো, সৌন্দর্য্যময় হবে তুমি খ্রিস্টের সৌন্দর্য্যে। জপমালা প্রার্থনার প্রথম নিগূঢ়তত্ত্ব ধ্যান করার সময় তোমরা বল: "'দূত সংবাদ'; এসো আমরা দীনতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি"। তোমরা ঠিকই বল, কারণ ঐ পর্যায় আমি নিজেকে নিঃস্ব করে আমার সেবকের দীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছি।

দীনতার সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ দিয়েছি আমার নিজের এবং আমার মাতার মধ্য দিয়ে; কাজেই এই সদ্‌গুণ তোমাদের মৌলিক অধিকার এবং তোমরা তা অবশ্যই দাবী করতে পার। খ্রিস্টে তোমাদের প্রকৃত উদারতার দাবীও তোমরা করতে পার, কারণ আমি চাই তোমাদের মহিমান্বিত করতে, অমর করতে। বিনিময়ে তোমাদের অন্তরে গ্রহণ করতে হবে ঈশ্বরের উপহার – তাঁর প্রিয় পুত্রকে; যাতে তোমরা প্রভু পরমেশ্বরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠো এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর সেবা করতে পার।

পরিশেষে আমি এই পরামর্শ দিতে চাই, কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমরাও মা মারীয়ার প্রশংসাগীতি গাও, অথবা পবিত্র ত্রিত্ব-ভক্ত সিস্টার এলিজাবেথের এই স্তবকটি উচ্চারণ কর:

যিশু, পরম পিতার বাণী,
তোমাতেই তিনি মানবদেহধারী।
কুমারী মাতার মতো
নবজাতক ঈশ্বরকে কোলে তুলে নাও,
তিনি তো তোমারই!

পরিত্রাণের নিগূঢ় রহস্য

দেহধারণের নিগূঢ় রহস্য হল ঈশ্বরপুত্র আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের মধ্যে দুটি স্বভাবের অভিন্নতা, মানবস্বভাব এবং ঐশস্বভাব। বাক্য দেহধারণ করলেন, যেন আমরা লাভ করতে পারি ঈশ্বরীয় সত্তা, হয়ে উঠি অলৌকিক শক্তির অধিকারী, ঈশ্বর-সন্তান স্বয়ং পরমেশ্বরের স্বরূপ ও পরমেশ্বরের জীবনের অংশীদার। আমাদের ব্যক্তিগত সহযোগিতা ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়, কারণ ঐশপরিবার পুনঃগঠনের উদ্দেশ্যে নব আদম আমাদের প্রত্যেকের সম্মতি কামনা করেন। সেই কারণে প্রতিটি মানুষের কাছে দূত সংবাদের মতো একই বার্তা ঘোষণা করেন, "আমি তোমার মধ্যে জন্ম নিতে চাই, বিকশিত হতে চাই। তুমি কি আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত? আমি চাই না বীজ বপন না করেই শষ্য গোলায় রাখা হোক। আমিই সেই ঐশ শষ্য-দানা, আমি নিজেকে তোমাদের কাছে দিতে চাই। আমিই ঈশ্বরের বাণী; আমার কথা শোন, সেই মতো জীবনযাপন কর এবং তোমার মধ্যে আমার জীবন ক্রমশঃ বিকশিত করে তোল। তোমার বিশ্বস্ততা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে আমাদের অন্তরঙ্গতা এবং একাত্মতা।

এমন অযোগ্য কারও প্রতি এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনে বিস্মিত হয়ে কেই-বা এমন ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং ধন্যা কুমারী মারীয়ার অনুকরণে রাজী হয়ে সাড়া না দিতে পারে -- "আমি প্রভুর দাসী", "তা-ই হোক"; অথবা এমন কে আছে যে বাকী জীবনটা জীবন্ত "হ্যাঁ" রূপে কাটাতে না চাইবে -- ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা সবচেয়ে সুন্দর শব্দ সেই "হ্যাঁ"? (Guy De Fontgland)

(১) খ্রিস্টের কার্য

পরিত্রাণকার্যের গূঢ়রহস্য নিহিত আছে খ্রিস্টের মানুষ হিসাবে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ সাধন এবং ঈশ্বর হিসাবে সেই যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুকে অসীম মূল্য দানের মধ্যে। একদিকে যেমন আমরা না বুঝেই বিশ্বাস করি যিশুর দ্বৈত স্বভাব তেমনি অন্যদিকে আমরা না বুঝেই বিশ্বাস করি যে, যিশু স্বর্গসুখ ভোগ করা সত্ত্বেও যন্ত্রণাভোগ করতে সক্ষম; শুধু তা-ই নয়, মানব পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর যে মৃত্যুবরণ করতে পারেন, তা ভেবে অনেকে মর্মপীড়ায় ভোগে। তবে আমরা যে ব্যাপারটা বুঝি অথচ সে বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন করি না, তা হল -- মানব দেহধারণের পরবর্তী পর্যায় এবং তার পূর্ণতা লাভ, যে-মানব পরিত্রাণের পরিণামে আমরা কিভাবে সেই পরিত্রাণের জন্য উপযুক্ত হব ও সেই পরিত্রাণকার্যে কিভাবে সহায়তা করব।

মানব পরিত্রাণের পরিণাম তাহলে কী? এর নেতিবাচক দিকগুলি হল সংস্কার কার্য-সকল, পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ও শয়তানের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি। এর ইতিবাচক দিকগুলি হল -- শয়তানের ছলচাতুরি ব্যর্থ করে পরমেশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং ঐশজীবনের বিস্তার, অর্থাৎ সেই সকল ঈশ্বর সন্তানদের পরিত্রাণ সাধন, যারা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরকে ভালবাসবে। আমাদের প্রভু যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু ব্যতিরেকে এই লক্ষ্যে কি পৌঁছানো যেত? যিশুর প্রতিটি বিন্দু রক্ত প্রতিটি বিন্দু অশ্রু, প্রতিটি প্রার্থনা আমাদের নিমিত্ত; তাঁর প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসের মূল্য অপরিসীম, তাই ন্যায়সঙ্গত কারণে আমাদের মুক্তির মূল্য হিসাবে তা যথেষ্ট। তথাপি, যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের নিরিখে তা যথেষ্ট নয়। "বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই"।

কাজেই পরিত্রাণ বা যন্ত্রণাভোগ হল ভালবাসার গূঢ়রহস্য। সাধু পল বলেছেন: খ্রিস্ট আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছেন। প্রকৃত মেষপালক তাঁর মেষদের জন্য নিজের জীবন দান করেছেন। প্রভু যিশু যদি শেষ অবধি, সেই বাক্য উচ্চারণ করা অবধি: "সমস্তই সমাপ্ত হল," আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা না দেখাতেন, তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতাম? যিশু চাইছেন, আমরা তাঁর ভালবাসা উপলব্ধি ক'রে বা অন্তত তাঁর ভালবাসায় বিশ্বাস ক'রে, আমরাও যেন তাঁকে ভালবাসি। "আমাকে যখন তুলে ধরা হবে –– অর্থাৎ জঘন্যতম অপরাধীদের মতো বলিদান করা হবে ও অপদস্থ করা হবে -- আমি সকলকে আমার কাছে ডেকে নেব"।

যিশু চেয়েছেন আমরা যেন নিজেদের তাঁর কাছে এবং আমাদের ভাইবোন মানুষের কাছে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ দিই। "আমি তোমাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেলাম। কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, নিজের ক্রুশ কাঁধে তুলে নিক এবং আমাকে অনুসরণ করুক....। তুমি কি আমায় ভালবাস? আমার মেষদের প্রতিপালন কর.....এবং একদিন তুমি তোমার হাত দু'টো প্রসারিত করবে.... আমার পাত্র থেকে তুমি কি পান করতে পার"?

(২) দেহধারণের পূর্ণতা

কাজেই মানব পরিত্রাণ হলো ঈশ্বর পুত্রের মানব দেহধারণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং তাঁকে গৌরব মুকুটে ভূষিত করা; এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে "আমি প্রভুর দাসী"– আমাদের এই আন্তরিক স্বীকারোক্তিকেও গৌরবান্বিত করা। প্রতিটি আত্মার শাশ্বত সন্তানত্ব লাভ নির্ভর করছে যিশুর দেহধারণের প্রতি সে কতটা সাড়া দিচ্ছে তার উপর, ঠিক যেমন যাজক যখন দ্রাক্ষারসের সঙ্গে জলের ফোঁটা মিশ্রণের সময় এই সুন্দর প্রার্থনাটি উচ্চারণ করেন "হে প্রভু! এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর ঐশজীবনের সহভাগী হতে পারি, যিনি আমাদের ইহজীবনের সহভাগী হয়েছেন"।

মানব পরিত্রাণের নেতিবাচক দিক হল – পাপের দিক থেকে মৃত এবং প্রায়শ্চিত্ত ও সংশোধনের মনোভাব। অন্যদিকে ইতিবাচক দিক হল অপরিসীম ঐশ প্রেমপূর্ণ জীবন এবং পরমেশ্বরের গৌরবার্থে সেই প্রেমের সম্প্রসারণ। দেহধারণ হ'ল আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দেওয়া উপহার, পবিত্র আত্মায় আমাদের জন্ম এবং ঈশ্বর সন্তান হিসাবে আমাদের বিকাশ সাধন। পরিত্রাণ হলো খ্রিস্টের দেওয়া উপহার;

পার্থিব জীবনের মিথ্যা সম্পদ অস্বীকার এবং তাঁর নিজের জীবন বলিদানের মধ্য দিয়ে, তিনি আহ্বান পেয়েছেন সেই মহৎ ত্যাগস্বীকার ক'রে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়ার। যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মূল্য দিয়ে, অন্তত নিজের মৃত্যু ঘটিয়ে, মানবজীবনে পুনঃপ্রবাহিত হয়েছে ঐশ জীবনধারা।

দেহধারণ হল: ঐশ্বরিক মাতৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা, বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন – যিশুর ভাই, বোন এবং মা হয়ে উঠা। পরিত্রাণ হল: প্রেম, যন্ত্রণাভোগ এবং অভিষ্টলাভ: রহস্যাবৃত বঁধু এবং মানব জাতির মা হয়ে ওঠা। রক্ত মাংসের দিক থেকে কুমারী মারীয়া হলেন ঈশ্বর জননী ; আত্মিক দিক থেকে খ্রিষ্টের বঁধু; এই হল মণ্ডলীর একটি অনিন্দিত প্রতীক -- মেষশাবকের বঁধু !

মানব দেহধারণ যেন মেডেলের এক পিঠ, যেটি হচ্ছে শিশু যিশু, নিষ্কলঙ্ক মারীয়ার প্রতীক বা শিশু যিশুর প্রতি সাধ্বী তেরেজার ভালবাসা প্রদর্শনের প্রতিরূপ। মেডেলের অপর পিঠ তুলনা করা যেতে পারে পরিত্রাণের সঙ্গে, মেডেলের এই পিঠ হচ্ছে ক্রুশবিদ্ধ যিশু, মর্মবিদ্ধ মারীয়ার প্রতীক, অথবা পবিত্র মুখচ্ছবির সাধ্বী তেরেজা, ঐশ পরিত্রাণের শিশির কুড়িয়ে "তাঁর সন্তানদের" উপর সিঞ্চন করছেন। মানব দেহধারণ পূর্ণ করে ভক্তের অন্তরের এই মুখ্য আকাঙ্খা "পরমেশ্বরকে ভালবাসা, তাকে নিরন্তর ভালবাসা"; বা এভাবেও বলা যেতে পারে "ঈশ্বর আমায় চালিত করুন, বাস করুন আমার অন্তরে"। মানব পরিত্রাণ আর একটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে -- ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জন করা আর তাতে উচ্ছ্বসিত হওয়াই নয় বরং নিজেকে প্রকৃত পক্ষে ভালবাসার অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করা, ভালবাসার উষ্ণতা ও রশ্মি বিচ্ছুরিত করা, মহৎ ও সুন্দর কিছুর সেবা করা, এবং নিজেকে এইভাবে গড়ে তোলা: "তোমার রাজ্যের আগমনে আমি যেন অবদান রাখতে পারি -- এবং ক্রুশ ব্যতিরেকে যদি আমার এই মনোকামনা পূর্ণ না হয় ... তাহলে, আমাকে ক্রুশবিদ্ধ কর.... আমি আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে সঁপে দিলাম"। কাজেই পরিত্রাণ হলো দেহধারণের অনুসরণী এবং মুকুটধারণ। ঈশ্বর জননী হওয়ার সম্মতি দান, যিশুকে ধারণ করা, তাঁকে বরণ করা এবং তাঁর বাক্যে বিশ্বস্তভাবে কর্ণপাত করা হল পরোক্ষভাবে মানবজাতির মাতা হওয়ার সম্মতি দান। আবার একইভাবে একথাও উপলব্ধি করা যে, ত্রাণকর্তার রক্তের বিনিময়ে আদি পাপের দণ্ডমোচন হলেও "প্রথম জীবিতদের মাতার" বিরুদ্ধে যে দণ্ড উচ্চারণ করা হয়েছিল "তুমি অনেক কষ্টে সন্তান প্রসব করবে," সেই দণ্ড এখনও বহাল আছে।

(৩) ত্রাণকর্মে আমাদের সহযোগিতা

পরমেশ্বর ধন্যা মারীয়াকে যে আহ্বান করেছিলেন, ঠিক একই আহ্বান আমাদের কাছে রাখছেন আরও অনেকের মা হওয়ার জন্য। তাহলে সেই মারীয়া, যিনি বীরচিতভাবে এই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, পরমেশ্বরের সাথে সহযোগিতায় তিনিই হবেন আমাদের আদর্শ। ধ্যান-সাধনার লেখক Canon Beaudenom আমাদের প্রভুর সহ-ত্রাণকারী মায়ের প্রতি এই অপূর্ব মর্মস্পর্শী সূক্ষ্ম উপলব্ধি বর্ণনা করেছেন -- "ওগো মা আমার, তোমার ভূমিকা এখনও শেষ হয়নি, তোমাকে আবার তা শুরু করতে হবে, তুমি সব সময়েই আমার মা হয়ে থাকবে, তুমি আমাকে সাহায্য করবে মানুষের মধ্যে জন্ম নিতে ও বেড়ে উঠতে। তারা হবে আমার দেহ এবং রক্ত। আমার জন্য যা করেছ তাদের জন্যও তুমি তা করবে। এভাবেই এই নব মাতৃত্বের নিরীক্ষে তোমার হৃদয় প্রসারিত হবে এই বিশাল পরিবারের প্রয়োজনে এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হবে জীবনধারা। তুমি আবার আমাকে খুঁজে পাবে মানুষের মধ্যে, কিন্তু তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে এসবের কারণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা তোমাকে প্রেরণা দেবে আমাকে সাহায্য করতে। তুমি কি সেই প্রতিশ্রুতি দাও? তোমার কাছে এই নির্দয় ত্যাগ যাচ্না করি..."মাতৃত্বের অর্থ কষ্ট স্বীকার"। ওগো মা আমার আমি কি আসলেই তোমার উপর নির্ভর করতে পারি? -- হে আমার প্রিয় পুত্র, আমার আমি, আমার জীবন, তোমারই হাতে আমার সব আনন্দ ..... আমি তা তোমাকে অর্পণ করতে পারি না, কারণ এসব তো তোমারই; তোমার যন্ত্রণাভোগের কাজে আর গৌরবের কাজে আমাকে ব্যবহার কর। কোন কিছুই আমাকে নিরুৎসাহিত করতে পারে না, কোন কিছুতেই আমি ভীত নই, কারণ তুমি উত্তম। আমার কাছে কোন কিছুই বিস্ময়কর নয়, তুমি যে সর্বশক্তিমান, আমাকে কোন কিছুই নিরস্ত করতে পারবে না, কারণ আমি যে তোমায় ভালবাসি !

ওগো মা আমার, কতই-না মহান আমাদের ঐক্য! তা এতই সুমহান যে, শুধুমাত্র স্বর্গেই তুমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। তখন আমার রাজত্ব হবে তোমার, আমার সন্তানরা হবে তোমার সন্তান, আমার কাছে যেমন অনুনয় করা হয় তোমার কাছেও তদ্রুপ করা হবে। তোমার মধ্য দিয়ে আসবে সমগ্র মানব–পরিত্রাণ।

-- তা কি সম্ভব ? ভালবাসা কোন সীমা মানে না। সবই সম্ভব। তোমার ভালবাসা অসীম।
-- তাহলে এই প্রতীক্ষার মধ্যে তুমি কি চাইছ আমার যন্ত্রণা ভাগ করে নিতে?
-- ভাগ করে নিতে? না, না, সব যন্ত্রণা আমিই ভোগ করতে চাই। সব যন্ত্রণা!
-- হ্যাঁ, তবেই তুমি নিষ্কৃতি পাবে তোমার সবচেয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে।

আপন সন্তানের নিদারুণ যন্ত্রণা ও মৃত্যুদর্শন। একসাথেই আমরা যাতনাভোগ করব। তুমি ঝরাবে চোখের শেষ অশ্রুবিন্দু আর আমি ঝরাব আমার শেষ রক্তবিন্দু। এই অশ্রু ও শোণিতধারা মিলিত হয়ে দেবে অসংখ্য উদার ও প্রেমময় সত্তা। যুগযুগ ধরে পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যাবে তাদের। আমরা বাস করব তাদের অন্তরে, তাদের পূজা অর্চনায়। কিন্তু আমাদের এই সুগভীর ঐক্য ঘটাতে পারে শুধু ক্ষণিকের যন্ত্রণাভোগ। বেদনা প্রেমকে তার শক্তির উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়, এই প্রেমের রাজকীয়তাকে পূত ক'রে এবং ফলপ্রসূ করে তোলে। তুমি আমাকে যা দিয়েছ, প্রিয় মা আমার, তা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং তা আমাকে যন্ত্রণাভোগ করতে শক্তি যুগিয়েছে। "ঈশ্বর রূপে এই শক্তি আমি লাভ করিনি"।

(৪) যন্ত্রণাভোগ পূর্ণ করার আবেদন

ত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি চিরজীবি খ্রিস্ট অবিরত এই আবেদন রাখছেন –"তুমি কি আমার বঁধু হবে এবং মানবজাতির মাতা হবে, যে পর্যন্ত না যন্ত্রণাভোগ দিয়ে তার মূল্য মেটাতে হয়? তুমি কি আমাকে এতটাই ভালবাস যে তুমি এসব পূর্ণ করবে? – প্রিয় যিশু আমার, আমার সর্বস্ব, বারেবারে করা তোমার এই প্রশ্ন আমায় স্মরণ করিয়ে দেয় আমার বিগত শৈথিল্য ও গাফিলতির কথা। ঠিক যেমন সাধু পিতরের বেলায় হয়েছিল। সাধু পিতর প্রতিবাদ করে বলেছিলো তোমাকে অনুসরণ করবে – প্রয়োজনে কালভেরী পর্যন্ত; সে কথা স্মরণ ক'রে আমি "হ্যাঁ" বলতে লজ্জিত। তা সত্ত্বেও আমি আন্তরিকতার সঙ্গে বলছি "তুমি তো জান প্রভু, আমি তোমায় ভালবাসি"! কিন্তু সাধ্বী তেরেজার অনুকরণে আমি এ-ও বলছি "এই অধমের প্রতি সদয় হও, দুর্বল পাপী আমি, দীন দূর্দশাগ্রস্থ আমি।" -- সাহস ধর যে দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে তোমাকে পবিত্রীকৃত ক'রে আমার কাছে চিরদিনের জন্য সমর্পণ করা হয়েছিল, তা অপরিবর্তনীয় এবং মহাসমারোহে সেই দীক্ষাস্নানে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিলো, তুমি তা ভঙ্গ করনি। জীবন হল একটি নিরবচ্ছিন্ন সূচনা, অতি উৎকৃষ্ট আদর্শ লাভ করার জন্য একটি মহৎ সংগ্রাম। পুরোহিত যেমন প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে উচ্চারণ করেন: "আমি প্রভুর বেদীতে যাব" (বলিদানের বেদীতে) তুমিও তার অনুকরণে তোমার আহ্বান নবায়ন কর এবং আরও গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম কর খ্রিস্টের সাথে তোমার মৈত্রীবন্ধনের মর্যাদা, নিজেকে আর কখনো টেনে নিয়ে যেওনা নিস্তেজ অবসাদগ্রস্থ সাধারণ জীবনে। -- প্রিয় যিশু আমার, এই তো আমি এসেছি আমার সদিচ্ছা এবং সর্বান্তকরণ নিয়ে। তোমার বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রাণ ভার্যা হতে আমায় শিক্ষা দাও এবং আমার মধ্যে যা কিছু অভাব আছে তা পূরণ ক'রে আমায় সবল কর। -- তোমার আহ্বানের সতেজতায় নিজেকে নবীকরণ করতে হলে, স্মরণে রাখ পিতার সেই প্রেরণাদায়ী বাণী, যিনি তার প্রিয় কন্যাকে আমার জন্য ত্যাগ করেছেন: -- "কে এই অদৃশ্য প্রেমিক যিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে ডেকে আমাদের কাছে যা সবচেয়ে প্রিয় এবং যা সবচেয়ে সুন্দর দাবি করেন? সে কি কোন মানুষ? -- না, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। যারা সবে জীবন শুরু করেছে তারা নিজেদেরকে তাঁর কাছে সর্মপণ করে, ঈশ্বর যে আমাদের ভালবেসে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তাঁর সেই ভালবাসায় সাড়া দিয়ে, তারা নিজেদেরকে তাঁর কাছে সমপর্ণ করে। -- যিশু আমার, কি মহান এই মৈত্রী বন্ধন, কত না চমৎকার এই আত্মত্যাগের দীপ্তি, যা দিয়ে তুমি আমায় ভূষিত করেছ, যদিও আমি তার যোগ্য নই! আগে সব কিছু মনে হত গোলাপের মতো সুন্দর, কিন্তু আমি সেই ঘোর অন্ধকার কাটিয়ে উঠেছি। উৎকর্ষতা লাভের পথে আমার থেমে যাওয়া বা নিম্নগমন করা, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসা, তাদের হৃদয় জয় করার আগ্রহে দৃশ্যতঃ সামান্য সাফল্য, আমার নগণ্য প্রচেষ্টা, ইত্যাদি সবকিছু আমাকে দেখিয়েছে জীবনের মলিন নিরানন্দ দিক।

--- এই নির্বাসন ভূমি যে তোমার আসল পিতৃভূমি নয়, যার পূর্বস্বাদ আমি তোমায় দিয়েছি যাতে তুমি আমার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে উৎসাহ পাও, তুমি যদি তা বুঝতে পার তাহলে খুবই উত্তম। তুমি তো এই আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছ, সেই আমার মধ্যে তুমি কি কোন পরিবর্তন খুঁজে পেয়েছ, বা তোমার এমনটি মনে হয়েছে? তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে বা হ্রাস পেয়েছে? -- প্রভু আমার, নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এত কিছু সত্ত্বেও তুমি তোমার সেবাকর্মে আমায় বহাল রেখেছ। অতীতে আমি বলেছিলাম: "ধন্য তারা, যারা আমার জন্য লজ্জায় পড়েনি, ধন্য তারা যারা আমাকে আমার সাধারণ কাজের মধ্যে খুঁজে পায় এবং আমায় চিনতে পারে। আমার স্বদেশবাসী আমায় গ্রহণ করল না, আমায় বিশ্বাস করল না, কারণ তাদের চোখে আমি ছিলাম সাধারণ এক মজুরের ছেলে। এখন আমি মনুষ্য আকৃতির মতো দৃশ্যমান নই, কিন্তু আমি তোমার মধ্যে বাস করছি এবং নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে উপস্থিত আছি, তোমার চারিধারে যারা আছে বা যা-কিছু আছে তাদের মাধ্যমে আমি তোমার কাছে আসি। তোমাকে ভালবাসতে দাও – অনুগ্রহের মাধ্যমে"।

(৫) প্রেম ও বিশ্বাসের সাড়া

- তুমি কি আমার অনুগ্রহে, আমার জীবন্ত উপস্থিতিতে বিশ্বাস কর? তোমার প্রতি সদা সক্রিয় আমার ভালবাসায় তুমি কি বিশ্বাস কর ?
- তোমার ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি প্রভু, কিন্তু আমার বিশ্বাস বৃদ্ধি কর, আমার সন্দেহ দূর কর, প্রভু। তাহলে তোমাকে আমার কাছে সর্মপণ করার আগে প্রথমে তোমার মধ্যে আমাকে গ্রহণ করে তোমার জীবন নবীকরণ কর। আমার পা ধুইয়ে দিতে পারলে সাধু পিতরের কতই-না আনন্দ হ'ত, কিন্তু প্রথমে আমাকে তার নিজের পা ধুয়ে দিতে হয়েছে, ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আমার এক ক্ষুদ্র সাধুর মত প্রথমে অনুগ্রহপূর্ণ ভালবাসায় তোমাকে ভালবাসতে দাও এবং আমার ভালবাসার উপহার গ্রহণ কর, যে উপহার বিশ্বাসের উদ্দীপনার অভাবে উদাসীনতার ফলে, উদার মনে সেই ভালবাসার মান অনুযায়ী জীবনযাপন করতে ভয় পেয়ে অনেকেই আমার সেই ভালবাসার উপহার প্রত্যাখ্যান করে বা অবহেলা করে।

- হে যিশু! আমার মধ্যে তোমার পুনঃ পুনঃ জন্মের জন্য আমি তো ইতিমধ্যে 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছি, আমি যে পরমেশ্বরের উপহারের জন্য তৃষ্ণার্ত।
- তাহলে আমি তোমার মধ্যে বাস করতে ও পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকতে পারি। পৃথিবীতে আমি ধন-সম্পদ, সুখ এবং সম্মান হেলায় অবজ্ঞা করতে পারতাম এবং ঐশরাজ্য স্থাপনে এই সব ব্যবহার করতে পারতাম, কারণ আমার পিতার কাছে আমার জন্য এই সব কিছুর চেয়ে অনন্তকালীন গুণসম্পদ আছে। একইভাবে, তুমি যদি বুঝতে পার যে, তোমার মধ্যে ঈশ্বরের

দেওয়া উপহার যিশু আছেন এবং তুমি যদি এ-ও বুঝতে পার যে, তিনি তোমায় অসীম ভালবাসায় ভালবাসেন, তাহলে তুমি আমায় দেখতে পাবে আমার দারিদ্র ও অনাসক্তির মধ্যে, কৌমার্য ও সংযমের মধ্যে, বাধ্যতা এবং অন্তরের দীনতার মধ্যে।

- তোমার পরিত্রাণের ডাকে আমিও সাড়া দিতে চাই, আমার অন্তরের একমাত্র জীবন্ত অমূল্য সম্পদ তোমাকে শুধু ভালবেসে নয়, বরং তোমাকে অন্যদের ভালবাসা পাইয়ে দিয়ে, আমার সম্পদ অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে তোমাকে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, যাতে তারা বৃহত্তর ঐশ পরিবারে জন্ম নিতে পারে।
- তাহলে ভালবেসে যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে তোল, বীরত্বপূর্ণ ধর্মশহীদ হওয়ার অপেক্ষা করো না, যা কখনই হঠাৎ ঘটে না। আমার আঠারো ঘন্টার নিদারুণ শারীরিক ও নৈতিক যন্ত্রণার প্রস্তুতি চলছিল ত্রিশ বছর ধরে দৈনিক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, যার সব চেয়ে বেশি মিল পাবে আমার মাতার শোকের সঙ্গে। আমার শিষ্যদেরও সব রকমের বাধা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, যা মনে হচ্ছিল ঐশজীবন বিস্তারের পথে প্রকৃত প্রতিবন্ধকতা, কিন্তু আমার অনুগ্রহ হচ্ছে ঐ সকল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।

(৬) ত্যাগের আনন্দ

দুঃখ-ক্লেশে সাধু পল আনন্দ পেতেন, এবং শক্তি পেতেন তাঁর দুর্বলতায়। আমার বিষয়ে সে সুন্দর বলেছে, "খ্রিস্ট নিজেকে তুষ্ট করতে আগ্রহী না"। তুমিও এমনটি হও। বিশেষতঃ প্রতিদিন নিজ সত্তার মৃত্যুতে, ছোট ছোট আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তোমার শিষ্যত্ব ফলপ্রসূ হবে। মানব পরিত্রাণার্থে এবং শুদ্ধিকরণে প্রথমত, শিক্ষাদান এবং কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা ভাল; আনুগত্য এবং স্বীয় দায়িত্ব অনুযায়ী বিনম্রতার সঙ্গে নিজেকে কর্মে লিপ্ত কর। দ্বিতীয়ত, প্রার্থনা আরও ভাল; আমার সঙ্গে অন্তঃসংযোগই হল সকল প্রকার প্রৈরিতিক কাজে অংশগ্রহণের উপায়। তৃতীয়ত, যন্ত্রণাভোগ হ'ল সর্বোত্তম: গমের দানা যদি মরে না যায়, তবে তা একটি মাত্র দানা হয়েই থাকে। কাজেই এই পৃথিবীর সুখ আনন্দ বপন ক'রে বা ত্যাগ ক'রে বুঝে নাও বাঞ্ছনীয় সক্রিয় ভালবাসা, যাতে এগুলি আবার শত সহস্রগুণে লাভ করতে পার, যদিও এসব অপরিহার্য উপায় নয়। Father Foch এই নীতি অনুসরণ করতেন: প্রয়োজনের সময় শুভ কোনো কিছুর সর্ব্বোত্তম সদ্ব্যবহার করা যায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে। কাজেই, প্রাণ জুড়ানো কোন কিছু দর্শনে বা নির্ভেজাল কোন আনন্দ ও প্রসন্নতা অনুভবে নিজেকে এই কথা বল: এই তো ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দের রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে, আমি যদি তা ভোগ করতে এবং পূর্ণ আস্বাদন করতে ত্বরা করি, তাহলে আমি আমার গমের দানা ভক্ষণ করে ফেলবো এবং আমার কাছে আর কিছুই বাকী থাকবে না; কিন্তু আমি যদি এই সুখ আনন্দ যা যিশুই আমাকে দেখান এবং আস্বাদন করান, তা পরিত্যাগ করি এবং যিশুর কাছে নিবেদন করি, তাহলে আমি সেই শষ্যদানা বপন করব এবং যিশুর সুনিশ্চিত জীবনে রক্ষিত অবস্থায় শতগুণে ফিরে পাব। কিন্তু সবকিছু যখন অপ্রীতিকর লাগে, যা বেশীর ভাগ সময়ই ঘটে থাকে, তখন নিজেকে এই কথা বলো পরমেশ্বর তাঁর পুত্রের সঙ্গে যেমনটি করেছেন, আমার সঙ্গেও তেমনি করছেন ; তিনি তাঁর পুত্রকে এই পার্থিব জীবনের শুরু থেকেই ত্যাগ করেছেন, এই জগতের মানুষ এবং সংসারজাত আর সব কিছুর শিকার হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে দিয়েছেন। আমাকে জানতে হবে কী করে তাঁর সঙ্গে ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ করতে হয়, যাতে আমি ভালবাসার বিধান সেই অতুলনীয় ত্যাগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারি এবং তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি: "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এই যে আমি, প্রভু"। তাছাড়া, আমার জন্য অত্যন্ত জরুরী যে, ঐশ অস্ত্রচিকিৎসক আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, রোগের প্রতিকার করবেন, প্রয়োজনে আমার উপর ছুরি-কাঁচির ব্যবহার করবেন সজ্ঞানে বা অজ্ঞান করে, যাতে সংসারজাত এই সব ক্ষণস্থায়ী সুখের আকাঙ্খা থেকে আমাকে মুক্ত করতে পারেন। এই কঠোর যন্ত্রণা হ'ল সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা বা কষ্ট, যার ফলস্বরূপ আমি হয়ে উঠব আরও সুন্দর এক ঈশ্বর-সন্তান এবং আরও অনেকে জন্ম নেবে ঈশ্বর সন্তানরূপে । সিরেনবাসীর মতো আমারও এই একটি সুযোগ যিশুকে সাহায্য করার; সিরেনবাসী শিমোনকে প্রথমে জোর করা হয়েছিল ক্রুশ বহন করতে; এই একটি সুযোগ যেখানে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের কিছু শূন্যস্থান পূরণ করার, তাঁর রহস্যময় দেহ, খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য কিছু করার। ধন্যবাদ যিশু, এই সামান্য কষ্টের জন্য, যা এনে দেবে অনন্ত মহিমা।

আমার দুটো মহৎ নিগূঢ় ভালবাসায় সহযোগী হতে এই সকল নির্দেশিকা একগুচ্ছ পুষ্প স্তবকের মতো মনে করে এই বাণী স্মরণে রেখ। দেহধারণের জন্য: "আমি সতত তা-ই করি, যা তাঁকে (পিতাকে) তুষ্ট করে"। এই হ'ল আমার সঙ্গে আত্মার সংযুক্তি। মানব পরিত্রাণার্থে: "আমি আমার পিতা এবং ভ্রাতা-ভগ্নিদের ভালবাসি, এবং পিতার সঙ্গে তাদের পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে যে কোন মূল্যে সমর্পণ করি"। এই হ'ল আমার সঙ্গে হৃদয়ের সংযুক্তি।

পুনরুত্থান - পবিত্র আত্মার যুগ

(১) আমাদের ত্রাণকর্মে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে

খ্রিস্টের পুনরুত্থান মানব ত্রাণরহস্যের তৃতীয় ভাগ। দেহধারণে পরমেশ্বর আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁকে জানার জ্ঞান; পরিত্রাণে, তাঁকে ভালবাসতে; আর এখন, পুনরুত্থানে তিনি আমাদের সক্ষম করে তুলেছেন তাঁকে সেবা করার। Fr. Putz S.J. নাটকের অনুকরণে বর্ণনা করেছেন - মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসের তিনটি অঙ্ক যার অবতরণিকায় পতন এবং যবনিকায় স্বর্গ। প্রথম অঙ্কে দেখানো হয়েছে মানুষ তার হারানো সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে; দ্বিতীয় অঙ্কে খ্রিস্ট এসেছেন নিজেকে উৎসর্গ ক'রে মানুষকে ত্রাণ করতে; তৃতীয় অঙ্কে (বর্তমান এবং সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য!) মানব জাতির কাছে ঐশজীবনের যোগাযোগের পথ পুনরায় উন্মুক্ত করে দিতে। আর তা হয়েছে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট দ্বারা পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করার মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টীয় জীবন গঠিত এই অসামান্য খ্রিস্টীয় ত্রাণকর্মের নাটক বর্তমান তৃতীয় অঙ্কে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে।

(২) খ্রিস্টযাগের উপাসনা অনুষ্ঠানে

পবিত্র খ্রিস্টযাগে, এই তিনটি অঙ্ক আনুষ্ঠানিক উপাসনায় আধাঘন্টার মধ্যে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, যাতে আমরা সেই অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারি, এবং বিশেষ সাক্রামেন্তীয় কার্যকারিতার সঙ্গে এই খ্রিস্টযাগের ফল ভোগ করতে পারি। দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্য খ্রিস্টযাগ হল অবতরণিকা স্বরূপ। প্রথম অঙ্ক: অর্ঘ্য আনয়ন ও উৎসর্গ থেকে ধন্যবাদিকা স্তুতি পর্যন্ত চলমান; দ্বিতীয়: খ্রিস্টের বলিদান – ধন্যবাদিকা স্তুতি থেকে প্রভুর প্রার্থনা পর্যন্ত; তৃতীয়: ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন – প্রভুর প্রার্থনা থেকে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ পর্যন্ত। যবনিকা (খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের পর থেকে শেষ আশীর্বাদ পর্যন্ত) হ'ল আমাদের জীবনে খ্রিস্টের বলিদান বহমান রাখা।

(৩) উপাসনা বর্ষে

আগমনকাল আনন্দময় অন্বেষণের সদৃশ – ত্রাণর্কতার জন্য প্রতীক্ষা; বড়দিন এবং তপস্যাকাল দেহগ্রহণ ও পরিত্রাণের সদৃশ; পুনরুত্থানকাল - স্বর্গারোহণ ও পবিত্র আত্মার অবতরণের সদৃশ ঐশজীবনের সাথে সংযোগের নবায়ন: যাতনাভোগের ফল পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মণ্ডলীতে বর্ষণ করা হয়েছে। এই উপাসনা চক্রের গুরুত্ব বোঝা যায় সময়ের ব্যাপ্তির মাধ্যমে – বাহান্ন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় বত্রিশ সপ্তাহ।

(৪) মণ্ডলীর জীবনে

পুনরুত্থান এমনই একটা নিগূঢ়তত্ত্ব যার সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়; এবং "পবিত্র আত্মা বিষয়ক ঐশ্বতত্ত্ব এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি" (Fr. Yves Congar). এ বিষয়ে আরও ভাল করে বুঝতে হলে একথা স্মরণে রাখা ভাল যে, খ্রিস্টের জন্য পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পবিত্র আত্মাকে দান করা এ সব কিছুই পূর্ণ হয়েছিল পুনরুত্থান দিবসে। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট মাগদালার মারীয়াকে বলেছিলেন তাঁর স্বর্গারোহণের কথা ঘোষণা করতে: "আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমার পিতা এবং তোমাদেরও পিতা"। সেই সন্ধ্যায় তিনি তাঁর শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করেছিলেন: "তিনি তাদের উপর ফুঁ দিলেন এবং বললেন,পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর....."।

পুনরুত্থান বন্দনা, ধন্যবাদিকা-স্তুতি - স্বর্গারোহন এবং পবিত্রআত্মার অবতরণ পরিত্রাণের ইতিবাচক দিক ব্যক্ত করে, যা পবিত্র আত্মার শুভ ফলের বিতরণ ও মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, এবং যাকে "ধরণীতে খ্রিস্ট বহমান" বলে Bossuet আখ্যায়িত করেছেন।

পুনরুত্থানে আমরা গান করি: "প্রকৃত মেষ..... যিনি তাঁর মৃত্যু দিয়ে আমাদের মৃত্যু নাশ করেছেন, এবং পুনরায় উত্থিত হয়ে আমাদের পুনর্জীবন দিয়েছেন"।

স্বর্গারোহণ দিনে আমরা গাই: " খ্রিস্ট আমাদের প্রভু, ... স্বর্গে উন্নীত হয়েছেন .... যাতে তিনি আমাদের অংশী করতে পারেন তাঁর ঈশ্বরত্বে"।

পঞ্চাশত্তমীতে আমরা গাই: "খ্রিস্ট আমাদের প্রভু .... পবিত্র আত্মাকে তাঁর দত্তক সন্তানদের উপরে পাঠিয়েছিলেন যেমন তিনি সংকল্প করেছিলেন"।

মৃত্যুর পরে তাঁর কোন ক্ষমতা ছিলো না, কিন্তু তিনি লাভ করেছেন নতুন জীবন যা তিনি পবিত্র আত্মাকে বর্ষণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন পুনরুত্থানের দিন থেকে পৃথিবীর অন্তিমকাল পর্যন্ত।

স্বর্গারোহণ এবং পঞ্চাশত্তমীর আলাদা কোন গুরুত্ব নেই, আমাদের বিশ্বাসের জন্য তা ঐতিহাসিক ঘটনা। মৃত্যু এবং পাপের উপর খ্রিস্টের বিজয়ী হওয়ার মুহূর্ত থেকে পূর্ণতা লাভ করেছে সামসঙ্গীত ১১০ এর ভবিষ্যৎ বাণী: "শোন, আমার প্রভুর প্রতি প্রভুর বাণী: এসো আমার ডান পাশে বস তুমি; তোমার শত্রু যারা, তাদের করব আমি তোমারই পাদপীঠ"। শেষ বিচারের সেই সময় পর্যন্ত খ্রিস্ট দূরে থাকেন না এবং নিষ্ক্রিয়-ও থাকেন না; তিনি অবিরত তাঁর পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করছেন আমাদের বন্ধু হিসেবে গড়ে তুলতে, নেকড়ে বাঘকে মেষশাবকে রূপান্তরিত করতে, আগাছা থেকে ফলাতে গমের দানা, মজুরকে আমন্ত্রণ করতে তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ

করতে; অপব্যায়ী পুত্র-কন্যাদের ফিরিয়ে আনতে; পবিত্র আত্মার অমূল্য এবং ফলপ্রসূ প্রতিভা সবাইকে অর্পণ করতে, সেই পবিত্র আত্মা যিনি তাঁর অপর সত্তা। এই হলো পরমেশ্বরের বর্তমান উপহার। "পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বর জগতকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁরা জগতকে এমনই একজনকে দিয়েছেন যিনি তাঁদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তিনি সেই পবিত্র আত্মা যিনি তাঁদের ভালবাসা এবং তাঁদের হৃদয়"। কাজেই, "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি" এই কথা বলার পর আমরা এই কথা যোগ ক'রে ঠিকই বলি: "পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমা,...."। আমরা বিশ্বাস করি যে, পঞ্চাশত্তমীর দিন শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করেছিলো প্রচণ্ড এক বাতাসের শব্দে অগ্নি-জিহ্বা রূপে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সেই একই পবিত্র আত্মাকে আমরা পেয়েছি দীক্ষাস্নানে, হস্তার্পণে এবং পুণ্য পদাভিষেকে, অদৃশ্য রূপে সাক্রামেন্তের মাধ্যমে হস্ত-অর্পণ এবং পবিত্র তেলের অভিষেকের দ্বারা। কিন্তু প্রকৃত অনুগ্রহ রূপে যে পবিত্র আত্মার অবিরাম আগমন, এবং প্রতিটি ভক্তের অন্তরে পবিত্রীকৃত কৃপা রূপে তাঁর যে অধিষ্ঠান তা জানাও হয়না এবং চর্চাও করা হয়না । আমরা জানি যে, পবিত্র আত্মা খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহের অন্তঃকরণ এবং মণ্ডলীর অদৃশ্য চালক। আমরা পবিত্র আত্মার অনুশাসনে বাস করি। কিন্তু অনেকের কাছে তিনি অজ্ঞাত ঈশ্বর।

(৫) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে পবিত্র আত্মা

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে ধারণা পেতে আমাদের ক্ষাণিকটা অসুবিধা হয়, অন্যদিকে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বেশ কিছুটা স্পষ্ট ধারণা আছে। পুত্র ঈশ্বর আমাদের মত মানুষ হয়েছেন। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যত রকমের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তমটি হল "মৃদু মন্দ বাতাস" যা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। যিশু নিকোদেমকে বললেন "কেউ জানে না তা কোথা থেকে আসছে আর কোথাই বা যাচ্ছে"। আক্ষরিক অর্থে "আত্মা" হচ্ছে "নিঃশ্বাস"। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেহগত জীবনে বায়ু মণ্ডলের যতটা প্রয়োজন, পরমেশ্বরে নিহিত আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ততটাই প্রয়োজন। Cardinal Mercier তার যাজকদের এই কথা বলতেন: "তোমরা খ্রিস্টের প্রকৃত এবং পূর্ণ ধর্মপ্রচার করছ না, প্রচার করছ না জীবন্ত খ্রিস্টকে, পবিত্র আত্মাকে, পবিত্রীকরণের কৃপা, পুণ্য খ্রিস্টযাগ, ইত্যাদি –– কারণ তোমরা সেই মত জীবন যাপন করছ না, তোমাদের আন্তর জীবনে ওই রহস্যগুলির কোন স্থানই নেই, আর থাকলেও তা খুবই সামান্য"। আমরা বাস করি প্রেমের বিধি ব্যবস্থায়, এবং আমরা এমন আচরণ করি যেন সেখানে পবিত্র আত্মা অনুপস্থিত।

(৬) তাঁকে কীভাবে জানব?

সুখের বিষয় যে, পবিত্র আত্মা এমন একজন যিনি সর্বতোভাবে জানেন। তিনি আলাদা কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি প্রত্যাশা করেন না যা পিতা ও পুত্র থেকে স্বতন্ত্র: "যিনি পিতা ও পুত্রের সাথে একই পর্যায়ে পূজিত ও মহিমান্বিত হন"। ফাদার Plus S. J. লিখেছেন যে, আমাদের ধর্মবিশ্বাস খ্রিস্ট-কেন্দ্রিক। তাঁর জীবন্ত আধার (মনস্ট্রান্স) খ্রিস্টকে বাদ দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে নিয়ে ধ্যান করব না কারণ খ্রিস্ট নিজে বলেছেন: "প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত"। পবিত্র আত্মা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সেই ব্যক্তি যিনি বাহ্যিক ভক্তি প্রদর্শন কদাচিত প্রত্যাশা করেন; কিন্তু আমরা তাঁর কাছে পরোক্ষভাবে পৌঁছতে পারি যিশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে। যিশুর মানবীয় ভালবাসা থেকে শুরু করে আমরা তাঁর ঐশ ভালবাসা অনুধাবন ক'রে পবিত্র আত্মার কাছে পৌঁছে যাই, সেই পবিত্র আত্মার কাছে যিনি পবিত্র ত্রিত্বের ভালবাসার মূর্তরূপ। পবিত্র আত্মা তাঁর দিক থেকে আমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত করেন এবং আমাদের খাঁটি ভক্তি প্রদান করেন এবং প্রদান করেন আধ্যাত্মিক মঙ্গলময়তার আস্বাদন।

(৭) তাঁকে কীভাবে ভালবাস?

পবিত্র আত্মার ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে কেউ একথা বলতেই পারে যে, তিনি হলেন পরমেশ্বরের মাতৃরূপ ভালবাসা। একজন উত্তম মায়ের মত অক্লান্ত, নিষ্ঠাবান, যদিও প্রচ্ছন্ন। ঈশ্বর সন্তান হিসেবে আমরা পবিত্র আত্মা হতে জাত, এবং তিনি অনুক্ষণ প্রতিপালন করছেন, শিক্ষাদান করছেন, প্রতিমুহূর্তে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করছেন।

এসো হে ধন্য পবিত্র সৃষ্টিকর্তা
অধিষ্ঠান কর মোদের অন্তরে
এসো তোমার কৃপা ও ঐশ সহায়তা নিয়ে
পূর্ণ করতে মোদের হৃদয় **যা তুমিই গড়েছ**

একজন মায়ের মতই আমাদের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, আমাদের তুচ্ছ বিরোধিতা অথবা তাঁকে বাদ দিয়ে কাজ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তিনি আমাদের ধমকান না। আমরা আমাদের নিজেদের যতটা না জানি, তিনি আমাদেরকে তার চাইতে ভাল জানেন। এই পৃথিবীতে আমাদের সারা জীবনে আমরা যদি তাঁকে জেনে শুনে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রত্যাখ্যান না করি, তিনি কখনই আমাদের ভালবাসতে, সাহায্য করতে এবং শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হবেন না।

(৮) তাঁর সঙ্গে কীভাবে সেবা করব

আমরা কীভাবে এ সবের চর্চা করব? আমাদের মধ্যে তাঁর কার্য্যাবলী স্বীকৃতি দিয়ে আমরা তাঁর সাথে সহযোগিতা করব। আমরা চেষ্টা করব তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত এবং সচেতন-যন্ত্র হয়ে উঠতে। "এসো আত্মা পরমেশ্বর"! এর অর্থ এই প্রত্যয় ব্যক্ত করা যে, গুরু পাপ দিয়ে সেই জ্যোতি নিভিয়ে দেব না, লঘুপাপ দিয়ে তাঁকে দুঃখ দেব না, তিনি আমাদের যা কিছু করতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, অবহেলা এবং প্রত্যাখান করে তা বাধা দেব না। পবিত্র আত্মাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন আত্মকেন্দ্রিক না ক'রে সমাজ কেন্দ্রিক ক'রে তোলেন। তিনি আমাদের শেখান সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা করতে এবং পরমেশ্বরকে **আমাদেরও** পিতা বলে সম্বোধন করতে। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা যথাযোগ্য ভাবে যিশু নাম উচ্চারণ করতে পারি না। তিনি প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। বাস্তবে দ্বিতীয় আজ্ঞাটিই যে প্রথম তিনিই আমাদের তা বুঝিয়ে দেন, কারণ দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রথমটি অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান এবং ফলস্বরূপ এতেই রয়েছে বিধানের পূর্ণতা। কার্ডিনাল Suenens কে ধর্মশিক্ষার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ করতে তিনিই অনুপ্রাণিত করেছেন:

ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন-
তাঁকে জানতে এবং জানাতে
তাঁকে ভালবাসতে ও ভালবাসাতে
তাঁকে সেবা করতে ও সেবা করাতে।

পবিত্র আত্মা আমাদের অনুপ্রাণিত করেন অন্যদের গ্রহণ ক'রে নিগূঢ় দেহের মস্তক যিশুকে গ্রহণ করতে। পুনরুত্থান-কালের দায়িত্ব পালনের পূর্ণতা হলো - নিগূঢ় দেহের সাথে মিলনে পুনঃপ্রবেশ, সেই নিগূঢ়দেহ – যার অন্তঃকরণ পবিত্র আত্মা – তিনি আমাদের তৎপর করেন অন্যদের সাথে কাজ করতে।

মণ্ডলীর প্রথম মহাসভায় তাঁর অদৃশ্য সহযোগিতা সম্বন্ধে শিষ্যেরা সচেতন ছিল: তাঁরা একটি বড় সমস্যার সমাধান করেছেন একটি বিধানের মাধ্যমে, যেটি শুরু হয়েছে এইভাবে, " স্বয়ং পবিত্র আত্মা এবং আমরা নিজেরাও স্থির করেছি যে...." (শিষ্য: ১৫ঃ ২৮)।

পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ছিলেন পবিত্র আত্মা দ্বারা মনোনীত হাতিয়ার, কারণ তিনি ব্যক্তিগত মেধা ও জ্ঞানের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতেন না।

কিন্তু জীবনদায়ী আত্মা শুধু মহাসভা, পোপ এবং প্রচারকদের মধ্যে সক্রিয় নন। তিনি প্রতিটি মানুষের আধ্যাত্মিক পরিচালক; তিনি প্রতিটি দিন এবং প্রতিক্ষণের প্রভু; তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় পবিত্র আত্মার নীরব শব্দতরঙ্গ দ্বারা উদ্বেলিত তৎপর ও প্রশান্ত হৃদয়ে; তাঁর আগমন এবং আবেদনের কখনই অবসান ঘটে না-

> আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন
> তোমাদের হৃদয় কঠিন ক'রে তুলো না....

জেরুসালেম ধ্বংস হয়েছিলো কারণ ঈশ্বরের সেই ক্ষণ যখন উপস্থিত হয়েছিলো তখন সে তা চিনতে ব্যর্থ হয়েছিলো। আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয় আমরা কী বেছে নেব তার উপর: "প্রত্যাখান" বা "সহযোগিতা"।

প্রথমেই আমাদের তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হবে একটি দলের সদস্য হয়ে। তারপরে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যেখানে দুই বা তিনজন আলোচনা করে সেখানে তারই মাধ্যমে খ্রিস্ট উপস্থিত। কাথলিক এবং প্রৈরিতিক কর্মীদলের (এপোসটলিক অ্যাকশন গ্রুপের) ছোট ছোট আলোচনা সভায় তিনিই সর্বদা প্রথম উপস্থিত হন এবং পরামর্শ দেন, এরপরে তিনি সহায়তা করেন কার্যকারী অগ্রগতি তদারক ক'রে। এসো সৃজনী পবিত্র আত্মা! নতুন ও পুরাতন! পুনঃবিবেচিত চিন্তা, পুনঃবিরচিত! পবিত্র আত্মা বরফশীতল নন, এবং নেতিবাচক রক্ষনশীলও নন। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে বিভিন্ন মহাসভায় প্রভু রূপে নয় বরং পালকীয় ভূমিকায়, শাসকের ভুমিকায় নয় বরং মাতৃসুলভ ভূমিকায় উপস্থাপন করেন।

স্বর্গলোক

(১) স্বর্গ কোথায় ?

স্বর্গারোহণ আমাদের চিন্তাধারাকে সেই স্বর্গলোকে নিয়ে যায় যেখানে যিশু উত্থিত হয়েছেন আমাদের জন্য একটি আবাস প্রস্তুত করতে। তাহলে স্বর্গ বলতে কি আমরা সুনীল মহাকাশ পেরিয়ে কোনও এক রাজ্যের কথা ভাবব? বাইবেলে যাকোব বর্ণিত স্বর্গ থেকে নেমে আসা সোপানের শুরু থেকে শেষের ধাপ সেই নতুন সিয়ন পর্যন্ত যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠ করে ঈশ্বরের আবাস সীমাহীন নীলিমায় –– স্বর্গলোক সম্পর্কে সেই ধারণাই জোরালো করে তোলে। কিন্তু বাইবেলে এমন ভাষারই ব্যবহার করা হয়েছে, যে ভাষায় মানুষ সেই সময় অভ্যস্থ ছিল; তখন পর্যন্ত মানুষ জানতো সূর্য ওঠে ও অস্ত যায় এবং মানুষ বিজ্ঞানের ভাষা নিয়ে ভাবতো না। মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় Gagarin ঈশ্বর কিংবা স্বর্গদূতদের দেখা পাননি, কিন্তু তিনি এমন একটি দ্বার খুলে দিয়েছেন, যার ফলে, মেঘমালার উপরে স্বর্গের অবস্থান, দান্তের এই দুর্বল চিন্তাধারা চিরকালের মতো নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। শুধু বিজ্ঞানীরা নন, শত শত বছর ধরে নিরক্ষর খ্রিস্টভক্তরাও জানতেন যে, ঈশ্বর সেখানে অবস্থান করছেন না। আমরা যদি এক স্থানে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল তুলে আকাশে স্বর্গের দিকে নির্দেশ করি এবং ভূপৃষ্ঠে আমাদের ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে অন্যরাও যদি আমাদের মতো করে, তাহলে আমরা একে অপরের বিপরীত দিকে স্বর্গের অবস্থানের নির্দেশ করব।

যেখানে ঈশ্বর সেখানেই স্বর্গ। অর্থাৎ তা প্রত্যেক স্থানে এবং হতে পারে যে কোন স্থানে। আসলে স্বর্গ বলতে কোন স্থান বোঝায় না, বরং একটি অবস্থা বোঝায়। ঈশ্বর, স্বর্গদূত এবং পার্থিব দেহ থেকে বিমুক্ত আত্মা এ সবই অশরীরী অবয়ব, এবং তারা স্থান কাল পাত্র বা ত্রিমাত্রিক রূপ দেহ-মন-আত্মা নিয়ে ভাবিত নয়। এমন কি খ্রিস্টের পুনরুত্থিত দেহ এবং তার মা ধন্যা মারীয়ার দেহ অশরীরী অবয়ব ধারণ করেছে, যা যে-কোন পদার্থ ভেদ করে চলতে পারে এবং যার বাস করার জন্য বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজন হয় না এবং তারা ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর যে কোন স্থানে উপস্থিত থাকার আনন্দ ভোগ করতে পারেন । তবে একান্তই যদি স্বর্গের অবস্থান সম্বন্ধে ভাবতে হয়, তবে এই কথাই বিশ্বাস করা সমীচীন যে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের অবস্থান। পৃথিবীর বাইরে কিছু নেই, আছে শুধু পৃথিবী। "তোমরা দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে আছ কেন?" শিষ্যদের এই কথা বলা হয়েছিল। আসল কথাটি খেয়াল করুন, "জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি"। ঈশ্বর পৃথিবীতে এসেছেন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে যাননি। কাজেই ঈশ্বর যেখানে আছেন বলে তিনি নিজে দাবি করেছেন, আমরা যদি সেখানে তাঁর সন্ধান না করি তবে অন্যত্র তাঁর সন্ধান করা বৃথা।

(২) স্বর্গ কী ?

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো - স্বর্গ বলতে কী বোঝায়? কিছু কিছু ধর্মশিক্ষায় স্বর্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তা হলো চূড়ান্ত পুনরুত্থানের পরে পূর্ণ আনন্দের অবস্থা, নতুন পৃথিবীতে একটি পার্থিব স্বর্গ, যেখানে বিরাজ করছে শান্তি, ন্যায়ধর্ম, প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, এবং যেখানে মানুষ সেই ঈশ্বরে পূর্ণ আনন্দ ভোগ করবে, যিনি প্রাণের আরাম ও প্রেমস্বরূপ। কিন্তু পার্থিব স্বর্গের এই সংজ্ঞা লিম্বস্থানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অনন্ত আনন্দদীপ্ত দিব্যদর্শন ও আধ্যাত্মিক পরমানন্দ তারা যে ক্লান্তিহীন ভাবে ভোগ করতে পারবে, সেই উপলব্ধি অনেক খ্রিস্টভক্তের নেই এবং প্রকৃত স্বর্গ ও লিম্বস্থানের মধ্যে যদি একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে, সন্দেহ হচ্ছে যে, বেশির ভাগ ভক্তই দ্বিতীয়টি পছন্দ করবে।

সঠিক উত্তর হল: ঈশ্বর-ই স্বর্গ; স্বর্গ হ'ল আনন্দদীপ্ত ঐশদর্শন, স্বর্গীয় প্রেম; স্বর্গ হ'ল ঈশ্বর সাধু-সাধ্বী ও আমাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে এক অনির্বচনীয় মিলন ও সান্নিধ্য লাভ, এবং অন্তিম পুনরুত্থানের আগে পৃথিবীতে ঐশরাজ্য স্থাপনের জন্য প্রশংসনীয় ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা তার পছন্দের স্বর্গের বর্ণনা এই ভাবে করেছেন: "ভালবাসা পাওয়া, ভালবাসা দেওয়া এবং ভালবাসার কারণ হয়ে ওঠা"। সাধ্বী তেরেজা যখন বলেন যে, তিনি পৃথিবীতে সৎকর্ম সাধন করে স্বর্গীয় জীবন উপভোগ করতে চান, তা আমাদের খুবই মনঃপুত হয় এবং শুনতেও ভাল লাগে। কিন্তু আমরা নিজেদের যদি এই প্রশ্নগুলি করি, তাহলে আমরা নিজেরাই আশ্চর্য হয়ে যাব। সাধ্বী তেরেজা আর কী-বা করতে পারতেন? আর কোথায়ই বা যেতে পারতেন? যেখানে খ্রিস্ট নেই সেখানে কি? যেখানে যিশুর মা নেই সেখানে কি? খ্রিস্ট অবসর নেননি। তিনি এখনও নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন ("আমি সেই খ্রিষ্টস্ট যাকে তুমি নির্যাতন করছো ") এবং আমরা নিজেরাও এখনই অবসর নিচ্ছিনা।

(৩) কীভাবে স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করা হবে?

এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই। সেই প্রস্তুতির একমাত্র পথ হচ্ছে এখনই স্বর্গরাজ্য শুরু করা। আমরা যদি এখনও তা করে না থাকি, তবে সেই কাজই হবে আমাদের জরুরী থেকে জরুরী, প্রথম করণীয়। স্বর্গে বাস করার অর্থ এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সঙ্গ লাভ করা। দীক্ষাস্নানের দিন সেই স্বর্গের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। যখনই আমরা ভালবাসি, তখনই আমরা সেই স্বর্গে পৌঁছে যাই। দীক্ষাস্নান প্রার্থীকে পুরোহিত বলেন, "শাশত জীবন লাভ করতে হলে এই আদেশ পালন কর, *তোমরা ভালবাস....*" অন্তিমকাল পর্যন্ত আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এক দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের জন্য আমাদের মনোনীত করা হয়েছে। মৃত্যুর পরেও আমাদের বিশ্রাম নেই। আমাদের মনে যেন কোন বিভ্রান্তি না থাকে। স্বর্গ এমন কোন পর্যটন কেন্দ্র

নয় যেখানে অবসর প্রাপ্ত প্রাক্তন খ্রিস্টভক্তরা, গ্রহ নক্ষত্রের ওপারে, অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকবে এবং ঈশ্বর তাদের উজ্জ্বল মুকুট ও পুরস্কারে ভূষিত করবেন। তবে হ্যাঁ এমনটা ঘটতেও পারে যদি আমরা তাঁর পুত্রের অধীনে কঠোর পরিশ্রম করি। সিদ্ধগণের সমবায় কথার অর্থ হল এই: দৃশ্য এবং অদৃশ্য উভয়ই একত্রিত হয়ে খ্রিস্টের পরিচালনায় যৌথ ভাবে কাজ করছে, "প্রতিদিন, পৃথিবীর অন্তিমকাল পর্যন্ত"।

পরিত্রাণ এমন কিছু নয় যা হাতের কাছে 'তৈরী করা আছে'; বরং তা 'তৈরী করে নিতে হয়'। খ্রিস্ট উদ্ধার করেননি, তিনি পরিত্রাণ করেছেন। "আমার পিতা বিরামহীন ভাবে কাজ করে চলেছেন, আর আমিও তা-ই করছি"। বাণী দেহধারণ করেছেন এবং এখনও আমাদের মধ্যেই বাস করছেন। "স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরেই আছে। কেউ যদি ভালবাসে, আমার পিতাও তাকে ভালোবাসবে এবং আমরা তার কাছে আসব এবং তার মধ্যে আমাদের আবাস গড়ে তুলব"। তাহলে ঈশ্বরকে কোথায় ভালবাস, তাঁর স্বর্গে? তারা নক্ষত্র ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি তাঁকে ডাক? তিনি সেখানে নেই। তিনি এখানে, কোথাও তোমার খুব কাছেই আছেন। হয়তো তিনিও তোমারই মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, কারণ তা দেখতে খুব সুন্দর। হতে পারে তিনি ক্ষুধার্ত, ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছেন, অথবা এতই দুর্বল যে মাথা তুলতে পারছেন না আর তুমি যদি তাকে গরম করার ব্যবস্থা করে না দাও বা তাঁকে সান্ত্বনা না দাও, তাহলে তুমি একটা বড় সুযোগ হারাবে। পুরোপুরি হারাবে। "কিন্তু প্রভু.....কখন ?"

শেষ বিচারে সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হবে এই যে, তখন দেখা যাবে প্রথম আজ্ঞাটি হল আসলে দ্বিতীয়, অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের শুরু।

তুমি যদি বল, "আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি" তাহলে আমি বলব, তোমার ধর্মপ্রাণ হৃদয় সংবেদনশীল; দেখা যাক কী হয়, কিন্তু তুমি যদি বল, "আমি প্রতিবেশীকে ভালবাসি" আমি মনে মনে বলব, "অপূর্ব! দেখি সত্যি কি-না। অন্ততঃ এমন একজনকে দেখলাম যে ঈশ্বরকে সমর্থন করে"। আমি কি ঈশ্বরের স্বর্গে ঈশ্বরকে ভালবাসি? আসলে আমি কিছুই ভালবাসি না, মনগড়া কিছু জিনিস ছাড়া আমি আর কিছুই ভালবাসি না। ঈশ্বর নিজেই বলেছেন তিনি সেখানে নেই।

সপ্তাহে আধা ঘন্টার মতো গির্জায় অচেনা অজানা মানুষের পাশে বসে, দাঁড়িয়ে অংক কষার মতো হিসাব নিকাশ করে পরিত্রাণ এবং স্বর্গরাজ্য লাভ করা খুবই সহজ ব্যাপার। আমাদের যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে। যে লোক খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করছে, সে কি স্বাভাবিক নিয়মে স্বর্গের নাগরিকত্ব লাভ করছে? তার মত অন্য যারা খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করছে, তারা সবাই তারই ভ্রাতাভগ্নি। যে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে, সে তার সমস্ত ভাইবোনদেরও গ্রহণ করে। এই হলো খ্রিস্টীয় আত্মত্যাগ এবং পরিত্রাতার মৃত্যু ও যাতনাভোগের প্রবাহধারা। কাজেই আমরা একে অপরকে ভালবেসে ঐশপ্রেম বুঝতে পারি। আর এভাবেই আমরা চিনবো..... স্বর্গ!

তবে ব্যাপারটা সবসময় সহজ না। গির্জাঘরের মধ্যে তা সহজ ছিল। ঈশ্বর অভিযোগকারী, যখন আমরা ভুল করি তিনি নীরব থাকেন। আমরা মনমরা বা নিঃসঙ্গ বোধ করি। আবার খুব শীঘ্রই সেই অনুভূতি ঝেড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নি! সে তো নীরব থাকে না। সে যদি আমাদের দিকে ফিরে তাকায়, (সে তো আরও অস্বস্থিকর!) যা–ই হোক সেই ভ্রাতা বা ভগ্নি ক্ষুধার্ত, ঠাণ্ডায় জমে গেছে, তৃষ্ণার্ত; সে অপেক্ষা করছে এবং শেষ বিচারের দিনেও অপেক্ষা করবে। "স্বর্গরাজ্যেও" সে অপেক্ষা করতে থাকবে।

(৪) কীভাবে এখনই শুরু করব?

"হে ঈশ্বর তুমি মনুষ্য প্রকৃতি কত সুন্দর ভাবে মর্যাদায় পূর্ণ করে গড়ে তুলেছ, করেছ নবায়ন আরও সুন্দর ভাবে", হে ঈশ্বর মানুষকে ভালবেসে আমরা তোমায় ভালবাসি, যে মানুষের মধ্যে তুমি অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশে আছো, "অনুনয় করি, এই জল ও দ্রাক্ষারসের নিগূঢ় রহস্যের মধ্য দিয়ে আমরা যেন তাঁরই ঐশজীবনের সহভাগী হয়ে উঠি, যিনি আমাদের মানব জীবনের সহভাগী হয়েছেন"। .....পৃথিবী ও স্বর্গের এই অবিচ্ছেদ্য মিলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বর প্রদান কর, তুমি যেমন মনুষ্য দেহধারণ করেছ, আমরাও যেন তেমনি প্রেমপূর্ণ হতে পারি, (এই হল তাঁর ঐশ জীবনের সহভাগী হওয়া)।

শেষ বিচারে দেখতে পাব যে, রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে খ্রিস্ট নিজেকে আমাদের দিয়েছেন, যাতে আমরা প্রতিদিন আমাদের ভ্রাতা ভগ্নিদের নিকট আমাদের নিজেদের দেবার জন্য শক্তি পাই।

তুমি হয়তো আপত্তি করে বলবে: এই "পরবাসের" পরিকল্পনা তো আমরা করিনি। সাধু পল নিজেই আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন: "তোমরা আগন্তুক এবং পর্যটক, তোমরা তীর্থযাত্রী.....। তোমাদের আবাস স্বর্গলোকে"। এর অর্থ হল আপাতঃ দৃষ্টিতে আমরা পৃথিবীকে যেভাবে দেখছি ঠিক সেইভাবে গ্রহণ না করা, এখানে এমন ভাবে জীবন যাপন করব না, যাতে ঈশ্বর আমাদের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করেছেন তা থেকে বিচ্যুত হই। মানুষ সন্তুষ্ট না, স্থায়ী না, তৃপ্ত না। স্বর্গে বাস করার অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীতে বাস করা। অর্থাৎ ভারাক্রান্ত, আগন্তুক, পরস্পর বিরোধী, উপেক্ষিত, অচেনা: "পিতা, এই পৃথিবী তোমায় চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি তো তোমায় জানি"।

এই পৃথিবীতে, যেখানে একে অপরকে ভালবাসতে চায় না, সেখানে ভালবাসা দেখানো; যেখানে যুক্তিতর্ক ছাড়া মানুষ আর কিছু মেনে নিতে চায় না, সেখানে বিশ্বাস করা; যেখানে প্রত্যেকে নিজেকে সম্মানিত ভাবে, সেখানে বিনম্র হওয়ার চেষ্টা করার অর্থ এমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া যেখানে একজন মানুষ বিশ্রাম নিতে মাথার নীচে রাখার জন্য একটি ইট পর্যন্ত পায় না। পথিক হতে হবে, এমন এক পথিক যে সর্বদা সজাগ, শান্ত হাসিখুশি, তার অন্তরে জ্বলবে প্রচার করার অদম্য আগুন, তার নিজের আবাস থেকে নিয়ে আসা এই সংবাদ প্রচার করা: "ঈশ্বর তোমায় ভালবাসেন, তোমাকে ঈশ্বরের প্রয়োজন," তার অন্তর উপচে পড়ছে যে শুভ সংবাদে, সেই

সংবাদ সবার কাছে জানানো; যে গোপন রহস্য সে জেনেছে তা এই পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করা: "একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং তিনি যাকে প্রেরণ করেছেন সেই খ্রিস্টকে জানা-ই হল অনন্ত জীবন "।

খ্রিস্ট, যে পৃথিবীর জন্য প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেছেন এবং যে পৃথিবীকে ঈশ্বর এতো ভালোবেসেছেন, এই দুই পৃথিবীর সীমারেখা আমাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং এই সীমারেখা আমরা যে কোনো দিকে সরিয়ে নিতে পারি।

এই পৃথিবীর ভাল-মন্দের মূল্য স্বর্গেও থাকবে কারণ তা তো আমাদেরই কর্মফল; আমরা, যারা খ্রিস্টের দেহ, খ্রিস্টের হাত, খ্রিস্টের পা, খ্রিস্টের চূড়ান্ত ফসল। খ্রিস্ট তামাশা ক'রে আমাদের বলেননি যে তিনি আমাদের প্রেরণ করছেন। আমরা যে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছতে পারব, আমাদের উপর ঈশ্বরের সে ভরসা আছে। তা যদি না-ই থাকতো তবে তিনি আমাদের এই দুঃখময় পৃথিবীতে কষ্টের জীবন কাটাতে দিতেন না। তুমি কি সত্যিই ভাবছো ঈশ্বর স্বর্গরাজ্য নিয়ে তোমার জন্য বসে আছেন, অনন্তকাল অপেক্ষা করে আছেন, একদিন আমাদের এই কথা শোনাবেন বলে: যথেষ্ট হয়েছে, এসো, আনন্দ কর, কাজ করার অনেক ভাণ করেছো। যা যা করতে বলেছিলাম, তা সব করেছো। অবশ্যই তা মজা করে বলেছিলাম। এবার আমি নতুন কিছু করবো। পুরানো সব কথা ভুলে যাও (যে কাজের কথা বলেছিলাম), এবার দেখ আমি কেমন স্বর্গ তৈরী করে রেখেছি।

যিশু খ্রিস্ট একজন উদাসীন পথিকের মতো এই পৃথিবী ভ্রমন করে যাননি। তাঁর রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিতে তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন। এই রাজ্য এবং পার্থিব রাজ্যের সীমানা আমাদের নিজেদের ঘরবাড়ী, আমাদের সর্বস্ব থেকে আলাদা করে দেয়। তবে এই সীমানা সরানো যায়। "তোমরা কি এই কথা বুঝতে পারছ না যে, যিশু খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে রয়েছেন?" (২ করি, ১৩: ৫) সাধু পল একথা বলছেন। তোমাদের মধ্যে কি কখনও সেই স্বর্গ, সেই ঐশরাজ্যের উপলব্ধি হয়নি? তোমরা কি খেয়াল করনি যে, তোমরা দাম্ভিক, সন্দিহান, ঈর্ষাপূর্ণ, বিদ্বেষপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন এক সময় ভালবেসেছ, কাউকে বিশ্বাস করেছ, তোমার উপর যে অন্যায় করা হয়েছে তা ক্ষমা করেছ, কাউকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছ, আনন্দে মেতে উঠেছ, নির্যাতনকারীর দুঃখে তোমার হৃদয় গলে গেছে, তার অনুতাপ তোমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, তার মন পরিবর্তনে তুমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছো। একমাত্র স্বর্গে হাজার ধার্মিকের চেয়ে একজন মন পরিবর্তনকারী পাপীর জন্য বেশী আনন্দ অনুভূত হয়। তোমার যদি কখনও সেই উপলব্ধি হয়ে থাকে, তবে সেই মুহূর্তে তুমি স্বর্গে বাস করছিলে। অর্থাৎ স্বর্গ বলে কিছু আছে এবং ইতিমধ্যে তা তোমার নাগালের মধ্যে এসে গেছে।

অন্যদিকে, স্বর্গের বিপরীতে নরকের পূর্ব অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে: যখন আমরা কলহ বিবাদের সময় ও অনৈক্যের বশবর্তী হয়ে ভুলে যাই ভালবাসতে, মিলেমিশে থাকতে; এই পৃথিবীতে, যখন আমরা ভুলে যাই সব কিছু ভাগাভাগি করতে, ভুলে যাই সবকিছু বিশ্বাস করতে, একে অপরের অবলম্বন হয়ে দাঁড়াতে, ধৈর্য্যশীল হতে, এবং ভুলে যাই মন্দ না খুঁজতে। সেসব অন্ধকার মুহূর্তে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুভূত হয়, তা-ই হল সেই আলোর প্রমাণ যে আলোয় স্নাত হয়ে আমরা একদিন হয়ে উঠবো স্বচ্ছ সরলচিত্ত: "তোমরা জগতের আলো"। অর্থাৎ অসাধারণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন, আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি অন্য এক ধরনের জীবন যাপন করতে, আমাদের আসল নিবাস, আমাদের আবাস স্বর্গেই ঠিক হয়ে আছে।

স্বর্গলোক কোন স্থান নয়, বরং তা হল একটি অবস্থা। এই পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাওয়ার অর্থ স্থানান্তরিত হওয়া নয়। তা হল পরিবর্তন আনা, চলার পথ পাল্টানো, রূপান্তরিত হওয়া। যখনই একজন ঐশকরুণা লাভ ক'রে সহভাগিতার জীবন যাপন করে তখনই সে পার্থিব জগত থেকে স্বর্গরাজ্যে উন্নীত হয়। কাজেই স্বর্গরাজ্য টাকার বিনিময়ে লাভ করা যায় না। আমরা শুধু স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে পরিচিত হই, ঘনিষ্ঠ হই, এর পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিই, এর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলি। যে ভাবেই হোক আমাদের এসব কিছু করতেই হবে। *লুইস* ঠিকই বলেছেন যে, পৃথিবী কোন একটি বিশেষ আলাদা জায়গা নয়। আমরা যদি পৃথিবীকে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান মনে করি তবে আমাদের কাছে তা স্থায়ী নরক বাস মনে হবে। যারা ভাবত পৃথিবীর অবস্থান স্বর্গের নীচে, তারা একদিন বুঝতে পারবে সৃষ্টির দিন থেকে পৃথিবী স্বর্গেরই একটি অংশ। এদেন উদ্যান তো স্বর্গই ছিল।

অর্থাৎ, পরিত্রাণ লাভ না করে আমরা যদি নিজেদের কোনো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি, তবে আমরা স্বর্গলোক এবং পৃথিবী দুই–ই হারাবো। কিন্তু যদি আমরা ইহজীবনে অন্তরে স্বর্গের চিন্তা নিয়ে, অদম্য প্রেম নিয়ে, পরিত্রাণ পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করি এবং উৎকর্ষের পথে এগিয়ে চলি, তাহলে আমরা ইতিমধ্যে স্বর্গলোকে পৌঁছে গেছি।

স্বর্গরাজ্যের সূচনা

এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের সূচনা করার একটি বাস্তবসম্মত উপায় হল খ্রিস্ট এবং তাঁর সাধুসন্তদের সঙ্গে মিলিতভাবে এই পৃথিবীতে এখন থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত মঙ্গলকর কর্ম সম্পন্ন করা। এই হ'ল আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সক্রিয় ও শ্রমসাধ্য দিক, যার পুরোভাগে যাতনাভোগ এবং আত্মত্যাগ তুলে ধরা। কিন্তু পরমেশ্বর চান তাঁকে এবং তাঁর আনন্দ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাক। তিনি আমাদের অধিক পরিমাণে আকর্ষণীয় এবং ঐশ মানবীয় আনন্দের পুর্বাস্বাদন অনেক ভাবে দান করেছেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি আধ্যাত্মিক পত্রিকার (LA VIE SPIRITUELLE) ডিসেম্বর সংখ্যায় সবগুলো প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল স্বর্গ বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু তার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ছিল যার রচয়িতা ছিলেন Dom G. Lefeleure, Q.S.B যিনি মহাকাশ-সংক্রান্ত-স্বর্গ যে ঐশ্বরিক স্বর্গ নয়, তা প্রমাণ ক'রে স্বর্গীয় পথের উজ্জ্বল দিকগুলি বর্ণনা করেছেন। তার লেখার সারসংক্ষেপ এখানে দেওয়া হল। স্বর্গরাজ্য হল ঈশ্বর। স্বর্গরাজ্যে বাস করার অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা। যে মানবাত্মার কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতি সত্যিকারের জীবন্ত উপস্থিতি, সে ইতিমধ্যেই স্বর্গে বাস করছে। অন্যদিকে অহমিকাপূর্ণ আত্ম-অনুসন্ধানী মানবাত্মা নরকের অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

(১) মিলন

মিলনের বাইরে কোনও জীবই সম্পূর্ণ নয়। স্বয়ং ঈশ্বর যিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি নিজেই মিলন। পবিত্র ত্রি-ব্যক্তি যা, তাঁরা তা-ই, পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত। যার দ্বারা তাঁরা যা, তার সব কিছুতেই তাঁদের অংশগ্রহণ। তাঁরা পরস্পরের প্রতি উন্মুক্ত, তাঁরা নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক আদান-প্রদানের উপহার। এই অপূর্ব ভালবাসার মধ্যে সব খাঁটি ভালবাসা বিদ্যমান এবং এর বাইরে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সেই প্রেম। কিন্তু কোনও একজন নিজেকে কখনই খুঁজে পাবে না, যতক্ষণ না সে অন্যের কাছে প্রকৃত ভালবাসার মিলন-বন্ধনে নিজেকে উন্মুক্ত করে। কেউ যদি শুধুমাত্র নিজের কারণে ভালবাসা পায়, তবে সে কখনো-ই প্রকৃত ভালবাসা পাবে না। তার সত্তা সীমাবদ্ধ এবং সে নিঃসঙ্গ, প্রাণিকুলের এই সাধারণ দুর্বলতা দ্বারা সে চিহ্নিত। St. Exupery লিখেছেন "ভালবাসা হল কোন কিছুর দিকে এক সঙ্গে দৃষ্টিপাত করা"। এমনটা নয় যে, একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সেখানেই থেমে যায়। অন্য ব্যক্তি এমন হতে পারে না যার উপর নির্ভর করছে এই অসীম দান, এই উন্মুক্ততা যা আমাদের মধ্যে শুধু বিদ্যমান। যে ব্যক্তি সীমিত পরিতৃপ্তি আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে, শুধুমাত্র তার জন্য তাকে ভালবাসা যেতে পারে এবং তা হবে দ্বিমাত্রিক স্বার্থপরতা। কাউকেই সত্যিকারের ভালবাসা যায় না, যদি না আমরা দেখতে পাই যে, সে তার নিজের মধ্যকার নিঃসঙ্গতা থেকে বেরিয়ে আসছে, তার সীমাবদ্ধতার বেড়া ভেঙ্গে আসার অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভব করছে, যদি না আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের প্রতি তার সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যে-ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মিলন ও ভালবাসা স্বরূপ; কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট পূর্ণতায় প্রবেশ করতে পারে। প্রকৃত ভালবাসায় কাউকে ভালবাসা যায় না, যদি না আমরা তাকে সেই অসীম আকাঙ্ক্ষার জন্য ভালবাসি, যা তার অন্তরের গভীরে স্থিত এবং তা অতি নিগূঢ়ভাবে আমাদের অন্তরে বাস করে। একমাত্র সেই আকাঙ্ক্ষা তাঁর সঙ্গে গভীরতায়, প্রাণবন্ততায় ও বাস্তবতায় বাস করতে আমাদের সক্ষম করে। কাজেই একে অপরকে ভালবাসাই হল ঈশ্বরকে একসঙ্গে ভালবাসা, সেই ভালবাসার প্রতি একসঙ্গে উন্মুক্ত হওয়া, যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার ফলে আমরা জানতে পারি যে, তা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। এই হল একসঙ্গে ঈশ্বরের দিকে, স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

(২) প্রেম

স্বর্গরাজ্য প্রেম স্বরূপ। এই পৃথিবীতে ভালবাসা স্বর্গরাজ্যের এক ঝলক আভাস দেয়, কিন্তু প্রেম-আবেগের উর্দ্ধে, সব আনন্দ ও মাধুরীর মাঝে যেখানে আমরা যতটা ভাবি তার চেয়েও বেশী নিজেদের খুঁজে পাবার ঝুঁকি নিই। আমাদের সে প্রেম-উপহারের উর্দ্ধে উঠে সর্বপ্রথম এবং সর্ব্বোপরি ভক্তিভরে অপরের মঙ্গল খুঁজতে হবে। দুঃখ-ক্লিষ্ট-পীড়িত কারও মনে শান্তি ফিরে পেতে সাহায্য করার যে আনন্দ, তা মায়া-মমতা মাখানো সান্ত্বনা, স্নেহ, আদর করার আনন্দের চেয়ে অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। কারণ আমরা হয়তো প্রতিদানে বা কেউ আমাদের কথা ভাবছে তা চিন্তা করে তৃপ্ত হই। ভালবাসার অর্থ অহমবোধ থেকে মুক্ত হওয়া, আপনার উর্দ্ধে উঠে বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। অপরকে ভালবাসা কম অনুভব হয়, যখন অপরের সঙ্গে এক হয়ে ভালবাসতে না পারি। এর অর্থ হচ্ছে এক সঙ্গে ভালবেসে ভালবাসতে শেখা, উভয়ের কাছে যা কিছু মূল্যবান এবং অতি ঘনিষ্ঠ, সেই সব নিজের ক'রে নেবার বিশুদ্ধ আনন্দ, নিজেকে আরও মহত্বর কিছুর জন্য সঁপে দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা বুঝতে একে অপরকে বোঝাতে সাহায্য করা। আমাদের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা আছে সেই একই আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভালোবাসার মানুষের অন্তরে দেখতে পেলে, তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারলে আমাদের কতনা আনন্দ হয়। কিন্তু এমন একজনকে চাই যিনি স্বর্গরাজ্যকে ভালবাসবেন, যিনি আমাদের প্রকৃত মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চান না, যিনি আমাদের জীবনে কোনো স্থান দখল করতে চান না, বরং একমাত্র তিনি যিনি আমাদের হৃদয় পূর্ণ করতে পারেন, তাঁরই দিকে আমাদের নিয়ে যেতে চান। প্রকৃত ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা অর্থাৎ বিনম্র ভক্তি, নিষ্ঠা, সম্পূর্ণ স্বার্থ-শূন্যতা, আমাদের প্রয়োজন এবং ক্লেশ সম্বন্ধে বিবেচনাপূর্ণ উপলব্ধি ও সহানুভূতি; ঐশ প্রেমের ঝর্ণা ধারা থেকে প্রবাহিত ব'লে তা কত না সুগভীর মানবীয়। এই হল স্বর্গরাজ্যের প্রকৃত পূর্বাস্বাদন; পরমেশ্বর আমাদের যে ভালবাসায় ভালবাসেন সেই ভালবাসার একটি জীবন্ত মূর্তি। পরমেশ্বরের ভালবাসা আমাদের ভালবাসাকে যে শুধু ছাপিয়ে যায় তা নয়, বরং তা আমাদের ভালবাসাকে প্রাণ দান করে, আর আমাদের ভালবাসা সেই পূর্ণতা, যা আমাদের আলিঙ্গন করে, তার প্রতি বিনম্র সাড়া দেয়।

(৩) প্রার্থনা

ভালবাসা যদি ঈশ্বরের দিকে একসঙ্গে দৃষ্টিপাত করা বোঝায়, তাহলে তা সব সময়ই কোনও না কোনও ভাবে সমবেত প্রার্থনা রূপে ঘটে। যেহেতু প্রার্থনার অর্থ সেই চরম চাওয়ার প্রতি আমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করা, সেই চাওয়া হল আমাদের প্রকৃত সত্তা যা আমরা আমাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। প্রার্থনা করার অর্থ সেই পরমেশ্বরের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা স্বীকার করা, যে পরমেশ্বরের ভালবাসা ছাড়া আর কোনও কিছুই আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। তা হল পূর্ণনির্ভরতার একটি আচরণ, প্রেম-পূর্ণ বিনম্র ভক্তি, তাঁর ভালবাসার প্রতি সন্তানোচিত বিশ্বাস এবং ভালবাসার প্রেরণার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ। আমরা যদি বুঝতে পারতাম যে, আমরা সর্বক্ষণ এমনই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ও অকপট এক ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বাস করি, যিনি আমাদের প্রকৃত ভালবাসায় কত না ভালবাসেন, তা হলে আমাদের প্রার্থনা আরও কতনা স্বতঃস্ফূর্ত ও শক্তিপূর্ণ হত! তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাব কত না সুন্দর হত!

আমাদের একমাত্র সাড়া হবে অন্তরের পবিত্রতা, যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাধ্বী তেরেজা বলেছেন যে, তা হল আমাদের অন্তরের সেই স্বভাব যা আমাদের পরমেশ্বরের হাতে বিনম্র এবং অবনমিত করে, আমাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে, কিন্তু তাঁর পিতৃস্নেহের প্রতি আমাদেরকে বিস্ময়করভাবে আস্থাবান করে তোলে। সেই অসীম করুণাময় ঈশ্বর যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের শুভ সংবাদ শোনাচ্ছেন "আমি তোমায় ভালবাসি, তোমাকে আমার প্রয়োজন", এ কথার উত্তর হবে, "তোমাকে ভালবাসা ও তুমি যেন ভালবাসা পাও, সেটাই আমার একান্ত বাসনা"। এই পৃথিবীতে এ ছাড়া আর কোনও উত্তর হতে পারে না। যে কোনও মৌখিক ও নীরব প্রার্থনার আদর্শ "প্রভুর প্রার্থনা" যা হল স্বর্গ ও পৃথিবীতে সাধু সাধ্বীগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বীয় থেকে ঐশ্বরিকতায় উন্নীত হয়ে এই ভাবময় উক্তি উচ্চারণ করা: "হে পিতা, স্বর্গলোকে তুমি অসীম আনন্দ ভোগ কর! ইহজীবনে আমরা যেন তোমায় জানতে পারি এবং অন্যদের কাছেও তোমায় প্রকাশ করতে পারি, তোমায় যেন ভালবাসতে পারি এবং ভালবাসাতে পারি, এমন কি এই দুঃখময় পৃথিবীতে এখন তোমার সেবা করতে পারি এবং সেবা করাতে পারি, যেমন একদিন করবো তোমার রাজ্যে, নতুন পৃথিবী সেই স্বর্গধামে। বর দাও প্রভু, যেন তোমার পরিচালনা, তোমার করুণা ও তোমার শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি। আমেন।

প্রার্থনার উৎস আমাদের মধ্যে সদা বিদ্যমান, কারণ প্রার্থনা হল সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে কথোপোকথন যে পরমেশ্বর কথা শুরু করেন, যদিও তা নীরবে। জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, চরম দুর্দশা যে মুহূর্তে আমরা স্বীকার করে নিই তৎক্ষনাৎ সেগুলি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে করুণা ও ত্রাণের আর্তনাদ করে উঠে.....ঠিক যেমন শুষ্ক রৌদ্রদগ্ধ ভূমি তার অসংখ্য ফাটলের মুখ দিয়ে বৃষ্টির জন্য আকুতি জানায়। আমাদের হৃদয় সতত স্পন্দিত হয়ে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে, এমন কি নিদ্রার সময়েও সজাগ দৃষ্টি রাখছে। আর এর ফলে আমরা কোনও কথা না বলেও প্রার্থনা করতে পারছি: আমার হৃদয় সজাগ দৃষ্টি রাখছে; আমার ব্যাথা বেদনা করুণ আবেদন জানাচ্ছে। ঈশ্বর এবং তাঁর ভালবাসার প্রতি বিশ্বাস ছাড়া আমরা ঈশ্বরের কাছে আর কিছুই নিবেদন করতে পারি না। সেই বিশ্বাসের প্রার্থনা, যা প্রকৃত পক্ষে খুবই নগন্য। যে বিশ্বাস খুবই দুর্বল, খুবই ম্লান এবং বিভ্রান্তির ফলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও তা কিন্তু সেই নিগূঢ় অসীম ভালবাসার কাছে বিনম্র ও আন্তরিক আবেদন হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা আমাদের আবৃত করে রাখে। তা যেন পরমেশ্বরের অযাচিত করুণা দানের সূত্রপাত, তাঁকে বিলিয়ে দেবার অসীম বাসনার সূচনা, যা তাঁর নিজের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু আমরা সেই প্রার্থনায় অন্তত পরোক্ষভাবে করলেও, বহু বচন সম্বোধন করি: "তোমাকে ভালবাসার জন্য এবং অন্যদের দিয়েও তোমায় ভালবাসার জন্য আমরা ব্যকুল"। ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করার সময় আমরা যদি অন্যদের আমাদের সঙ্গে নিয়ে না যাই, তাহলে ঈশ্বর নিজেই তাদেরকে আমাদের কাছে দেবেন: "ফ্রান্সিস! আমার আবাস সেন্ট ডেমিয়ান ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তুমি তার পুনঃসংস্কার কর: আমার মন্দির, শত শত হৃদয় হয়ে আছে কলুষিত, ধূলি মলিন অথবা হয়ে উঠেছে ব্যবসা বাণিজ্য এবং পার্থিব বিষয়বস্তুর লেনদেনের আখড়া; তাকে আর উপাসনা গৃহ বলা চলে না। তুমি তার পুনঃনবীকরণ কর। ভালবাসা আর ভালবাসা পাচ্ছে না"।

একমাত্র নীরব প্রার্থনাই হতে পারে পরমেশ্বরের উপস্থিতির প্রতি আমাদের সঠিক সাড়া দান। এর অনুশীলন শুধুমাত্র সকাল বেলা আধঘন্টা করলে হবে না, বরং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকে, সে তার সমস্ত দিনের আচরণে ও মনোভাবে তা অনুশীলন করার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং তার প্রতিটি কাজ কর্ম হয়ে উঠে পরমেশ্বরের আশ্রয়ে এক শ্রদ্ধাঞ্জলী। অসুস্থতার সময় সাধ্বী তেরেজা বলেছিলেন "যিশুকে আমি কিছুই বলিনা, তাঁকে আমি ভালবাসি"। তাঁর রাজ্যের জন্য কাজ করার সময় আমরাও মনে মনে বলতে পারি, আমি যিশুকে কিছুই বলি না, তাঁর জন্য তৃষিত আমার প্রাণ। অনুগ্রহ এবং আমাদের প্রচেষ্টার মধ্যে সম্পর্ক হল জীবন্ত সহযোগিতা। তা হল একটি সংলাপ যেখানে আমরা নিজেরাই প্রশ্ন করি এবং উত্তরও দিই, কিন্তু আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারি যে, সেই প্রশ্নোত্তর উভয়ই পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ঘটে এবং তিনিই তাঁর ইচ্ছা মতো সেই সংলাপ সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই ভাবে পরমেশ্বরের জীবন্ত উপস্থিতির মধ্যে বাস করাই হ'ল প্রার্থনা করা এবং ইতিমধ্যেই স্বর্গ রাজ্যের সূচনা করা।

(৪) ভালবাসা ঃ স্বর্গরাজ্যের পূর্বস্বাদ

ঈশ্বরের যে ভালবাসার প্রতি আমাদের হৃদয় ব্যাকুল সেই ভালবাসা সুদূর পরাহত নয়। আমাদের জন্য সেই ভালবাসা মানুষ হয়েছেন এবং তা খ্রিষ্টের মধ্যে উপস্থিত থেকে এখনও আমাদের মধ্যে বাস করছে, তা উপহার হিসাবে আমাদের প্রদান করা হয়েছে। তা আমাদের মনুষ্য অস্তিত্বের রূপান্তর ঘটায়। আর তা আছে আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের দৈনন্দিন ভালবাসা প্রদর্শনের মধ্যে এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিষ্টের ভালবাসার মধ্যে বাস করতে পারি এবং সেই ভালবাসা যে আনন্দ নিয়ে আসে তা উপলব্ধি করতে পারি। ভালবাসা একটি আয়াসসাধ্য সদ্‌গুণ যা অর্জন করতে আমাদের ও অন্যদের মধ্যে যে অহমিকা আছে তা জয় করতে হবে, বিসর্জন দিতে হবে। ভালবাসা ইতিমধ্যেই উপস্থিত রয়েছে আনন্দ, শান্তি এবং জীবনের পূর্ণতা নিয়ে। সেই ভালবাসার কাছে আমরা

নিজেদের উন্মুক্ত ক'রে দিতে চেষ্টা করি। তা শুধু ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিচ্ছবি নয় বা তাঁর সঙ্গে নিগূঢ় সংযোগ তথা স্বর্গ সুখও নয়। বরং পরমেশ্বরের ভালবাসা হল সেই ভালবাসা, যে ভালবাসা বেঁচে থাকে আমাদের প্রতিবেশীদের আন্তরিক ভালবাসার মধ্যে এবং তা সেখানেই উপস্থিত আছে। আমরা যদি এই বিষয়ে সচেতন থাকতাম যে, আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সেই ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি, যে ভালবাসা আমাদের দুর্বলতায় সদয় ভাবে সহায়তা দান করে, তাহলে আমাদের আচরণ কীরকম হত? ইতিমধ্যেই প্রতিবেশীর সঙ্গে যে ভালবাসায় আমরা যুক্ত হয়ে আছি, তার ফলে আমরা আমাদের সাধু সাধ্বীগণের সেই স্বর্গসুখের খুব কাছে অবস্থান করছি এবং সেই স্বর্গীয় আনন্দ সহভাগিতা করার মাধ্যমে আমাদের আনন্দ উপচে পড়বে।

স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার পথ

ছাত্রের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য একবার এক শিক্ষক তাকে তিনটি বোতাম দিয়ে বললেন: "এটা স্বাস্থ্য, এটা সম্পদ এবং এটা আনন্দ। আগামীকাল এগুলো আমার কাছে এনে তুমি যদি এদের নাম ঠিক মত বলতে পার তাহলে তোমাকে পুরস্কার দেব"। পরের দিন ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো দুটো বোতাম নিয়ে। ছেলেটির কাছে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ এই দুটি আছে; সে আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের শাশ্বত আনন্দ যেন সেই চরম মঙ্গল ঐশ উপলব্ধিতেই নিহিত থাকে, মঙ্গলময় ঈশ্বর সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঐশকরুণায় ঈশ্বর বিশ্বাস, আশা এবং প্রেমের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ঈশ্বর আছেন এবং এইভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি দিয়েই সূচনা হচ্ছে ঐশরাজ্যের। ঐশকরুণা এবং গৌরব হল অতীব বাস্তব সত্যের দুটি রূপ। কাজেই স্বাস্থ্য এবং সম্পদের মধ্যে আনন্দ না খুঁজে বরং তা যেখানে আছে আমরা যদি সেখানে তা খুঁজি তবে এই জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও সুখ–শান্তি পাবার পাঁচটি কারণ রয়েছে। অন্য দুটো বোতাম হারালেও কিন্তু আনন্দ যেন কখনোই না হারায়। এই পাঁচটি কারণ মাথায় রেখে আমি সেগুলিকে ফরাসী ধর্মীয় সংগীত *'Dieu seul`*এর ছন্দে তুলে ধরেছি।

(১) ঈশ্বরের আনন্দই আমার আনন্দ

আমার আনন্দ

আমার স্বর্গের শুরু এই ধরাতলে
আমার আনন্দের প্রথম কারণ
আমি জানি অনন্ত অসীম আমার প্রিয় পিতার আনন্দ
নেই তাঁর কোনো দুঃখ বেদনা।
তুমি বলে তোমায় প্রভু এমন ভালবাসি
ভুলে যাই নিজের কথা।
প্রভু তুমি মোর সদানন্দ, একথা জেনে উল্লসিত মোর মন প্রাণ
আর তো কিছু চাই না আমি।

প্রজ্ঞা, প্রতাপ এবং মহত্ব – ঐশ উৎকর্ষের এই তিন জ্ঞানের মধ্যে নিঃস্বার্থ আনন্দ খুঁজে পাওয়াতেই রয়েছে ঈশ্বরের ভালবাসার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা যদি সত্যিই সেই স্বর্গীয় পিতার সন্তান বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করি, তাহলে এই কথা ভেবে আমাদের আনন্দের সীমা থাকবে না যে, আমাদের পিতা ঈশ্বর সব রকম উৎকর্ষে ধনবান; আমরা আমাদের সুখে নয়, বরং তাঁর সুখে সুখী এবং সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল যেমন লিখে গেছেন, আমাদের আত্মা এক পুণ্য নিস্তব্ধতার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘোষণা করবে, "ঈশ্বর যে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট, অসীম তাঁর মহত্ব, বিশাল তাঁর উৎকর্ষতার ব্যাপ্তি; আমি বাঁচি বা মরি, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, কারণ আমার প্রিয় ভালবাসার ধন অনন্তকাল বেঁচে থাকেন জয়-গৌরবে"। যে ভালবাসে, যে নিজের থেকেও অন্যকে বেশি ভালবাসে, তার অন্তর অনন্ত প্রেমে উপচে পরে। এই ধরনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা পার্থিব পর্যায়েও দেখা যায়। একবার এক শ্রমিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "তুমি কি সুখী? উত্তরে সে বলল, "আমাকে খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু একটা জিনিসই আমার কাছে সব: আমার প্রিয় স্ত্রী ও প্রিয় সন্তানেরা, আর আমি তো তাদের সুখীই দেখছি। তাদের আমি আমার নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালবাসি। তাদের সুখই আমার সুখ"। আমরাও যদি ঈশ্বরের সঙ্গে এই রকম সম্পর্ক স্থাপন করি, তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো পিতা পরমেশ্বরের কী অপূর্ব ভালবাসা, যে ভালবাসার জন্য আমরা তাঁর মহিমা কীর্তন করি, যে মহিমা অনন্তকাল ধরে তাঁরই ছিল। সৃষ্ট কোন কিছুই তাঁকে যখন জানতো না বা চিনতো না, তখনও সেই মহিমা তাঁরই ছিল এবং এই মহিমা কীর্তনে আমরা ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু যাচনা করি না, শুধু চাই ঈশ্বর যেন আনন্দিত হন। ঈশ্বরের আনন্দই ঈশ্বরের গৌরব।

(২) ঈশ্বরের বন্ধুত্ব

তাঁর রাজ্যে তিনি আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আনন্দের ভাগ নিতে
আমি বিশ্বাস করি তাঁর ভালবাসায়।
তিনি নিজেকে আমাদের বিলিয়ে দিয়েছেন, সাধু পল তো তাই বলেছেন
আর তাই আমি চাই তাঁকে প্রতিদান দিতে।
আমার প্রতি অসীম তাঁর প্রেম
তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা ক্ষুদ্র হলেও মোর অন্তর তাতেই তৃপ্ত
সেই বন্ধুত্ব আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করে তোলে।

আমাদের ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে ভালবাসা কেন্দ্রিক। আমরা ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমে বিশ্বাসী এবং ইহজীবনে আমাদের কাজ হচ্ছে সেই ঐশপ্রেমে সাড়া দেওয়া। ঐশরাজ্যের শুভ সংবাদ ধন্যা কুমারী মারীয়ার কাছে দুটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে: "ঈশ্বর তোমায় ভালবাসেন,

তুমি ঐশ আর্শীবাদ লাভ করেছো; ঈশ্বর মনুষ্যরূপ ধারণ করতে তোমায় চান", এখন আমাদেরও সেই একই কথা বলা হচ্ছে, কারণ দীক্ষাস্নানে আমরাও ঐশ আর্শীবাদ লাভ করেছি: ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর সন্তানের মতো ভালবাসেন। তিনি আমাদের সহযোগিতা চান যাতে আমাদের মধ্যে অপর এক খ্রিষ্টের উৎপন্ন হয়, যা ঈশ্বরেরই অতিরিক্ত এক মানবীয় রূপ, এই জগৎ সংসারে রহস্যময় দেহের পার্থিব এবং জীবন্ত এক সদস্য। আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ঈশ্বরের ব্যক্তিগত ভালবাসায় বিশ্বাস করাটাই খ্রিষ্ট এই মুহূর্তে আমাদের কাছ থেকে আশা করেন এবং এই বিশ্বাসই এনে দেয় খ্রিষ্টের দাক্ষিণ্য এবং সাধন করে আশ্চর্য কাজও। মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত সেই যে মহিলা, যিনি যিশুর পোশাকের একটু অংশ স্পর্শ করে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, তিনি খ্রিষ্টের ক্ষমতা এবং অবশ্যই ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসের গুণে খ্রিষ্টের হৃদয় জয় করেছিলেন। যেহেতু খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের বিষয়ে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে, এখন তাঁর ভালবাসার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই তাঁর হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে ভালবাসার প্রতিক্রিয়া, প্রতিদানে ভালবাসা দেবার ইচ্ছা, যা আমাদের বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখে। বন্ধু বলতে বোঝায় "এমনই একজন, যে আমায় জানে তবুও ভালবাসে"। ঐশপ্রেমের মধ্যে বাস করাই হল অনন্ত সুখের সূচনা। হয়তো কেউ আপত্তি করে বলবে: "আমি ভালোবাসার কিংবা ঘৃণার যোগ্য কি-না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে"। আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি না, তবে কার্যক্ষেত্রে খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। তবে, সে যাই হোক না কেন, অনুতাপের প্রার্থনা সব সময়ই আমাদের আশা দৃঢ় করে তোলে এবং সাধ্বী যোয়ান অফ্ আর্কের মতো আমরাও বলতে পারি: "আমি যদি ঐশপ্রেমের মধ্যে বাস না করি, তবে হে ঈশ্বর, আমায় ঐশপ্রেম দান কর; আর ঈশ্বরের দয়ায় আমি যদি ঐশপ্রেম লাভ করে থাকি, তবে হে ঈশ্বর, আমায় সেই প্রেমের মধ্যেই রেখে দিও" ।

(৩) ঈশ্বরের উপস্থিতি

এই ধরাতলেও ঈশ্বর নিজেকে বিলিয়ে দেন।
এই হল আনন্দের সারগর্ভ
আমার নিজের দুঃখ-যন্ত্রণায় বাস করেন ত্রিব্যক্তি এক ঈশ্বর
স্বর্গে রূপান্তরিত করেন আমার আত্মা।
যা-ই হোক না কেন মোর দুঃখ বেদনা,
জানি ঈশ্বর আছেন আমার কাছে।
হৃদয় আমার তাতেই তৃপ্ত।
ঈশ্বরকে পেয়ে হৃদয় আমার ভরে গেছে আনন্দে।

ঐশকরুণা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি এনে দেয়। দীক্ষাস্নানে আমাদের অন্তর হয়ে উঠেছে পবিত্র ত্রিত্বের মন্দির, বিশেষত পবিত্র আত্মার মন্দির। ঈশ্বরের এই মহৎ দানের কথা উপলব্ধি করতে পেরে ক্ষুদ্রপুষ্প স্বাধ্বী তেরেজা বলেছিলেন: "জানিনা স্বর্গে এর চেয়েও আর কী-বা বেশী পেতে পারি। ঈশ্বরকে দেখতে পাব; কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকা, সে তো এই পৃথিবীতে বসেই আমি আছি"। একথা সত্যি যে ঐশকরুণার মাধ্যমে ঈশ্বর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে আমরা পেয়েই গেছি, তবে তাঁর গৌরব তাঁকে দেখার আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবে। ঈশ্বরকে পাওয়া যাদের কাছে যথেষ্ট নয়, তারা কতই না হতভাগ্য, এবং তাঁকে পাবার জন্য কত না ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

(৪) ঈশ্বরের পরম আনন্দ

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা - সে'তো প্রকৃত আনন্দ।
যিশুর মত আমারও এই বাসনা
পরমেশ্বর আমার জন্য করেছেন যে পরিকল্পনা
তা পালন করতে চাওয়া অথবা তা পালন করা ।
আমি সব সময়ই খুশি
আমি সব সময়ই তৃপ্তির হাসি হাসতে পারি
কাঙ্খিত সবই আছে আমার।
আমার হৃদয় তৃপ্ত করার জন্য এই তো যথেষ্ট।
ঈশ্বরের সন্তুষ্টিই আমায় আনন্দে করে তোলে পূর্ণ।

খ্রিষ্টের মানব দেহধারণের ফলে ঈশ্বর আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা যেন খ্রিষ্টকে বন্ধু হিসাবে জানতে পারি, "আমি তোমাদের আমার ভৃত্য বলে সম্বোধন করছি না, বরং আমার বন্ধু বলে সম্বোধন করছি"। ঈশ্বর আমাদের আরও সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা যেন যিশুকে ভালবাসতে পারি এবং তাঁকে আমাদের হৃদয়-আসনে বসাতে পারি: "যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে আমি এবং আমার পিতা তাঁর কাছে আসব এবং তাঁর মধ্যে বাস করব"।

ঈশ্বর আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁকে সেবা করার, যাতে তাঁর সেবা করে আমরা সুখী হতে পারি – যদিও তিনি তাঁর সেবা করার জন্য আমাদের প্রেরণা এবং তা কার্যে রূপায়িত করার জন্য পরিচালিত করেন। যে-স্বাধীনতা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, সেই

স্বাধীনতাকে ঈশ্বর শ্রদ্ধা করেন, এবং তিনি চান পরিত্রাণ কর্মে আমরা যেন সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যাবহার করি। সুখী হবার একমাত্র পথ হল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে সর্বজ্ঞানী মহান ঈশ্বরের ইচ্ছা একত্রিত করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা। আমাদের এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি সমান্তরাল হয়, তবে রেলগাড়ীর মতো আমাদের জীবন মসৃন ভাবে চলবে; কিন্তু যদি আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত হয়, তাহলে এটিতে বাধা সৃষ্টি হবে এবং আমাদের জীবনে নেমে আসবে ক্রুশ। ঐশগুরু এবং সাধু-সাধ্বীগণ দেখিয়েছেন যে, শান্তি এবং আনন্দের একমাত্র পথ হল আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছার মেলবন্ধন। "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। "হে প্রভু, আমার সকল ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর .....আমায় দান কর তোমার অনুগ্রহপূর্ণ ভালবাসা, তাতেই তুষ্ট হব আমি। এর অধিক আর কিছুই আমার চাওয়ার নেই," (সাধু ইগ্নাসিয়াস)। ক্ষুদ্র পুষ্প তেরেজা গেয়েছেন "আমি সত্যি সবচেয়ে সুখী আমি সব সময় আমার ইচ্ছা পালন করি"। কারণ খ্রিষ্টের ইচ্ছা ছাড়া তাঁর নিজের কোনও ইচ্ছা ছিল না। আবার সাধু জন বার্কম্যানস বলেছেন: "আমি নিশ্চিত, আমাকে কখনও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না, কারণ আমার উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের ক্ষুদ্রতম নির্দেশটিও আমার নিজের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়েছি"।

(৫) ঈশ্বরের সেবা

জ্বলন্ত অগ্নিসম জ্বলছে আমার অন্তরে ঈশ্বরের ভালবাসা।
তার উষ্ণতা ছড়িয়ে প'ড়ে
প্রতিবেশীদের অন্তর প্রজ্জ্বলিত করতে চাইছে ভালবাসায়।
জীবনের অন্তিম লক্ষ্য প্রেমের প্রচার
সেই প্রেম স্বয়ং ঈশ্বর।
এই ঐশপ্রেম প্রচারেই তৃপ্ত মোর অন্তর।
যদি কেউ ঈশ্বরকে ভালবাসে
সেই-তো আমার জয়ের মুকুট।

আমরা যদি প্রতিবেশীদের ভুলে শুধু ঈশ্বরকে ভালবেসে তৃপ্ত থাকতাম, তবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সুস্থ্য-সবল হতো না। এই পৃথিবীতেই ভাল কাজ করে ক্ষুদ্র পুষ্প তেরেজা যেমন স্বর্গরাজ্যের সূচনা করেছেন আমরাও যদি সেরকম করতে চাই, তাহলে আমাদের এখনই প্রতিবেশীদের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা শুরু করতে হবে। এটাই হল স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত উপায়; খ্রিষ্টের রাজত্বে এবং বিশ্বের মুক্তি সাধনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া, কেননা এই কার্য সাধনে আমাদের সামনে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সেবা ভাল, প্রার্থনা আরও ভাল, কৃচ্ছ্রসাধন সর্বোত্তম। আসলে এই পৃথিবীতে সেই প্রেমপূর্ণ সেবার বাইরে সুখ মিলবে না। একজন মানুষ যখন মনে করে যে, তাকে কোনও কাজে লাগে না বা তার কোনও মূল্য নেই, তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। আমাদের আধ্যাত্মিকতা হতে হবে সামাজিক। পরিত্রাণকার্য হল একটি দলগত প্রয়াস, যেখানে ঐশ মণ্ডলীর ক্ষুদ্রতম সদস্যের অবদানেরও প্রয়োজন আছে। মণ্ডলীতে সবার জন্যই কিছু না কিছু কাজ রয়েছে এবং তা হল সেই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে ভালবাসার পাত্র হিসাবে তুলে ধরা, এই ইচ্ছার কথাই আমাদের দীক্ষাস্নানের সময় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল: "মণ্ডলীতে সে আনন্দের সঙ্গে তোমার সেবা করুক"।

দ্বিতীয় ভাগঃ খ্রিস্টমণ্ডলী - খ্রিস্টীয় জীবন - ঐশ্বরিক গুণাবলি

খ্রিস্টমণ্ডলী ঃ খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহ

(১) পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলীতে আমাদের বিশ্বাস

নিগূঢ়দেহ বিষয়ক ধর্মতত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত দিক হচ্ছে খ্রিস্টের সঙ্গে প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের নিবিড় সংযোগ এবং একাত্মতা একটি অপরিহার্য বিষয়, কিন্তু তা নিগূঢ়দেহের তথা মণ্ডলীর পূর্ণ বাস্তবতা প্রকাশ করেনা। দ্বিতীয় বিষয়, খ্রিস্টকে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত এবং প্রকাশ করে সকল সদস্যদের আন্তরিক ঐক্য ও জীবনধারা, যে সদস্যদের দ্বারা গঠিত সেই দেহ, যে দেহের মস্তক স্বয়ং খ্রিস্ট এবং তার প্রাণ হচ্ছে পবিত্র আত্মা। সাধু-সাধ্বীদের সংযোগে তিন ধরনের খ্রিস্টানুসারী আছে: এক দল হল যারা বিজয়ী হয়ে ঈশ্বরের মুখোমুখি দর্শন লাভ করছে, আর এক দল আছে যারা প্রায়শ্চিত্তমূলক কষ্টভোগের মধ্যে অপেক্ষমান, আর তৃতীয় দলটি এই পৃথিবীতে কঠিন পরীক্ষা ও প্রস্তুতির মধ্যে সংগ্রামরত। আমরা যখন পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলীতে আমাদের বিশ্বাস প্রকাশ্যে ব্যক্ত করি, যে মণ্ডলী বলতে "খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ" বোঝাই, তখন আমরা সেই তৃতীয় দলটিকেই উল্লেখ করি। সেই বিশ্বাসোক্তি প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আত্মার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আমরা আসলে বলতে চাই: আমি সেই পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যাঁর বিশেষ কাজ সৃষ্টি, আমি সেই পুত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি মানব দেহ ধারণ করেছেন এবং মানবমুক্তি সাধন করেছেন, আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি তাঁর বিশেষ কর্মক্ষেত্র মণ্ডলীতে।

(২) পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টের নিগূঢ় রহস্য

খ্রিস্টমণ্ডলী একটি নিগূঢ় রহস্য, কারণ মানবদেহধারণ বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রসারিত হয়েছে, আসলে খ্রিস্টমণ্ডলী এই পৃথিবীতে খ্রিস্টের চলমান উপস্থিতি। তার বিচারকদের প্রশ্নের উত্তরে সাধ্বী জোয়ান অফ আর্ক উত্তর দিয়েছিলেন, "খ্রিস্টে আমার যে বিশ্বাস, তাঁর মণ্ডলীতেও আমার সেই একই বিশ্বাস"। কাজেই মণ্ডলী একাধারে মানবীয় এবং ঐশ্বরিক। কিন্তু খ্রিস্ট যে একাধারে ঈশ্বর এবং পাপ ব্যতীত আর সব দিক থেকে রক্ত মাংসের মানুষেরই মতো, তা যেমন বিশ্বাস করা কঠিন, তেমনি কিছু খ্রিস্টানুসারী আছে, যারা নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করে, তারা যে প্রকৃতই খ্রিস্টের দেহ, তা মেনে নিতে প্রয়োজন বিশ্বাসের অনুগ্রহ। এই সত্য আরও সহজ ভাবে বোঝা যাবে যদি নিগূঢ় দেহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই বাণী আলঙ্কারিক অর্থে নিই –"আমরা অনেক হলেও খ্রিস্টেতে আমরা এক দেহ, এবং প্রত্যেকে একে অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে উঠি।" আমাদের বলা উচিত, "সত্যি, কি সুন্দর একটি রূপক! আমরা খ্রিস্টে এক হয়ে উঠেছি ঠিক যেমন আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হৃদপিন্ডের পরিচালনায় এক হয়ে ওঠে, আর এইভাবে গড়ে ওঠে একে অপরের প্রতি প্রেমপূর্ণ যত্নশীলতা"। কিন্তু নিগূঢ় দেহের ঐক্য আমার শারীরিক দেহের ঐক্যের "অনুরূপ" বলা যাবে না। বরং এই তুলনা অন্যভাবে করা যেতে পারে: আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঐক্য "কিছুটা" খ্রিস্টের নিগূঢ়দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঐক্যের মতো।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব মনুষ্য পিতৃত্বের অনুরূপ নয়, কিন্তু শারীরিক পিতৃত্ব বোধগম্য হবে যদি আমরা তা ঈশ্বরের পরম পিতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। খ্রিস্ট এবং তাঁর বঁধু মণ্ডলীর মধ্যে বন্ধন মনুষ্য বর-বঁধুর দু'জনের এক দেহ হয়ে ওঠার মতো "অনুরূপ" নয় বরং বিবাহকে সংস্কার হিসাবে বুঝতে হবে একমাত্র খ্রিস্টের সঙ্গে মণ্ডলীর বন্ধনের আলোকে; একই ভাবে "অনেকে মিলে এক" এটিও একটি রহস্য যা বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য, যেখানে তিনজন মিলে এক। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ তাঁর অনুরূপ হয়ে ওঠে এবং তাঁর মণ্ডলীর জন্য খ্রিস্ট যে একান্ত প্রার্থনা করেছেন সেই প্রার্থনা পিতা অবশ্যই শুনেছেন: "আমরা যেমন এক তারাও যেন তেমনি এক হয়ে ওঠে"।

(৩) ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্বাস সক্রিয়

খ্রিস্টমণ্ডলীকে ভালবাসা হ'ল তার সঙ্গে খ্রিস্টকেও ভালবাসা, যে খ্রিস্ট তাঁর বঁধুকে ভালবেসে তাকে বাঁচাতে নিজ প্রাণ ত্যাগ করেছেন এবং তাকে তাঁর পিতার কাছে নিষ্কলঙ্ক ও নবরূপে নিবেদন করেছেন। এর অর্থ, প্রথম আজ্ঞাটির সঙ্গে দ্বিতীয় আজ্ঞাটি যুক্ত করা: "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাস"; তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাকে ভালবাস। এই রূপ ভালবাসা ব্যতিরেকে খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত একাত্মতা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। দৃশ্যমান প্রতিবেশীকে ভালবেসে আমরা অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালবাসার প্রমাণ দেব। আমরা খ্রিস্টের উপস্থিতি ও তাঁর জীবন বজায় রাখব এই পৃথিবীতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ সদস্যদের মধ্যে এবং মণ্ডলীর মধ্যে। খ্রিস্ট চান আমরা অন্যদের নিয়ে দলে দলে তাঁর পিতার অশেষ মহিমা কীর্তন করি এবং তাদের রূপান্তরিত করি ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান রূপে। কেউ কেউ মণ্ডলীকে "ঐশ পরিবার" বলতে পছন্দ করে। এভাবে বললে সেই ঐশ পরিবার দৃশ্যমান একক হিসাবে বোঝা যায়। ভাটিকান মহাসভার আলোচনা সভায় একজন ফাদার বলেছিলেন "আমরা একে অপরকে "প্রিয় ভ্রাতা" বলে সম্বোধন করি, আমরা বলি না "প্রিয় সদস্যগণ"। কিন্তু এভাবে মণ্ডলীর পার্থিব ও বাস্তব দিক প্রকাশ করে, অন্য দিকে "নিগূঢ় দেহ" প্রকাশ করে সকল ভ্রাতা-ভগ্নিদের আন্তজীবন ও অন্তঃকরণ। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমরা বলি "কেমন আছেন? শরীর স্বাস্থ্য কেমন"? আমরা বলি না আপনার অন্তঃকরণ কেমন আছে?

(৪) সবার কাছ থেকে একজন কতটা গ্রহণ করে

আমরা যদি এই কথা বিবেচনা করি যে, সেই জীবন্ত দেহের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমাদের কাউকে কিছু দিতে হবে না, তাহলে আমরা মণ্ডলীকে আরও বেশি ভালবাসতে পারবো। এই হ'ল পৃথিবীতে সিদ্ধগণের সমবায়, যা লিখতে গেলে সিদ্ধগণের সমবায় শব্দ দু'টি লিখতে মোটা হরফ ব্যবহার করতে হয়না। আমি যদি ধার্মিকতার অনুগ্রহের মধ্যে বাস করি তাহলে সমগ্র নিগূঢ় দেহের স্পন্দনে স্পন্দিত হবো, কারণ সেই নিগূঢ় দেহের প্রাণ স্বয়ং পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে অবস্থান করেন। আমার নামে এবং আমার প্রয়োজনে মণ্ডলী দ্বারা উৎসর্গীকৃত প্রতিটি খ্রিস্টযাগ যা প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার বার উৎসর্গ করা হচ্ছে – প্রত্যেকে সেই নিগূঢ় দেহের একটি হৃদয়স্পন্দন, যে স্পন্দন আমার অন্তরে সেই অনুগ্রহ ধারা ঢেলে দিচ্ছে, যার ফলে আমি বেঁচে থাকি ও বেড়ে উঠি। মণ্ডলীর প্রাহরিক প্রার্থনার পুস্তক ব্যবহার ক'রে যখন যাজকগণ, সন্ন্যাসব্রতীগণ বা খ্রিস্টভক্তগণ প্রার্থনা করেন, তখন প্রতিটি প্রার্থনা, মৌখিক বা মনন প্রার্থনা, সব প্রার্থনা আমার জন্য করা হয়, এ সবের মধ্যে আমারও একটি অংশ আছে।

(৫) সমগ্রের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

এর ফলে সেই নিগূঢ় দেহের অন্যান্য প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতার জন্য আমার দায়িত্ব এবং অবদান কি তা জানতে পারি। আমরা যিশু খ্রিস্টে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত, ঠিক যেমন কতগুলি পাত্র একটির সঙ্গে অন্যটি নল দ্বারা যুক্ত। কোন একটি পাত্র যখন মুক্তির অনুগ্রহে ভরে ওঠে বা খালি হয়, অন্য পাত্রগুলিও একই সঙ্গে ভরে ওঠে বা খালি হয়। বহু সংখ্যক মানুষের মুক্তি নির্ভর করে খ্রিস্টভক্তদের পারস্পারিক কর্মসাধনের উপর। মানব মুক্তি সাধনের প্রক্রিয়া হ'ল খ্রিস্টকে একে অপরের মাধ্যমে বহমান রাখা, কারণ তাদের প্রত্যেককে এই শর্তে মুক্তিদান করা হয়েছে যে, তারা নিজেরাও এক একজন মুক্তিদাতা হয়ে উঠবে। পরমেশ্বর প্রত্যেকের উপর তার ভ্রাতার যত্ন নেবার ভার অর্পণ করেছেন। সেই অর্থে একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী এই বিষয়ে সচেতন যে, সে তার ভ্রাতার অভিভাবক, "প্রিয়ভ্রাতা" বা বিশ্বজনীন ভ্রাতা অদম্য উদ্যমী এক পিতার মতো। মণ্ডলী হ'ল খ্রিস্টের সংস্কার, যা প্রতিবেশীদের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দেয়। "শৌল, শৌল, কেন আমায় নির্যাতন করছ?"

পার্থিব জীবনকালে খ্রিস্ট যে তিন ধরনের মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, আমরা আমাদের আচরণের দ্বারা সেই তিন ধরনের মধ্যে যে কোন এক ধরনের মানুষের মাঝে স্থান করে নিই। এক ধরনের মানুষ হ'ল হেরোদের মত নির্যাতনকারী, ফরিসি এবং মন পরিবর্তনের পূর্বে শৌল। এই ধরনের মানুষের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে যিশু বলেছেন যে, তারা কি করছে তা তারা জানে না। এ ছাড়া আছে যারা খ্রিস্টকে ভালবাসতো এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল: মারীয়া, যোসেফ, প্রেরিতশিষ্যগণ, ধর্মিষ্ঠা নারীগণ এবং সেই ভাল চোর। যিশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যে তিনি তাদের স্থান দেবেন। তৃতীয় দলে ছিল তারা, যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেনি, তাঁর প্রতি উদাসীন, সাংসারিক মানুষ, জড়বাদী, স্বার্থপর। এদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং এদের প্রতি ছিল খ্রিস্টের অগাধ করুণা: "এদের দেখে আমার দুঃখ হয়", কারণ তারা বিঘ্ন পেয়েছিল। খ্রিস্টের দারিদ্র, অবমাননা, অস্বীকার এবং তাঁর অপার্থিব মনোভাব দেখে তারা বিঘ্নিত হয়েছিল। আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হ'ল এই যে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বা নিজেদের থেকেই আমরা যখন খ্রিস্টের সহযোগী হিসাবে থাকি তখন আমরা আমাদের অজান্তেই ঐ তৃতীয় দলের চেহারা ধারণ করি; এবং তা করতে গিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, কাজে ও পরিকল্পনায় উত্তম দিকগুলি পরিহার করি। এমন আচরণ আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে অপব্যয়ী ও বিপদগামী পুত্রের পিতার কাছে বারংবার ফিরে আসার মধ্যে রয়েছে এর প্রতিকারের উপায়; পিতার ঐশ্বরিক সেবাকর্মে প্রত্যাবর্তন এবং আমাদের অন্তঃকরণ নতুন ক'রে এমন ভাবে সাজিয়ে রাখা যাতে, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অন্যদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত পাওয়া পরিত্রাণের প্রবাহধারা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারি।

(৬) সামাজিক আধ্যাত্মিকতা

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কাথলিক মণ্ডলীতে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে ঐশ পরিবারকে ভালবাসা এবং সেই সুন্দর নিগূঢ় দেহের একজন সত্যিকারের জীবন্ত সদস্য হয়ে থাকা, যে দেহের প্রাণ স্বয়ং পবিত্র আত্মা। তৃতীয় ব্যক্তি সেই পবিত্র আত্মা এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর যুগ এক ও অভিন্ন। যে প্রধান গুণের প্রয়োজন, তা হ'ল পবিত্র আত্মার প্রতি আনুগত্য। অর্থাৎ খ্রিস্টীয় জীবনের সামাজিকতার প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া। খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে আমার প্রার্থনা ঈশ্বর এবং আমার মধ্যে শুধু হালকা বাক্যালাপ নয়, বরং তা সমগ্র নিগূঢ় দেহের জীবনী শক্তিতে আমার অবদান। স্বার্থান্বেষণ এবং অহংবোধ তখন আর শুধু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য হবে না, বরং তা এমনই এক ক্ষতিকর বিষয় হবে, যার দ্বারা আমি ঈশ্বরের অধীনে যারা আছে তাদের প্রত্যেককে কষ্ট দেব। আমার মধ্যে প্রতিবেশী এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে এবং বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে অন্যদের দোষত্রুটি খুঁজে বের করে তাদের গালমন্দ দিয়ে তৃপ্ত হলে চলবে না। এ কাজ সহজে হয় না এবং আমাকে দিয়ে এই মুহূর্তে তা শুরু করতে হবে। কোন পাপস্বীকার শ্রোতাকে যদি কোন ভক্ত এসে বলে "ফাদার আমাকে দয়া ক'রে সাধু হতে সাহায্য করুন", এ কথা শুনে ফাদার চমকে উঠবেন। কিন্তু এর উত্তরে যদি ফাদার বলেন, "তোমার পাশের বাড়িতে কে থাকে? অন্যদের জন্য তুমি কি করছ?" একথা শুনে সেই ব্যক্তি আরও বেশি চমকে উঠবে। খ্রিস্টকে বহমান রাখতে হলে আমাদের নিজেদের প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে হবে "তাঁর দ্বারা তাঁর সঙ্গে তাঁরই মধ্যে" এবং ভালবাসার অনুশীলনে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খ্রিস্টকে অন্যদের কাছে বিতরণ করতে হবে। তাঁর সঙ্গে থেকে সৎকর্ম সাধন ক'রে আমাদের ইহ জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এই পৃথিবীতে সৎকর্ম সম্পাদন ক'রে আমাদের স্বর্গের সূচনা করতে হবে। এই হ'ল সামাজিক আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান অর্জন – ঈশ্বরকে শুধু জানা, ভালবাসা এবং সেবা করার আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং অন্যদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করার, অন্যদের দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসার ও সেবা করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। পবিত্র আত্মার সহযোগিতায় অতীন্দ্রিয় দেহ গঠনের কথা যদি একটি মাত্র শব্দে প্রকাশ করা হয় তবে সেই শব্দটি হ'ল "একসঙ্গে!"।

(৭) সক্রিয় সদস্যপদ

গৌরনদীতে প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে একটি নৌকা পুকুর থেকে টেনে শুকনো জমিতে তুলে সেটিকে আবার একটি খালে ভাসানো হ'ত। এই কাজে সাহায্য করতো কুড়িজনের মতো ক্যাটিখিষ্ট তাদের বাৎসরিক নির্জন ধ্যান-সাধনার শেষে। নৌকাটা ছিল খুব ভারী। কিছু ক্যাটিখিষ্ট সামনে থেকে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে নৌকাটা টানতো; যারা দু'পাশ থেকে টানতো তারা বেশি শক্তি প্রয়োগ করতো না, আর পেছন থেকে একদল সরাসরি কোন সাহায্য না করে "সবাই একসঙ্গে' ব'লে চেঁচাতো যা, আরও বোঝা স্বরূপ মনে হতো। ত্রাণকার্যও এই রকম দলগত সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। যারা সাধু সুলভ জীবনযাপন করে তারা উদার ভাবে টানতে থাকে; যারা ঐশকরুণা লাভ ক'রে সৃষ্টির মধ্যে বাস করে তারা ত্রাণ-তরণি টেনে নিতে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করে; যারা মাঝারি মাপের বা সাধারণ জীবনযাপন করে তারা কার্যত অন্যের কাছে অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যরা তাদের বয়ে নিয়ে চলে; আর শয়তানের দৃশ্যমান সহকারী জ্ঞান-পাপীরা প্রকৃত পক্ষে উল্টো দিকে টানে। ঐক্য, ধার্মিকতা এবং উদারতা – নিগূঢ় দেহের এই মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের উপলব্ধি ও নবীকরণ করতে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ঐক্য উপলব্ধি করাতে পবিত্র সাক্রামেন্তের মধ্যে খ্রিস্ট উপস্থিত আছেন । খ্রিস্টের এই উপস্থিতি শুধু তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত মিলন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মিলিত ভাবে উৎসর্গীকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান, উপাসনা ও ঐশভোজ সভায় যোগদান করা ঐক্যের প্রতীক। গ্রহণযোগ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করার আগে আমাদেরকে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটমাট করে ফিরিয়ে আনতে হবে ঐক্যে। আধ্যাত্মিক ভোজসভায় অভ্যাগতদের মধ্যে ঐক্য এবং সেই একই জীবনদায়ী খাদ্যে আমাদের মিলন উপলব্ধি করার আগে আন্তরিক ভাবে পা ধোয়াতে হবে।

(৮) মিশনারি মনোভাব

পবিত্রতা, একতা, সর্বজনীনতা এবং প্রৈরিতিক কাজ – এই হ'ল আমাদের কর্মসূচী। **পবিত্রতা–** প্রত্যেক সদস্য নিজেকে পবিত্র ক'রে তুলে, খ্রিস্টে সকলকে পবিত্র ক'রে তোলার কাজে অবদান রাখে। **একতা –** আফ্রিকায় কর্মরত মিশনারী ফাদার টেমপেলস্ নব দীক্ষিত এক দল খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে প্রেরিতশিষ্যদের আদলে একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন "আসুন আমরা একে অপরকে ভালবাসি" এই হিতকর বিধান অনুশীলনের মাধ্যমে তারা "আমি পবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাস করি" এই বিশ্বাস উক্তিতে উপনীত হ'ত। এই দলটি খ্রিস্টে এতোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে, এক নিগ্রো মহিলা একদিন আবেগমাখা কণ্ঠে বললেন, "আমি এখন আর বহুবচন ব্যবহার না করে প্রার্থনা করতে পারি না"।

সর্বজনীনতা– সেই দেহের প্রত্যেক আলাদা বা সম্ভাবনাময় সদস্যের প্রতি প্রত্যেক সদস্যের অন্তরে গভীর আগ্রহ পোষণ করতে হবে যাতে সেই দেহ পূর্ণতা লাভ করে এবং বৃদ্ধি পায়। প্রতিজন খ্রিস্টভক্ত একজন মিশনারি এবং পরিত্রাণ কর্মে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে প্রতিটি দেশে মণ্ডলী স্থাপনে অবদান রাখতে পারে।

প্রৈরিতিক কাজ হ'ল প্রেরণ কার্যের প্রতি গভীর উৎসাহ এবং চেতনা। কর্মসাধনের উপায় প্রত্যেকের হাতের কাছেই আছে। কাজ করা শুধুই ভালো; যখনই সম্ভব তখনই যেন বাইরে থেকে কাজ করি। প্রার্থনা আরও ভালো; মহান সাধু-সাধ্বীরা বিশেষত তাঁদের প্রার্থনার গুণে মহান মিশনারি হয়ে উঠেছিলেন। কষ্টভোগ করা সবচেয়ে ভালো; খ্রিস্টের দেহের তথা খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য তাঁর যেটুকু যন্ত্রণাভোগ করা এখনও বাকী আছে তাতে কিছু কিছু অবদান রাখতে ধন্যা কুমারী মারীয়া থেকে শুরু করে সেই সিরেনবাসী পর্যন্ত (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তকে আহ্বান করা হয়েছে।

নিগূঢ় দেহ

(১) বিশ্বাস এবং চর্চা

একবার হল্যান্ডের এক প্রটেষ্টান্ট রাণী রাশিয়ার এক অতিথির সঙ্গে কথা বলছিলেন। অতিথি তাকে বললেন, "আমার মনে হয় আপনি একজন খ্রিস্টান"। "বিশ্বাসের দিক থেকে," রাণী উত্তর দিলেন, "তবে চর্চার দিক থেকে নয়। আর আপনি মনে হয় একজন কমিউনিষ্ট"। "অনুশীলনের দিক থেকে", তিনি উত্তর দিলেন, "তবে বিশ্বাসের দিক থেকে নয়"। নিগুঢ় দেহের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়ে কতজন খ্রিস্টভক্ত, এমনকি মিশনারীদেরও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে ক'জন সেই রাণীর মত উত্তর দেবে: তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বাস করা, অথচ ধর্মবিশ্বাসের যথেষ্ট অনুশীলন না করা।

(২) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রহস্য

তবে খ্রিস্টীয় ধর্মশিক্ষায় এই হল বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় বিষয় এবং তা বিশেষ রহস্য বা গুণ যা পবিত্র ক্রুশ সংঘ, তাদের পুণ্য প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা অনুসারে, মণ্ডলীর ব্যাখা ও দৃষ্টান্তে প্রকাশ করেছে, ঠিক যেমন সাধু ফ্রান্সিস সংঘের সন্ন্যাসীরা দারিদ্রকে এবং যীশু-সংঘের সঙ্গীরা বাধ্যতাকে প্রধান গুণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

(৩) আসলে এই ধর্মবিশ্বাস কী

প্রথমতঃ অতীন্দ্রিয় দেহের ব্যাপারে আমাদের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। পোপ দ্বাদশ পিউস এভাবে বলেছেন, পার্থিব মণ্ডলী হচ্ছে দেহস্বরূপ যার মস্তক হচ্ছেন খ্রিস্ট; কিন্তু এই বর্ণনা হয়তো আমাদের কাছে বেশী আলোকপাত করে না, কারণ এই সংজ্ঞা প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে তাদের প্রধানের একাত্মতার যে মৌলিক দিক রয়েছে তার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সদ্য দীক্ষাস্নাত এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, তাকে এমন এক মহান আধ্যাত্মিক সংঘের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যার প্রধান স্বয়ং খ্রিস্ট, তাহলে সেই অদৃশ্য এবং নিরাকার সংঘের সাথে সংযুক্তি তার মনে বিশেষ ছাপ ফেলবে না। কিন্তু যদি তাকে বলা হয় যে, দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে সে যুক্ত হয়েছে খ্রিস্টের দেহের সঙ্গে কিন্তু তা খ্রিস্টের পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত দেহ, সে এখন খ্রিস্টের জীবন্ত অঙ্গ কার্যতঃ অন্য এক খ্রিস্ট, তাহলে সে উপলব্ধি করবে এবং এমন এক বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত মজবুত এক ভিত্তির উপরে। খ্রিস্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ উপলব্ধি করা হচ্ছে সবচাইতে প্রথম ও একান্ত জরুরী বিষয়: আমরা খ্রিস্টে বাস করি এবং খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন। সেই সকল মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, যারা নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ এবং খ্রিস্টেতে এক - এই হল ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনার পূর্ণতার পদক্ষেপ, মনুষ্য জাতিকে নব আদম খ্রিস্টের সঙ্গে এবং খ্রিস্টের ছত্রছায়ায় পুনরায় গ্রহণ করে নিয়ে আসা।

(৪) খ্রিস্টই বিশ্বাসতত্ত্ব প্রকাশ করেন

দীক্ষস্নানের মাধ্যমে খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এই ধারণা বোধগম্যের উর্ধ্বে, কিন্তু এটি এমনই এক সত্য যার উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, কারণ খ্রিস্ট যথাযথ ভাবে তা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন । সাধু পলের পূর্বে, শিক্ষাগুরু যিশু বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে এই শিক্ষা দিয়েছেন: আমি দ্রাক্ষালতা এবং তোমরা আমার শাখা-প্রশাখা। যে পারস্পরিক সংযুক্তির কথা খ্রিস্ট ঘোষণা করেছেন তা পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের ফলশ্রুতি, "যে আমার দেহ খায় এবং আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে বাস করে এবং আমিও তার মধ্যে বাস করি"- তা দৃঢ়তা লাভ করে খ্রিস্টযাগের সময় তাঁর কিছুক্ষণের উপস্থিতির মধ্যে, কিন্তু সেই মুহূর্তগুলির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে না। তা শুরু হয় দীক্ষাস্নানের সময় থেকে।

(৫) একজন মন পরিবর্তনকারীর অভিজ্ঞতা

সাধু পলকে বলা হয় নিগূঢ় দেহের দ্বারা মন পরিবর্তনকারী। যে বাক্য দেহধারণ করেছিল সেই খ্রিস্টকে সাধু পিতর বা সাধু যোহনের মত তিনি দেখেননি বা তাঁর কথা শোনেননি বা তাঁকে স্পর্শও করেননি। দামাস্কাসের পথে চোখ ধাঁধানো আলোর মধ্যে যখন তিনি খ্রিস্টকে দেখেছিলেন, তখন যে খ্রিস্টভক্তদের তিনি নির্যাতন করতেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সেই খ্রিস্টের মিল অপ্রত্যাশিত ভাবে খুঁজে পেয়ে তার মন পরিবর্তন হয়। "আমি সেই খ্রিস্ট যাকে তুমি নির্যাতন করছ"। মনে ঘা দেওয়ার মত এই উক্তি সাধু পল কখনও ভোলেননি। তার পুণ্য অবগাহনের ক্ষেত্রে এই উক্তি হয়ে ওঠে প্রস্রবণ ধারার উৎপত্তিস্থল এবং তার বাকি জীবনে প্রচার কার্যের মূলভাব। "ঈশ্বর আমাদের থেকে দূরে নেই। আমরা তাঁরই জাতি; আমি তোমাদের সেই খ্রিস্টের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছি যে, খ্রিস্ট তোমরা নিজেরাই। আমার ক্ষেত্রে, বেঁচে থাকার অর্থ খ্রিস্ট হয়ে বেঁচে থাকা। এখন এই যে আমি বেঁচে আছি, তা আমি নয় বরং খ্রিস্টই আমার মধ্যে বেঁচে আছে"। "খ্রিস্টে" এই উক্তিটি তার লেখায় ১৬৪ বার পাওয়া যায়।

(৬) খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের সংযোগ

আমরা কখন খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেয়েছি? দীক্ষাস্নানে, যখন আমরা বিধি সম্মতভাবে নিগূঢ় দেহের অধিকার লাভ করেছি। সংগঠিত হয়েছে প্রথম দেহধারণের প্রতিফলন। আমাদের প্রদান করা হয়েছে নতুন এক জীবন, এক ঐশ্বরিক জীবন, ঈশ্বর সন্তানের এক জীবন,

পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেহের একটি অঙ্গ। সাধু পল কখনই নিগূঢ় শব্দটি ব্যবহার করেননি। খ্রিস্টের জীবন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়েছে ঐশ্বরিক একটি বীজের মত যা অঙ্কুরিত হয়ে বিকশিত হতে পারে ও বৃদ্ধি পেতে পারে।

(৭) ঐশ্বরিক গর্ভধারণ

আমরা প্রত্যেকে সত্যি সত্যি খ্রিস্টকে গর্ভে ধারণ করেছি। সাধু পল একটি পোশাকের উপমা ব্যবহার করেছেন: তোমরা যারা খ্রিস্টে দীক্ষাস্নাত হয়েছ তারা খ্রিস্টকে পরিধান করেছ। এটি একটি বৈধ মর্যাদা; তার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তোমার সারা জীবনের সহায়তার প্রয়োজন; "তোমাকে সেই পুরোনো মানুষটাকে (স্বভাবটাকে) পরিত্যাগ করতে হবে এবং পরিধান করতে হবে ন্যায় ও সত্য দিয়ে গড়া নতুন পরিচ্ছদ।"

চেতনারহিত খ্রিস্টের, তথা অপর খ্রিস্টের অঙ্গ হয়ে থাকা যথেষ্ট নয়। একজন গর্ভবতী নারী এবং খ্রিস্টকে ধারণ করে আছে এমন একজনের সঙ্গে তফাৎ হল এই যে, মাতৃগর্ভে শিশু বেড়ে ওঠে মাতার সক্রিয় সহায়তা ছাড়া, শিশুটি তার মাতৃদেহের সীমিত অংশ জুড়ে থাকে এবং প্রসবে সে মার থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু প্রার্থনা, সাক্রামেন্ত, সৎকর্ম এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সহযোগিতা ছাড়া খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে বেড়ে উঠতে পারে না। খ্রিস্টের জীবনের উদ্দেশ্য হল আমাদের অস্তিত্বকে তথা আমাদের দেহ এবং আত্মাকে ততক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখা, যতক্ষণ না আমরা খ্রিস্টেতে রূপান্তরিত হচ্ছি। শিশুটিকে যে ধারণ ক'রে আছে, শিশুটি তার থেকে কখনই আলাদা হয়ে যাবে না, তাকে একটু একটু করে অবিচ্ছেদ্যরূপে শিশুটির অঙ্গিভুত হতে হবে এবং তার ইহজীবনের সমাপ্তিতে দিব্য আলোকে নিজেকে তুলে ধরবে খ্রিস্ট-সদৃশ এক ব্যক্তিরূপে। শুধুমাত্র এই ভাবেই পিতা পরমেশ্বর একজন খ্রিস্টভক্তকে স্বীকার করে নেবেন তাঁর একমাত্র পুত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে, ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান রূপে।

(৮) বিশ্বজনীন রূপান্তর

শেষ বিচারের সময় কোন মানুষই নিছক মানুষ হয়ে থাকবে না। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কর্মের বিচারে রূপান্তরিত হবে ঈশ্বর সন্তান হিসেবে অথবা শয়তানের দাস হিসেবে। সাধু পলের মতে, খ্রিস্টেতে সেই রূপান্তর হল তার শিষ্যদের একটি নবজন্ম; "আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমাদের আমি নতুন রূপে জন্ম দেব, যতক্ষন না খ্রিস্ট তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করছে"।

(৯) আমাদের কার্যকারী সহযোগিতা

তাহলে এই চমৎকার বিশ্বাসতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? করণীয় যা কিছু তা নিহিত থাকবে আমাদের জ্ঞানে গভীর ভালবাসায় এবং খ্রিস্টানুকরণে। অর্থাৎ, বাইরে থেকে অনুকরণ নয় বরং তার আন্তঃপ্রেরণার বহিঃপ্রকাশে, নবজনমে, তাঁর জীবনের ধারাবাহিকতায়। পার্থিব স্বর্গারোহণে খ্রিস্ট তাঁর দৃশ্যমান উপস্থিতি অপসারিত করেছেন যাতে এই পৃথিবীতে তিনি অন্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে পারেন এবং অন্যের মধ্যে হাজার হাজার খ্রিস্ট রূপে আমাদের মধ্যে বাস করে যেতে পারেন, যারা পিতাকে পূজা করবে, ভালবাসবে এবং সেই পবিত্র আত্মার পরিচালনায় একে অপরের মধ্যে খ্রিস্টের সেবা করবে, যে পবিত্র আত্মাকে তিনি অবিরাম আমাদের মাঝে দান করছেন পরমেশ্বরের সাথে আমাদের একাত্ম করে তুলতে। আমরা যদি খ্রিস্টকে আমাদের পরিচালিত করতে এবং আমাদের মাধ্যমে কাজ করতে দিই, তাহলে শুধু আমাদের কথা নয় বরং আমাদের কার্য এবং দৃষ্টান্তও জীবন্ত মঙ্গলবার্তা হয়ে উঠবে।

"প্রভু! আমায় কি করতে বল"? এই হবে আমাদের অন্তরের নিয়ত প্রার্থনা। "হে প্রভু আমার অন্তরে, আমার ওষ্ঠাধরে এবং আমার হস্তে বিরাজ কর, যাতে আমি হয়ে উঠি জীবন্ত মঙ্গলবার্তা এবং মানুষের সাক্ষাতে হয়ে উঠি তোমার সুযোগ্য সাক্ষী এবং দূত"।

(১০) দক্ষ পরিচালক

খ্রিস্টের নেতৃত্ব এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা বুঝতে একটি আধুনিক উপমা সাহায্য করবে। গাড়ী দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তি স্বর্গের দরজায় এসে হাজির হল, তার হাত পা ভাঙ্গা এবং শরীর রক্তে ভেজা। সাধু পিতর তাকে জিজ্ঞেস করলেন তার এরকম যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা কি করে হল, উত্তরে হতভাগা লোকটি বলল, "আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ স্ত্রী বলল, হ্যাগো শুনছো! তুমি যদি এখন আমায় গাড়ি চালাতে দাও, তাহলে তুমি স্বর্গদূত হয়ে যাবে! আমি রাজি হলাম তারপর জোরে এক ধাক্কা এবং আমি এখানে"!

জীবন–গাড়ি চালাতে আমরা একা নই। একজন দক্ষ চালক আমার 'পাশে' থেকেও কাছে আছেন। যেহেতু আমি তাঁকে খুব বেশী চালকের আসনে বসতে দিই না, আমার ভাগ্য ভাল যে আমি এখনও বেঁচে আছি এবং অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনায় চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাইনি। যথার্থ উদ্দেশ্যের জন্য Dom Chautard এই নীতিকথা প্রস্তাব করে গেছেন: আমার জায়গায় খ্রিস্ট হলে কি করতেন? এই মুহূর্তে তিনি আমার কাছে কী আশা করেন? হ্যাঁ, প্রভু! তবে তোমার সাথে। ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজা এমন এক হৃদয়ের ছবি পেয়েছিলেন যা খ্রিস্ট তাকে দেখিয়েছেন এবং যা সম্মোহিত এক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়: "আমাদের প্রভুর দ্বারা আমি সম্মোহিত হতে চাই! এই প্রভাতে আমার সকল ইচ্ছা আমি তাঁর কাছে সমর্পণ করেছি, যাতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিছু না করি, বরং সেই সবকিছু করি যা ঐশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়"।

সাধু ইগ্নেসিয়াস সর্বোপরি চেয়েছিলেন খ্রিস্ট তাকে চালিত করবেন এবং সর্বদা আক্ষরিক অর্থে-ই যিশুর সাহচর্যে বাস করবেন। তার অধ্যাত্মসাধনায় এই হল সমাপন প্রার্থনা: গ্রহণ কর, হে প্রভু, আমার সমস্ত স্বাধীনতা, আমার চেতনা, আমার ইচ্ছা।

(১১) খ্রিস্টের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি

আমরা যদি খ্রিস্টকে প্রায়শঃই আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে দিই, তবে তিনি আমাদের স্থান নিয়ে নেবেন না এবং আমাদের এক পাশে সরিয়ে রাখবেন না। বরং তিনি আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে আলিঙ্গন করে থাকবেন, আমাদের ভিতরে আরও আলো ও শক্তি দান করবেন এবং কৃতকর্মের সাফল্যের কৃতিত্ব ও তৃপ্তি আমাদেরই দেবেন। উপরন্তু, খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুসম্পন্ন প্রতিটি মঙ্গলকর্ম আমাদেরকে খ্রিস্টের সমরূপ করে তুলবে - নৈতিক ভাবে এমন কি শারীরিক ভাবেও। খ্রিস্টের সঙ্গে সাদৃশ্যের একটি নিদর্শন হয়ে উঠবো। কথিত আছে যে, শেষভোজের দৃশ্য আঁকার জন্য একবার এক শিল্পী, ওবেরামমেরগো একটি জায়গায় যান মডেলের খোঁজে। যিশু এবং অন্য প্রেরিতশিষ্যদের মানানসই চেহারা তিনি খুঁজে পান কিন্তু যুদাসের চেহারা পেলেন না। দুর্বৃত্তের মতো চেহারা, এমন মানুষের খোঁজে তিনি এবার চলে যান বস্তি এবং জেলখানায় খুনিদের মাঝে। যুদাসের মডেল হতে পারবে, এমন চেহারার এক কয়েদিকে তিনি পেয়ে যান জেলখানার এক কুঠুরিতে। সেই শিল্পী সবে আঁকতে শুরু করেছেন, এমন সময় সেই কয়েদি অবাক কণ্ঠে বলে উঠলো, "ক'বছর আগেই তো আপনি আমার ছবি এঁকেছিলেন; আবার আরেকটা আঁকছেন কেন"? শিল্পী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, তার মনে পড়ল, এই যে ব্যক্তি এখন যুদাসের মত দেখতে সেই একই ব্যক্তি ক'বছর আগে স্বয়ং খ্রিস্টের মডেল হয়েছিল। তার খারাপ কাজের ছাপ তার কদাকার মুখে পড়েছে। খ্রিস্টে সম্পন্ন প্রতিটি ভালো কাজ ধীরে ধীরে তাঁর ছবি আমাদের মধ্যে অঙ্কিত করে।

(১২) আবেষ্টিত হওয়ার উদাহরণ

খ্রিস্টে সম্পূর্ণ রূপে জীবিত, এই কথা বোঝাতে একজন অপদূতগ্রস্থ ব্যক্তির উদাহরণ সবচেয়ে উপযুক্ত। শয়তান ঈশ্বরকে বোকা বানায়। সে একজন মানুষের মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়ে, তার মুখ দিয়ে কথা বলে এবং সেই ভর করা ব্যক্তিকে দিয়ে আশ্চর্য কাজ করাতে সক্ষম করে তোলে। দীক্ষাস্নানের সময় আমাদের স্বাধীন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনিও আমাদের আশ্চর্য কাজ করাতে সক্ষম করে তোলেন, কিন্তু তিনি সবসময়ই আমাদের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন এবং আশা করেন আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের ইচ্ছা তাঁর কাছে সর্মপণ করি। সাধু পল খ্রিস্টের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়ে কার্যতঃ খ্রিস্টেতে পবিত্র আত্মার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে খ্রিস্টে ভরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মণ্ডলীর এক ধর্মশাস্ত্রবিদ লিখেছেন, "পলের হৃদয় ছিল খ্রিস্টের হৃদয়"। যে সকল প্রকৃত খ্রিস্টভক্ত একান্তভাবে খ্রিস্টের সঙ্গে এক হতে চেষ্টা করছে, সাধু পল হলেন তাদের আদর্শ। আমাদের বলা হয়েছে যে, প্রথম খ্রিস্টভক্তরা হৃদয় এবং আত্মায় এক ছিল। এর কারণ, তারা প্রত্যেকে হৃদয় এবং আত্মায় খ্রিস্টের সঙ্গে অভিন্ন ছিল।

সর্বজনীন পবিত্রতা

(১) নতুন এক ধারা

খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের পঞ্চম অধ্যায়ে "মণ্ডলীতে পবিত্র হওয়ার আহ্বান" সম্পর্কে মহাসভার বিশপগণ আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়টিতে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংগত কারণেই ভক্তজনজনগণের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক জীবন দুই দিক থেকেই হুমকির সম্মুখীন। ধর্মভিত্তিক চিন্তা বা কার্যকলাপকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করার মতবাদের ফলে আধুনিক মানুষের জন্য তার জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে অর্পণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মণ্ডলীর ঐতিহ্যগত শিক্ষা বরঞ্চ তার পবিত্র হওয়ার আহবানকে অনেকটা আড়াল করে রেখেছে। অতীত ঐতিহাসে পবিত্র হওয়া ছিল মঠবাসী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসব্রতী এবং যাজকগণের একচেটিয়া ব্যাপার। প্রতিটি শতাব্দীর সাধু-সাধ্বীর তালিকায় খ্রিস্টভক্তের নাম প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমানে বিশেষ বিশেষ খ্রিস্টভক্তের মধ্যে পবিত্র হওয়ার পথে জোড়ালো একটা আন্দোলন দেখা যাচ্ছে এবং তা যুক্তিযুক্ত ঐশতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রোথিত। প্রতিটি খ্রিস্টভক্তকে সিদ্ধ হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে, সেই সিদ্ধতা যা খ্রিস্ট পবর্তে উপদেশে ঘোষণা করেছেন। খ্রিস্টভক্তের জীবন হলো পূর্ণ খ্রিস্টীয় জীবন, খ্রিস্টকে কোন শর্ত ছাড়াই অনুসরণ করা, যেখানে ভালবাসা ঐশ্বর্যশালী বহুত্বের মধ্যে জীবন সঞ্চার করে; আবার প্রায়শঃই জটিল খ্রিস্টীয় অস্তিত্বেও প্রাণ সঞ্চার করে। যাজক এবং সন্ন্যাসব্রতীদের মত ভক্তজনগণেরও ধর্মীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোন ন্যুনতম পরিমাপ নেই; বরং "ঐশ অনুগ্রহের বিধান"এর কাছে সম্পূর্ণ জীবন সমর্পণ করতে হবে, সমর্পণ করতে হবে "ত্রুটিহীন স্বাধীনতার বিধান" এর কাছে। প্রতিজন খ্রিস্টভক্তের জীবন হবে ঐশরাজ্যের প্রতি ইতবাচক "হ্যাঁ" স্বরূপ। প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তকে নির্দিষ্টভাবে আহবান করা হয়েছে মণ্ডলী গড়ে তোলার কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। খ্রিস্টভক্তের ভূমিকা শুধু নিষ্ক্রিয় ভাবে গ্রহণ করা নয়, বরঞ্চ খ্রিষ্টের অতীন্দ্রিয় দেহের পরিত্রাণের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশে। কাজেই ভক্তজনগণকেও খ্রিস্টের বাণী ঘোষণা করতে হবে এবং যার ফলে তাঁর অনুগ্রহ দৃশ্যমান হবে খ্রিস্টভক্তের মধ্য দিয়ে। সে অবশ্যই মণ্ডলীকে দৃশ্যমান করে তুলবে সেই সব অবস্থানে যেখানে ভক্তজনগণ সাধারণত প্রবেশ করতে পারে যেমন - দাম্পত্য জীবনে, পরিবারে এবং নানা প্রকার জাগতিক বিষয়ে।

প্রভুর সেই জোড়ালো উক্তি "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পবিত্র তোমরাও তেমনি পবিত্র হও", যেমন যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের জন্যও তেমনি ভক্তজনগণের জন্য প্রযোজ্য বলে স্বীকৃত। ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞাতে ইতিমধ্যেই এই ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে: প্রত্যেকে যেন তার সমস্ত অন্তর দিয়ে এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসে। প্রেমাজ্ঞার সংবিধানের যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা যে-কোন উপায়ে অনুসরণ করতে হবে, যাতে পূর্ণ হয় ভালবাসার দ্বিমাত্রিক বিধান।

(২) সম্ভাবনা

পবিত্র হওয়ার আহ্বান খ্রিস্টভক্তদের নিকট আজ্ঞা হিসেবে উপস্থাপন না করে বরং সম্ভাব্য সিদ্ধিলাভের সাধনার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানাতে হবে। একবার একজন পালক পুরোহিত রবিবারে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা সমন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল যারা অনুপস্থিত তিনি তাদেরকেই বলছেন। যারা উপস্থিত তারা নিজেদের মধ্যে এভাবে আলোচনা করতে পারত: "এই উপদেশ আমাদের জন্য নয়। আমরা ভালো করে জানি রবিবারে মিশায় যোগদান না করা গুরুপাপ, এই পাপের শাস্তি থেকে রেহাই পেতে রবিবারের মিশায় যোগ দিতে আমরা বাধ্য এবং সেই কারণেই তো আমরা এসেছি। আমরা জানি মিশায় আসার উদ্দেশ্য কী। মিশা শেষ হলে চলে যাব। আমরা ধৈর্য্যের সাথে শুনছি এবং শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি, যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভাল"। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বরং বোঝাতে হবে নবসন্ধির এই মহা যজ্ঞবলীতে অংশগ্রহণ করে তারা কি সুফল পাচ্ছে এবং সপ্তাহের প্রথম দিনে সম্মিলিত উপাসনা ও সেবাকর্ম ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করে কীভাবে তাদেরকে পবিত্রীকৃত করছে। পবিত্রীকরণ সম্পর্কে ভক্তজনগণকেও একই ভাবে বলতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পবিত্র হওয়া হচ্ছে যাজক ও সন্ন্যাসবতীদের একচেটিয়া ব্যাপার। ধর্মশিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মপ্রচার শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীভূত হয়েছে কেবলমাত্র পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য –– তা গুরু পাপই হোক বা লঘু পাপ হোক। একবার স্বামী যখন তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "ফাদার আজ কি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন"? স্ত্রীর সংক্ষিপ্ত সারবত্তা উত্তর "পাপ সম্বন্ধে"। এ ব্যাপারে ফাদার কি বললেন? "উনি পাপের বিরুদ্ধে?"। ভক্তজনগণকে বোঝাতে হবে যে, পবিত্র হওয়া যা কারো জন্যই সহজ নয়, কিন্তু তাদের জন্য তা পুরোপুরিই সম্ভব। ঈশ্বর যিনি একজন পিতা, কখনই তাঁর সন্তানদের কাছে অসম্ভব কিছু দাবী করেন না; কারণ তিনি চান তাঁর সন্তান লক্ষ্যে পৌছাক এবং এর জন্যে সব উপায় তিনি সবার সামনে খোলা রাখেন। পবিত্র হওয়া মানুষের একার কাজ নয়। পবিত্রতার উদ্ভব হয় ঈশ্বরের শক্তিশালী অনুগ্রহে এবং মানুষের বিনম্র উদার প্রচেষ্টায়। যিশু সেই সামরীয় নারীকে বলেছিলেন -- "যদি জানতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে কি!" আসলে সর্বজনীন পবিত্রীকরণ পরমেশ্বরেরই কাজ এবং তাঁর দেওয়া পৈত্রিক উপহার সকলেরই জন্য প্রদত্ত এবং তাঁর ঐশজীবনে অংশ নিতে প্রত্যেকেই অর্ন্তভূক্ত।

(৩) ইতিমধ্যে ঈশ্বর যা করেছেন

"ভেবে দেখ তো, পরম পিতা কী অগাধ প্রেমেই না আমাদের ভালবেসেছেন, যার জন্যে আমরা ঈশ্বর সন্তান বলে অভিহিত আর আমরা তো সত্যিই তা-ই।.. . যে কেউ তাঁর উপর এমন আশা রাখে, সে নিজেকে পবিত্র করে তোলে, তিনি নিজেই যেমন পবিত্র" (১ম যোহন ৩ঃ১,৩)। এর আগে আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে আমি যা কিছু আলোচনা করেছি তা ছিলো সকল খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশ্যে, যদিও সেখানে মাঝে মাঝে সন্ন্যাসব্রতী জীবনের উল্লেখ ছিল। ঈশ্বরের সর্বোত্তম উপহার শুধুমাত্র যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের জন্য সংরক্ষিত নয়।

বরং তা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তকে দীক্ষাস্নানের সময় প্রদান করা হয়েছে। ঐশপুত্রত্ব আমাদের উন্নীত করে সাধারণ মানুষের পর্যায় থেকে আলোর সন্তানের পর্যায়ে ঐশজীবনের অংশী হতে, যদিও এর বহিঃপ্রকাশ এখনই পরিলক্ষিত হয়না। তবে তা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি জানিয়ে দেয় এবং যার ফলে, আমরা প্রত্যেকে সেই নবজন্মের ক্ষণ থেকে পবিত্র ত্রিত্বের মন্দির হয়ে উঠি। সেই একই দীক্ষাস্নান সংস্কার প্রত্যেক দীক্ষাস্নাত ব্যক্তির মধ্যে খ্রিস্টের দেহধারণ সঞ্চারিত ক'রে, আমাদের ক'রে তোলে খ্রিস্টের জীবন্ত দেহের অংশ, অপর খ্রিস্ট, তথা খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহ মণ্ডলীর সদস্য। পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণের ফলে আমাদের মধ্যে সেই জীবন অবিরাম বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং সদা ঘটমান পঞ্চাশত্তমীর সেই পবিত্র আত্মার অবতরণ আমাদের সামর্থ দান করে, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন বহমান করে রাখতে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে। তাঁর বধু, যিনি মনুষ্য জাতির মাতা, তিনি জননীসুলভ স্নেহে আমাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন, এ যেন চিরস্থায়ী সাহায্যের মানবীয় অভিব্যক্তি। যিশুর শিষ্য হিসেবে প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত প্রবক্তা, যাজক ও রাজা – এই ত্রিবিধ আহ্বান লাভ করেছে। "তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্ত ভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি"। (১ পিতর ২ঃ৯)

খ্রিস্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী হলো প্রবক্তা, যাজক ও রাজার সমাজ; বিশ্বাস, উপাসনা ও সেবার সমাজ। প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তকে তার বিশ্বাস ঘোষণা করতে হবে, আধ্যাত্মিক বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে এবং ঈশ্বর ও তার প্রতিবেশী – "যাকে পরিচালনা করতে হবে, তার সেবা করতে হবে"।

(৪) মানুষের সহযোগিতা ঃ তার ইচ্ছা

ঈশ্বরের উপহারের প্রতি আমাদের সাড়া দেওয়ার প্রথম শর্ত হলো আমাদের সম্মতি দান। "জীবন রাজ্যে যদি প্রবেশ করতে চাও... যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও" (মথি ১৯ঃ১৭-২১)। সেই সর্বোত্তম আদেশ দুটি, যার উপর নির্ভর করে আছে সমগ্র বিধান, তা সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পরমেশ্বরের করুণা। ভালবাসা একটি অতিপ্রাকৃত গুণ। কিন্তু সর্বোত্তম আদেশটির প্রতি প্রেমপূর্ণ বাধ্যতা প্রদর্শনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সব সময়ই যেমন আমাদের নিকট প্রদত্ত, অন্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। ভালবাসতে চাওয়াই ভালবাসা। পবিত্রতা বা সিদ্ধতা মূলত ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার মধ্যে নিহিত; তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে লাভ করা যায় যদি অপব্যয়ী পুত্রের অনুকরণে হৃদয়ে অকপট পরিবর্তন থাকে। আচরণের সিদ্ধতা, যা ভালবাসার সাথে যুক্ত সকল গুণাবলীর অনুশীলন ও অভ্যাস বোঝায়, তা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া হতে পারে; কিন্তু একটি মাত্র ক্রিয়ার মাধ্যমেই হৃদয় ও ইচ্ছার সিদ্ধতা লাভ করা যায়। "ঈশ্বর মানুষের অন্তর দেখেন"।

মানুষের অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসে ভাল ও মন্দ অভিপ্রায়। এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে দুটো বইয়ে "Heaven open by the practice of perfect contrition" এবং "Towards a more beautiful heaven by the acts of perfect charity"। যেহেতু মানুষের ইচ্ছা পরিবর্তন প্রবণ, সেহেতু ইচ্ছার সিদ্ধতা আধ্যাত্মিক পাপস্বীকারেরই মত বারবার নবায়ন করতে হয়। তবে ইচ্ছার সিদ্ধতার মাধ্যমেই আচরণের সিদ্ধতা অর্জন করা যায় – অন্য কোন ভাবে নয়।

(৫) খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহের সক্রিয় অঙ্গপ্রতঙ্গ

খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহের নিগুঢ়তত্ত্ব হল খ্রিস্টভক্তের সিদ্ধতার বিশ্বাসতত্ত্ব । এমনকি সাধু পল নব দীক্ষিত করিন্থীয়দের কাছেও এ বিষয়ে প্রচার করেছেন। প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত বিধানের ক্ষমতা বলে দীক্ষস্নানের সময় অপর খ্রিস্ট হয়ে ওঠে। এই খ্রিস্টভক্তের কাজ হবে পুরানো কু-অভ্যাসগুলো ঝেড়ে ফেলে ন্যায়পরায়নতাপূর্ণ নতুন মানুষটিকে পরিধান করা। তাকে অনুকরণ করতে হবে খ্রিস্টকে, হতে হবে খ্রিস্টের জীবন্ত সাক্ষী, অন্যের মধ্যে বপন করতে হবে খ্রিস্টের জীবন, রত থাকতে হবে খ্রিস্টের কাজে, তার রূপ হতে হবে অধিকতর খ্রিস্টের অনুরূপ এবং রূপান্তরিত হতে হবে খ্রিস্টেতে। এসব কাজ সুসম্পন্ন হবে যখন সে খ্রিস্টের ভালবাসায় যিশুর সাথে একমন একপ্রাণ হয়ে উঠবে, যাঁর মটো ছিল: "আমি সর্বদা তা-ই করি যাতে পিতার আনন্দ হয়"। তিনি ক্রুশের উপর দুহাত প্রসারিত করে মৃত্যুবরণ করে যেন এই কথা বলতে চেয়েছেন, "আমি আমার পিতাকে ভালবাসি এবং ভালবাসি আমার সহ-ভ্রাতাভগ্নিদের, যাদেরকে যেকোন মূল্যে পিতার সাথে পুনর্মিলিত করতে চাই"।

কিন্তু অতীন্দ্রিয় দেহের প্রতি ভক্তজনগণের ভক্তি বিশেষভাবে নিগূঢ়রহস্যের দ্বিতীয় ধারণার প্রতি নির্দেশ করছে, যেমন খ্রিস্টভক্তদের ঐক্য, ভ্রাতাভগ্নিদের মধ্যে খ্রিস্টের সেবা। অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রমাণিত হয় আমাদের দৃশ্যমান প্রতিবেশীকে ভালবাসার মাধ্যমে। কিছু কিছু সন্ন্যাসব্রতী ভুল ধারণা বশতঃ সজ্ঞানে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং প্রতিবেশীদের ভালবাসে দায়সারা ভাবে; অথবা তারা বিশ্বাস করে যে, তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে কারণ পৃথিবীতে তারা কাউকেই ভালবাসে না। এই পৃথিবীতে বসবাসকারী ভক্তজনগণ, তাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসা ও সেবার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়। শেষ বিচারের পূর্বে সে বুঝতে পেরেছে যে, প্রকৃত পক্ষে প্রথম আজ্ঞাটি হলো দ্বিতীয়। কারণ দ্বিতীয়টির মধ্যেই প্রথমটি বিদ্যমান, তা সিদ্ধতার বন্ধনে আবদ্ধ। আর তা-ই, কেউ যদি কোন যাজকের কাছে সিদ্ধতার পথ জানতে চায় তাহলে যাজক উত্তরে তাকে প্রশ্ন করতে পারেন, "তোমার পাশের বাড়ীতে কে থাকে?" সে-ই হলো তোমার জন্য ভালবাসার সমাজের প্রথম সদস্য, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে হলে সেই সদস্যকে জানতে, ভালবাসতে ও সেবা করতে হবে। প্রতিবেশী সিড়ির ধাপ। এই সোপান পেরিয়ে তোমাকে ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। তবে সাবধান! তোমার সেই প্রতিবেশী সে যেমনটি আছে সেভাবেই তার দোষগুণ সমেত তাকে ভালবাসতে হবে, তাকে শুধুমাত্র সিড়ির মত যেন ব্যবহার করা না হয়। যে-ভালবাসা প্রতিবেশীর প্রতি নয়, শুধুমাত্র তুমি ঈশ্বরের প্রতিই প্রদর্শন করছ, তোমার সেই ভালবাসার মর্ম তোমার প্রতিবেশী কখনই উপলব্ধি করবে না। তোমার ভালবাসা সবার প্রতি প্রদর্শন করতে হবে, তবে তা

বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের প্রতি। উপরন্তু তোমার ভালবাসা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে যে-বিশ্বে রয়েছে খ্রিস্টদেহের প্রকৃত এবং সুপ্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ, যে দেহের তুমিও একটি অঙ্গ আর সেই দেহ হলো কাথলিক মণ্ডলী।

বিশ্বাসী সমাজের সদস্যগণ, তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে বিশেষ ভাবে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। একবার একজন ফরাসী সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে জেনারেল ফোর্স এর সাহসিকতা এবং নির্ভীকতার জন্য প্রশংসা করছিল। একদিন সে দেখল খ্রিস্টযাগ শেষে জেনারেল ধন্যবাদের প্রার্থনা জানাচ্ছেন; আসলে সেই জেনারেল যখনই সুযোগ পেত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করত এবং খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করত, এ দৃশ্য দেখে সৈনিকটির স্বগতোক্তি ঃ "ও! এই তাহলে ঘটনা!" .. সৈনিকটি শিখল এই সাহসিকতা ও নির্ভীকতার উৎস কোথায়।

উপাসক সমাজের সদস্য হিসেবে তার আধ্যাত্মিক যাজকত্ব সম্বন্ধে একজন ভক্তবিশ্বাসী সচেতন। ঐশজনগণের উপাসনায় অংশগ্রহণের ফলে সে জানে যে, প্রত্যেক ভক্তবিশ্বাসী ও যাজককে, প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগের বাইরেও তাকে কতভাবে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে হয়। তাকে হতে হবে জীবনদানের বিরামহীন জীবন্ত বলিদান। ভক্তবিশ্বাসী উৎসাহিত হয় সাধু পৌলের কথা শুনে: "তোমাদের জীবনকে পবিত্র ও ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য নৈবেদ্য রূপে উৎসর্গ করতে হবে"। তবে এ কথার অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে আমরা সমাজে যে অবস্থায় জীবনযাপন করছি সেখানে আমাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে, আর তা আমরা করি আমাদের কাজকর্ম দ্বারা। এর মানে হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করি। আনীত ব্যক্তিকে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করি যার ফলে আমরা প্রতিবেশীর নিকট, সমাজের নিকট এবং জগতের নিকট উৎসর্গ করি। খ্রিস্টান হওয়ার অর্থ হচ্ছে খ্রিস্টান হওয়ার সাধনা করা। এর জন্য প্রয়োজন অবিরাম ও কষ্টসাধ্য মন-পরিবর্তন। স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টি দিয়ে জগতসমাজে আমরা আমাদের সম্পর্ক বিবেচনা করে দেখি যে, প্রত্যেকে আমরা নিজের জন্য ও আপনজনদের জন্য সাধনা করি যাতে আমাদের জীবন অবস্থাটা আরামদায়ক ও যতদূর সম্ভব মহান হয়ে উঠতে পারে। আমাদের মনপরিবর্তনটা হল আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কসমূহকে, জাগতিক বিষয়বস্তুর সাথে দৈহিকভাবে সমান্তরাল সম্পর্ক হিসেবে না দেখে, ঊর্ধ্বতন ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করে দেখা। এর অর্থ হচ্ছে "আমার জন্য" না হয়ে "ঈশ্বরের জন্য", অথবা "অপরের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য" প্রণোদিত হয়ে সম্পর্ককে বিবেচনা করা। আমাদের সবকিছু একটি আধ্যাত্মিক উৎসর্গ হয়ে উঠবে যদি আমরা যাকিছুর সংস্পর্শে আসি, যাকিছু আমরা করি, তা যদি আত্মদানের একটি মুহূর্ত হয়ে আসে, অপরের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের একটি আলোকোজ্জ্বল মুহূর্ত হয়ে উঠে।

(৬) খ্রিস্ট-ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব

খ্রিস্ট-ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতা সন্ন্যাসব্রতীদের আধ্যাত্মিকতার কোন সস্তা অনুকরণ নয়, এমন কি সম্ভাব্য সকল বিষয়ে সন্ন্যাসব্রতীদের আধ্যাত্মিকতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করাও নয়। ফাদার কংগার ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতা এই ভাবে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করেন: তাদের আধ্যাত্মিকতার গতি জগতের দিকে, কিন্তু জাগতিক নয়। ভক্তজনগণের নিজস্ব পবিত্রতার বিষয়ে তিনটি দিক স্পষ্ট হয়ে আসে: (ক) যাকিছু জাগতিক তা পবিত্র করা, এই ভাবনা "কাথলিক এ্যাকশন" আন্দোলনে ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। (খ) প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্রতা বাসনা করা। (গ) জীবনের বাস্তবতা ও ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ঐ দিকেই ধাবিত করে, অর্থাৎ সাধুতা অর্জন, পালকীয় নির্দেশনা, ইত্যাদির দিকে। ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত খ্রিস্টভক্তদের জীবনাবস্থা এটাই দাবি করে যে, খ্রিস্টানদের জীবনে ঈশ্বরের মানবদেহধারণ ঘটবে এবং পরিত্রাণের দিকে সে ধাবিত হবে। ফাদার কংগারের ধারণা অনুসারে ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতায় পাঁচটি উপাদান আছে: ঈশ্বরের ইচ্ছা, আহ্বান, সেবা, দায়িত্বশীলতা, ক্রুশাঙ্কিত জীবন।

(ক) ঈশ্বরের ইচ্ছা একদিকে পবিত্র এবং অন্যদিকে পবিত্র করে। ঈশ্বর তাঁর প্রেমপূর্ণ স্বাধীনতায়, তাঁরই আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষের কাছে তাঁর মঙ্গলময়তা প্রকাশ করতে চান। অতএব, তাঁর সেই ইচ্ছা যেন স্বর্গে ও মর্তে পালিত হয়, তার জন্য আমাদের সহযোগিতা করার আগ্রহ খুবই মূল্যবান।

(খ) আহ্বান: যেমনটি ইতিমধ্যে বলা হয়েছে "সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহ" আর এখন বলা যেতে পারে "সবই আহ্বান"। এই আহ্বান শব্দটি পূর্বে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের জন্য প্রয়োগ করা হত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অঙ্গীকারসম্পন্ন বিভিন্ন জীবনাবস্থার বেলায়ও আহ্বান শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিবাহিত জীবনে যেমন, তেমনি জগতের মধ্যে অবিবাহিত জীবনের জন্য আহ্বান রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আহ্বান আছে, কেননা প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে যা তাঁর অনন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশে অভিষিক্ত।

(গ) সেবা ও তার চাহিদাসমূহ: খ্রিস্টভক্তজনকে ঈশ্বর জগত থেকে পৃথক করেন যেন, জগতকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন যেখানে সে পরিবারসহ জীবনযাপন করবে এবং সেখানে তার নিজস্ব কাজ সম্পন্ন করবে। তাই তার ভালাবাসা প্রকাশ করার জন্য সেবা প্রয়োজন। তাঁর সেবাকাজে দু'টো জিনিষ অত্যাবশ্যক: নিজের জীবনাবস্থা ও পেশা সম্পর্কে দক্ষ হওয়া, সবকিছু ভালভাবে করা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জগতের বস্তুসামগ্রিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন মনে হবে সে ব্যবহারই করছে না – একটা রাজসিক নিরাসক্তি।

(ঘ) সম্পৃক্ততা ও দায়িত্বশীলতা: জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে এমন দায়িত্বভার গ্রহণ করে তা যেন মনে হয় ঈশ্বর কর্তৃক প্রদর্শিত এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনে নিয়োজিত হওয়ায় এবং সকল বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য সীমাবদ্ধতা থাকায়, দলগতভাবে কাজ করা হচ্ছে তাদের ফলপ্রসূ আহ্বান। দলগতভাবে কাজ করা হচ্ছে বন্ধুত্ব ও সংঘবদ্ধ মনোভাব। এই মনোভাবই হচ্ছে গণমঙ্গলের এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের নৈতিকতা যা প্রত্যেক অবস্থায় বিদ্যমান।

(ঙ) ক্রুশাঙ্কিত জীবন: জগতের সাথে সম্পর্কে খ্রিস্টভক্তদের দু'টো ধারা আছে: নিরাসক্তি ও সম্পৃক্ততা যা ক্রুশ দ্বারা চিহ্নিত। প্রৈরিতিক জীবনে তিনটি মুহূর্তে ক্রুশের আগমন ঘটে: (১) পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের সেবা করার উদ্দেশ্যে জগতের বস্তুসমূহের ব্যবহার পবিত্র করার সময়ে: এটা পরীক্ষামূলক ভূমিকা। (২) একজনার জীবনে অন্তর্বর্তীকালীন লক্ষ্যসমূহ ও পরম লক্ষ্যের মধ্যে খাঁটি সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা: এটা ত্যাগস্বীকারমূলক ভূমিকা। (৩) জাগতিক ব্যবস্থাকে খ্রিস্টেতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ইহজগতের মধ্যে মঙ্গলসমাচার মূর্ত করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়: এটা ব্যর্থতার ভূমিকা।

(৭) আধ্যাত্মিকতার সুফল: যা আমরা পেতে পারি

(ক) সক্রিয় ভালবাসা: "কাথলিক এ্যাকশন" নীতি থেকে আগত দলগত মনোভাব মিশনারীদের কাজকর্মে যখন সম্পৃক্ত করা হল তখন তাদের মধ্যে ঐক্য ও মিলন আরও নবীন ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। তারা ইতিমধ্যে পরস্পরকে ভালবাসতে সচেষ্ট হল, যদিও নিজেদের চারিত্রিক বিভিন্নতার কারণে পূর্ণভাবে সফল হয়নি, তথাপি যখন তারা একই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করতে লাগল, তখন অন্যকে ভালবাসা আরও সহজ বলে অনুভব করল।

(খ) ধর্মসংস্কারের প্রতি প্রৈরিতিক মনোভাব: সন্ন্যাসব্রতীরা পবিত্র কমূনিয়ন গ্রহণ করাকে একটি লক্ষ্য হিসেবে অনেকটা বিবেচনা করে। তারা খ্রিস্টকে আপন সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করে। পবিত্র কমূনিয়ন গ্রহণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় যদি তারা নিজেদেরকে টেবিলের বিভিন্ন খাপের মতো বিচ্ছিন্ন না করে, তাহলে তাদের দৈনন্দিন জীবন স্মৃতি ও প্রত্যাশা দ্বারা আবেষ্টিত হয়ে থাকে: "আমি আজ সকালে তাঁকে গ্রহণ করেছি; আবার আগামীকাল তাঁকে গ্রহণ করব"। অপরদিকে ভক্তজনগণ কমূনিয়ন গ্রহণ করে জীবনধারণের জন্য, কমূনিয়নের জন্য তারা জীবনধারণ করে না। কমূনিয়ন গ্রহণ করার পরে তারা খ্রিস্টকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, তাঁর উপস্থিতিকে তাদের কর্মস্থলে, সহ-কর্মীদের মধ্যে, তাদের ভালবাসার সমাজ সেই দলের মধ্যে নিয়ে যায়। সন্ন্যাসব্রতীরা খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবনে আরও প্রৈরিতিক মনোভাব পোষণ করবে তাতে তো কোন বাধা নেই।

(গ) প্রার্থনায় আরও প্রাণবন্ততা: ভক্তজনের প্রার্থনা, যেহেতু কোন নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নয়, সেহেতু তার প্রার্থনার জীবন সন্ন্যাসব্রতীদের চাইতে অনেকটা স্বাধীন এবং ব্যক্তি-সম্পর্কিত। সে আপন প্রয়োজনের তাগিদে মৌখিক বা মননশীল প্রার্থনা করে থাকে। সে জানে যে, খ্রিস্টকে ছাড়া জগতের মাঝে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা ও সাক্ষ্যদান করতে সক্ষম নয়। সে প্রার্থনা করে যাতে খ্রিস্টের সাথে তার যোগাযোগ আরও সঞ্জীবিত হয়। তার জন্য প্রতিবারের প্রার্থনা হচ্ছে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সামিল। তার সকল আবেদন সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করা যায়: "সর্ব্বোপরি আমার নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি মরতে প্রস্তুত, তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করি যেন তোমার আত্মাতে আমি বেঁচে থাকতে পারি।"

ব্যক্তিগত এবং সমবেত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্বাস করে বলে, সে উপাসনা-অনুষ্ঠানে এবং ঐশবাণীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সাধনা যেহেতু নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত, সেহেতু তারা চেষ্টা করে তাদের কর্তব্য পূরণ করতে, তাদের সাধনা অনেকটা ব্যক্তিগত এবং প্রৈরিতিক মনোভাব সেখানে কম। সন্ন্যাসব্রতীদের মৌখিক প্রার্থনা আরও ব্যক্তিক ও প্রাণময় করে তুলতে পারলে তারা উপকৃত হবে।

খ্রিস্ট-ভক্তজনগণের যাজকত্ব

(১) যাজকত্বের প্রকৃতি

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার তৃতীয় অধিবেশনের পরিসমাপ্তিতে "খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের" উপর পুণ্যপিতা যে ঘোষণা দেন তা সমগ্র মহাসভার প্রধান ঘটনা হয়ে থাকবে। তা হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রেরণকর্মের জন্য প্রধান ভিত্তি-প্রস্তর এবং ভবিষৎ প্রৈরিতিক কাজের আলোকময় পথ-নির্দেশিকা। মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায় "ঈশ্বরের জনগণ" এবং চতুর্থ অধ্যায় "ভক্তজনগণ" পাঠ করে কাথলিক মণ্ডলীর জনগণ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জানতে পারবে যে, এই অধ্যায় দুটি বিশেষ করে তাদের জন্য লেখা হয়েছে। এতটা গুরুত্বের সাথে খ্রিস্ট-ভক্তজনগণকে, যারা কোন পুণ্যাভিষিক্ত যাজক নন কিংবা কোন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেনি, এর আগে তেমন কোন মহাসভা সেভাবে বিবেচনা করেনি। তারা যখন মহাসভার এই শিক্ষা সম্বন্ধে জানতে পারবে, তারা এর থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করবে এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে কাথলিক ধর্মতত্ত্বের পরিকাঠামোর মধ্যে খ্রিস্টভক্তদের যাজকত্বের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা সেখানে দেখতে পাই, খ্রিস্টীয় যাজকত্বের উৎস বাক্যের দেহধারণ থেকে, যখন খ্রিস্ট তাঁর ঐশ-মানব সত্ত্বার রূপ ধারণ করেছেন এবং মহাযাজক রূপে আগমন করেছেন নিষ্কলঙ্কা মারীয়ার গর্ভে। পশু-যজ্ঞবলির পরিবর্তে তিনি নিজেকে তেত্রিশ বছরের প্রেমপূর্ণ বাধ্যতার বলিদান উৎসর্গ করেছেন এবং ক্রুশের উপর নব বিধানের সেই অনন্য এবং চুড়ান্ত বলিদান সুস্পষ্ট রূপে সম্পন্ন করেছেন। সেই বলিদান ঐশ ন্যায়বিচারের কঠোরতা প্রশমিত করে এবং সেই বলিদান আমাদের বেদীর ওপর পুনঃনবীকরণ করে, আর তা পৃথিবীর সর্বত্র খ্রিস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে থাকবে। খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ সেই মণ্ডলীর মধ্যে খ্রিস্ট আজও সুস্পষ্ট রূপে এবং সম্পূর্ণভাবে বেঁচে আছেন; সুতরাং খ্রিস্ট বেঁচে আছেন যাজকদের চরিত্রে খ্রিস্টের গুণাবলীর মধ্যে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মানবতা অতঃপর মহিমান্বিত হয় যাজকত্বের সর্বোচ্চ মর্যাদায়। মহাসভা গুরুত্বের সঙ্গে এই কথা ব্যক্ত করেছে: "মানুষের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া প্রধান যাজক খ্রিস্ট তাঁর পিতা পরমেশ্বরের কাছে নব জনগণকে এক রাজকীয় যাজক পদে দীক্ষা দিয়েছেন। কাজেই সকল খ্রিস্টভক্ত ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের যাজকীয় রাজপদের অংশী"।

(২) যাজকত্বের গুরুত্ব

খ্রিস্টান ভক্তজনগণের যাজকত্ব এবং পুণ্যপদাভিষেক সংস্কারের কারণে সাক্রামেন্তীয় যাজকত্বের মধ্যে যে শুধু সত্তাগত পার্থক্য আছে তা নয়, বরং তুলনামূলক পার্থক্যও আছে, যা মহা ধর্মসভা নিশ্চিত করে দিয়েছে। এই চিন্তাধারা সংস্কারপন্থীদের মতের বিপরীত কেননা তারা যাজকদের কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতা প্রত্যাখান করে; তারা শুধু সকলকে ভাইবোন বলে মণ্ডলীতে বাস করবে এবং প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাবে। কিন্তু আমরা যদি এই দুই ধরনের যাজকত্বের তুলনা করি তবে আমরা প্রথম ধরনের যাজকত্বের গুরুত্ব বুঝতে পারব। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের যাজকত্ব সর্বজনীন এবং তা প্রত্যেকের উপর অর্পণ করা হয় দীক্ষাস্নানের সময় পবিত্র তৈল লেপনের মাধ্যমে; আর সাক্রামেন্তীয় যাজকত্ব নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য এবং তা অর্পন করা হয় পরিণত বয়সে পুণ্য পদাভিষেক সংস্কারের মাধ্যমে। খ্রিস্টভক্তজনগণের যাজকত্বের উদ্দেশ্য নিজেদের পবিত্র করা, অন্যদিকে সাক্রামেন্তীয় যাজকত্ব অন্যদের পবিত্রীকরণের জন্য। খ্রিস্টভক্তজনগণের যাজকত্বের অনুশীলন জীবনভর, অন্যদিকে সাক্রামেন্তীয় যাজকত্ব নির্দিষ্ট কাল এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য: খ্রিস্টযাগ, রবিবারের উপদেশ, মাঝে মাঝে পবিত্র সংস্কার প্রদান। এই দুই প্রকার যাজকত্ব একটি সাধারণ সূত্রে বাধা আছে; তা হ'ল অভিষিক্ত যাজকদের যে যাজকীয় সেবা বা অন্যদের সেবাকর্মের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, তার ফলে তারা আধ্যাত্মিক (দীক্ষাস্নানের) যাজকত্ব হারিয়ে ফেলে না। আসলে তাদের মধ্যে সত্যিকারের যাজকীয় ভাব থাকতে পারেনা যদি না তারা তাদের আদি যাজকত্ব অনুভব করে। খ্রিস্টযাগ ছাড়াও, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি প্রেমপূর্ণ বাধ্যতার বলে আত্ম-বলিদানের মাধ্যমে অনবরত জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, যেমন খ্রিস্টর ত্রিশ বছর ধরে নাজারেথের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে করে গেছেন। সাধু আগষ্টিন তার জনগণকে বলেছেন, "তোমাদের জন্য আমি যা, তা আমাকে ভীত করে তোলে, কিন্তু তোমাদের সাথে এক দেহ হয়ে আমি যা, তা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। তোমাদের জন্য আমি একজন বিশপ, কিন্তু তোমাদের মতো এবং তোমাদের সঙ্গে আমিও একজন খ্রিষ্টভক্ত।" কাজেই পুণ্যপদে অভিষিক্ত এবং আধ্যাত্মিক (দীক্ষস্নানের) এই উভয় ধরনের যাজক খ্রিস্টের যাজকীয় রাজপদের সঙ্গে নিজেদের যাজকীয় চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে এবং আনন্দিত মনে মহামান্য পোপ লিও তাঁর গুরুগম্ভীর উপদেশে যেমন বলেছেন, সেইভাবে একে অপরকে সম্বোধন করুক: "হে খ্রিস্টভক্ত, তোমার গৌরবের সত্যতা স্বীকার কর"। ব্রতধারী ভ্রাতা-ভগ্নীদের এই কথা স্মরণে রাখা উচিত যে, তারা সেবাকারী যাজক নন, সেবাকারী যাজকদের তারা যে কাছাকাছি তাও নয় এবং যাজকদের দলভুক্তও কেউ নন, বরং তারা প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের সঙ্গে দীক্ষাস্নানে তৈল লেপনে তারাও খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিক যাজকত্বে যাজক হয়েছে।

এতো মহৎ এক মর্যাদাকে সবাই যেন সম্মান করে এবং ঈশ্বর ও মণ্ডলীর সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, তার মাধ্যমে এই মর্যাদার অংশীদার হয়ে, খ্রিস্টের পবিত্রতা লাভ করার চেষ্টা করে এবং অন্যদের পরিত্রাণের সহায়ক হয়।

(৩) যাজকত্বের এতো অবহেলা কেন?

একথা যদি সত্যি হয় যে, প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিস্টভক্ত একজন যাজক, তাহলে কেমন করে এত লোক এই বিষয়ে অজ্ঞ এবং অসচেতন? এর একটি কারণ হলো, এই বিষয়ে তাদের খুব কমই বলা হয়। কখনও কখনও নতুন যাজক তার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়দের এই শিক্ষা দেয় যে, তারাই সত্যিকারের যাজকত্ব লাভ করছে, যদিও সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক (দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত) যাজকত্ব; কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তাদের উপদেশ খুব একটা শোনা যায় না; বেশির ভাগ প্রচারকের উদ্দেশ্য ভক্তমণ্ডলীকে পাপ থেকে দূরে রাখা এবং মন্দ কাজ, গালাগাল ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা। বর্তমান ধর্মশিক্ষায় আমরা এই বিষয়ে কিছুই দেখতে পাই না। ধর্মশিক্ষায় ঐশ করুণার মূল তত্ত্ব এবং নিগূঢ় দেহ সম্বন্ধে খুব কমই বলা হয়; কাজেই একইভাবে খ্রিস্টভক্তদের সাধারণ যাজকত্বের বিষয়ে যে কোনও আলোকপাত করা হবে না তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এমন কি আধ্যাত্মিক বইগুলোতেও এই বিষয় নিয়ে কদাচিৎ আলোচনা করে। ফাদার ট্যানকুয়েড়ে (Tanqueray) তার লেখা বই "Precis d'ascetique et Mystique" এ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক লেখকদের একটি যথোচিত সমন্বয় ঘটিয়েছেন, কিন্তু অন্য বিষয়ে তার প্রশংসনীয় লেখার মধ্যে আধ্যাত্মিক (দীক্ষাস্নানের) যাজকত্বের বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি। নৈতিক ধর্মতত্ত্বের লেখকগণ আদেশ লঙ্ঘন ও পাপের গুরুত্ব হালকা করে অনেক কথা বলেন কিন্তু ভক্তজনগণের ইতিবাচক যাজকত্বের তত্ত্ব বিষয়ে নীরব। সম্প্রতি ফাদার হ্যারিং তার লেখা নৈতিক বই "খ্রিস্টের বিধান"- এ বলেছেন "এখন থেকে নৈতিক শিক্ষাকে ধর্মতত্ত্ব থেকে আর আলাদা করবেন না। এই শিক্ষা দিন যে একজন খ্রিস্টভক্তের আদর্শ নিহিত আছে তার যাজকীয় আহ্বান এবং তাতে সাড়া দেওয়ার জ্ঞানের মধ্যে।"

আর একটি কারণ হতে পারে যে, অনেক যাজক যাজকীয় অভিষেকের মাধ্যমে দৃশ্যমান ও সাক্রামেন্তীয় যাজকত্ব গ্রহণ করার পর হয়তো নিজেদের অজানতে ভুলে গেছে বা মনোযোগ দেয়নি তাদের অন্তরস্থ এবং আধ্যাত্মিক (দীক্ষাস্নানের) যাজকত্বের ওপর – যে যাজকত্বের অংশীদার কিন্তু ভক্তজনগণও। তথাপি আধ্যাত্মিক (দীক্ষাস্নানের) যাজকত্বের আরও বিস্তর চেতনা হওয়া উচিৎ এবং নিগূঢ় দেহের যে কোন সদস্যের পরিত্রাণ এবং পবিত্রতার জন্য আরও বেশী প্রয়োজন।

(৪) যাজকত্বের অনুশীলন

খ্রিস্ট তাঁর সমগ্র জীবনে ছিলেন একাধারে যাজক এবং যজ্ঞবলি। গেৎসিমানী বাগানে এবং কালভেরি পর্বতে সেই চরম অবস্থা এবং দোতালার সেই ঘরে পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা, যা আমাদের বেদীর ওপর তাঁর বলিদান এক চিরস্থায়ী উপাসনা হয়ে উঠেছে এবং তাঁর কোন ভক্তের কাছে এই সত্য যেন গোপন করা না হয় যে, এই পৃথিবীতে তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মের মাধ্যমে তারা অবিরাম খ্রিস্টের সঙ্গে যাজক এবং বলি হয়ে উঠছে। ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতা এবং একজন সেবাকারী যাজকের সকালের (বা সন্ধ্যার) খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ বাদ দিলে উভয় যাজকই অবিরাম এক যজ্ঞের যাজক এবং যজ্ঞবলি।

যাজকত্ব সকলের কাছে আকর্ষণীয় হলেও বলিকৃত হওয়া কেউ পছন্দ করে না; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ই উপলব্ধি করা যায় প্রতিনিয়ত খ্রিস্টের মাধ্যমে এবং পবিত্র আত্মার সংযোগে আমাদের পিতা পরমেশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে প্রেমপূর্ণ বাধ্যতা আর সমর্পণের মধ্য দিয়ে। নৈবেদ্য এবং আত্মোৎসর্গ কার্যত এক এবং অবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করার অর্থ যন্ত্রনাভোগ এবং মৃত্যু নয়। "আমি পরমানন্দে সব কিছু ত্যাগ করেছি"। যে খুশি মনে অর্পণ করে ঈশ্বর তাকে ভালবাসেন।" ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সামনে সাজাপ্রাপ্ত এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মতো আমাদের নিজেদেরকে অর্পণ করতে হবে না, বরং অর্পণ করতে হবে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার অনুকরণে দয়াময় পিতার ভালোবাসার কাছে, "উপচে-পড়া ঐশধারা, যা অন্যেরা প্রত্যাখ্যান করেছে তা গ্রহণ করতে, ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা এবং ত্রুটিহীন ভালবাসার আচরণে জীবনযাপন করা," সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের নিরিখে কাজকর্ম, প্রার্থনা, আনন্দ বা ভালবাসার খাতিরে দুঃখভোগ, ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের সামনে অথবা নাজারেথের শিশুর সামনে ঐশ ভালবাসায় সাড়া দিয়ে একজনের জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম গোলাপের পাপড়ির মতো ছিটিয়ে দেওয়া। আমাদের বেশির ভাগ মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর মৃত বলি চান না, বরং চান আনন্দময় জীবন্ত বলি। "তোমাদের দেহ জীবন্ত এক বলি রূপে নিবেদন কর এবং তা যেন পবিত্র এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়" – এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের জানিয়ে, সাধু পল যা বলতে চেয়েছেন তাহল এ সংসারে আমরা যে পরিচয়ে আছি, আমাদের সেই আমিটাকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে হবে এবং আমরা আমাদের সাধারণ কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে তা করতে পারি। অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের এই আমিটাকে প্রেমপূর্ণ বাধ্যতায় ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করতে হবে।

আমাদের সক্রিয় জীবনের আমিটাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে সম্মিলিতভাবে প্রতিবেশীর কাছেও নিজেকে উৎস্বর্গ করি ও প্রদান করি। বলতে গেলে, আমরা নিঃস্বার্থ সেবায় ক্ষয় হতে থাকি। যে ধর্মাচরণে আমরা ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ তা হল বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের সেটুকু জীবন যেটুকু ঈশ্বরের সঙ্গে সেই পরিস্থিতিতে সম্পর্কযুক্ত। খ্রিস্টান হওয়ার অর্থ খ্রিস্টান হতে চেষ্টা করা। তা করতে হলে প্রয়োজন অবিরত এবং কঠিন এক পরিবর্তন। তা হল নিজের কাছে নিজে মৃত হওয়া, এই হ'ল প্রকৃত আত্মবলিদান । সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আমরা সমাজের সঙ্গে আমাদের এমন এক সম্পর্ক দেখি, যেখানে প্রত্যেকে তার নিজের এবং প্রিয়জনের জন্য যথাসম্ভব এক সুবিধাজনক এবং গৌরবময় স্থান প্রতিষ্ঠা করতে লড়াই করে যাচ্ছে। আমাদের পরিবর্তনের ফলে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হবে সকলের প্রতি, আমাদের পরিবার কিংবা সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের প্রতি, জাগতিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সাধারণ সমান্তরাল ভাবে যুক্ত না হয়ে বরং উর্দ্ধমুখী হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে।

এর অর্থ হচ্ছে "আমার জন্য" এই মনোভাব না রেখে "ঈশ্বরের জন্য" কিংবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে "অপরের মাধমে ঈশ্বরের জন্য" মনোভাবে পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের আধ্যাত্মিক যজ্ঞ সঠিকভাবে উৎসর্গীকৃত হবে যদি আমরা, যে-কোন

পরিস্থিতির সম্মুখীন হই না কেন, যা কিছু করি না কেন, তার মধ্যে যদি খুঁজে পাই আত্মবলিদানের কারণ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ এবং তাঁকে অন্যদের কাছে প্রকাশ করার কারণ। এই হ'ল বিশ্বাস এবং প্রেমে বেঁচে থাকা।

(৫) যাজকত্বের পূর্ণতা

আমরা যেন এ কথা মনে না করি যে, "পবিত্র এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক উৎসর্গে আমাদের নিজেদের নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করার" ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ আমরাই গ্রহণ করি। ঈশ্বর প্রথমে আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের ভালবাসা হ'ল সব সময় ঈশ্বরের সেই ভালবাসায় সাড়া দেওয়া। আমাদের এই কর্ম প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর সর্বদা তাঁর প্রতিষেধক কৃপা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমাদের কার্যকলাপ ভাল, খারাপ বা কোনোটাই আরোপ করা না যেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর, যিনি নিজেই কর্ম, তাঁর অবিরাম কার্য সবসময়ই ভাল, গুরুত্বপূর্ণ, অনন্ত। তাঁর প্রেম যা তিনি নিজেই, তিন ঐশব্যক্তির মধ্যে আরোপিত: সৃষ্টি, দেহধারণ ও পরিত্রাণ এবং পবিত্রীকরণ। পুত্র এবং পবিত্র আত্মা উভয়কে এই পৃথিবীতে এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্যে ভালবাসার প্রৈরিতিক কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যে কোন প্রেমিকের মতো ঈশ্বরও চান আমরা আমাদের ভালবাসা স্বাধীনভাবে অন্তরের এবং ইচ্ছার উপহার হিসেবে ঈশ্বরকে দিই; এই একটি মাত্র বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে বলপূর্বক নিতে না চাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর উপস্থিতিতে এবং প্রেমপূর্ণ যত্নে ঘটা প্রতিটি ঘটনা আমাদের প্রতি তাঁর অবিরাম আহ্বান এবং তার অপরিহার্য বার্তার অভিব্যক্তির মোড়ক। তিনি সর্বদা চান আমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করতে, আমাদের মধ্যে দেহধারণ করতে, আমাদের পবিত্রীকৃত করতে এবং এই পৃথিবীকে পবিত্রীকৃত করার মহৎ কাজে ঈশ্বর প্রসন্ন চিত্তে আমাদের আহ্বান করছেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। কালের সূচনা থেকে তাঁর বার্তার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই বার্তার সংক্ষিপ্তসার দুটো ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে, যে বার্তা মহাদূত গাব্রিয়েল দেহধারণের সেই পরম মুহূর্তে নিয়ে এসেছিলেন: "ঈশ্বর তোমায় ভালবাসেন তোমাকে ঈশ্বরের প্রয়োজন"। ধন্যা কুমারী মারীয়ার কাছে সেই বার্তার একই বাক্য দিয়ে আমাদের সাড়াদান প্রকাশ করা যেতে পারে, তবে একটু উল্টো করে: "তোমাকে আমার প্রয়োজন তোমাকে ভালবাসতে, এসো প্রভু যিশু"। প্রতিটি বর্তমান মুহূর্তকে ধ্যান ও কার্যের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রার্থনার সময় আমরা যেমন শুধু ঈশ্বরের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি এবং শুধু তাঁর কথাই চিন্তা করি, আমরা যেন তা না করে বরং বর্তমান ঘটনার মধ্যে তাঁর সক্রিয়তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমরা যখন আমাদের জামা-কাপড় পরিষ্কার করি, চুল আঁচরাই তাঁর কর্ম সেই রকমই গুরুত্বপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ, সীমাহীন, ঠিক সেই রকমই, যখন তিনি মহাদূত গাব্রিয়েলকে তাঁর পুত্রের দেহধারণের সময় পাঠিয়েছিলেন, কারণ সেই প্রারম্ভিক অনুগ্রহ এখনও আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিনি আমাদের মাথার প্রতিটি চুল গুণে রেখেছেন এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া একটি চুলও খসে পড়ে না। আমার জীবনে ঘটা প্রতিটি ঘটনা আমার বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ঘটে। সেই ঘটনার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের আহ্বান, সেই ঈশ্বর যিনি একটি নীরব "হ্যাঁ"-এর দ্বারা আমাদের হৃদয়, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের সহযোগীতা আশা করেন। সবচেয়ে সুন্দর যে শব্দ দিয়ে আমরা তাঁকে সম্ভাষণ করতে পারি তা হল, আনন্দের সময় "এই দেখ" (Ecce; Behold) অথবা কষ্টের সময় "তাই হোক" (Fiat)।

এই ভাবেই আমাদের আধ্যাত্মিক যজ্ঞ পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসর্গীকৃত হবে। আমরা যেন কখনো এ কথা ভুলে না যাই যে, আমাদের আধ্যাত্মিক (দীক্ষাস্নানের) যাজকত্ব আমরা একা একা পালন করছি না। আমাদের সহানুভুতিশীল মহাযাজক আমাদের সঙ্গে আছেন। তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সাধারণ কাজকর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করি এবং এই ভাবে আমাদের সাধারণ কাজকর্ম অসীম মূল্যবান হয়ে ওঠে।

বলা হয় যে "ইসলাম" শব্দের অর্থ আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ রূপে এবং নিঃশর্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করা। যদি জানতে চাওয়া হয় কতজন এইভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, তবে দেখা যাবে যে খাঁটি মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। ভক্তজনগণের যাজকত্বেও আছে পূর্ণ সমর্পণ এবং ইচ্ছার উৎসর্গ যা খুবই সহজসাধ্য কারণ তা প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের ডাকে আমাদের হৃদয়ের প্রেমপূর্ণ সাড়া। সেই যজ্ঞ, অন্তত পরোক্ষ ভাবেও যদি খ্রিষ্টভক্তগণ উৎসর্গ না করে, তাহলে আমাদেরও স্বীকার করতে হবে যে খাঁটি খ্রিস্টানদের সংখ্যা খুবই কম।

খ্রিস্টীয় জীবন

(১) একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

সারা বিশ্বে খ্রিস্টীয় শিক্ষার নবীকরণ হয়েছে। এই বিষয়ে ফাদার হফিংগার এস.জে এর পরিচালনায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে আমাদের অনেক মিশনারী যোগ দিয়েছিলেন। তার লেখা বই খ্রিস্টীয় তত্ত্ব শেখাবার পদ্ধতি (The Art of Teaching Christian Doctrine)। ইতিমধ্যেই ধর্মপ্রদেশের প্রচারকার্য এবং ধর্মশিক্ষার গাইডবুক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে সেইভাবেই সাজানো হয়েছে।

(২) জ্ঞানের অনুশীলন

বার্তাটি দেবার প্রধান উদ্দেশ্য হল আমাদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করা যে, জীবনযাপন করতে হয় কারণ এ জীবন এমন কোনও জ্ঞান নয় যা অনুশীলন না করে আহরণ করা যায়। জীবন হলো একটি আলো। বার্তাটির মূল বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই কথাও বলে দেয় যে, তা আকর্ষণীয়, ঠিক যেমনটি আকর্ষণীয় পবিত্র বাইবেলের মঙ্গলবার্তা। তা ধর্মীয় তত্ত্বকে দুটি প্রধান ভাগে ব্যক্ত করেছে: আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালবাসা এবং সেই ভালবাসার প্রতি আমাদের সন্তানোচিত সাড়া দেওয়া। নরকের ভয় দেখানো এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা অবশ্য পালন ও মারাত্মক পাপ করা থেকে বিরত থাকার বিধান দেওয়া এক সময় ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষার সারমর্ম ছিল। এই সবের পরিবর্তে এখন ছেলেমেয়েদের ভালবাসার দ্বারা চালিত করা হচ্ছে, তাদের বোঝানো হচ্ছে ঈশ্বর তাদের কত ভালবাসেন, আর তাই তাদেরও 'উচিত' প্রেমময় ঈশ্বরকে ভালবাসা ও সম্ভ্রম করা।

ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক মিশনারী সেই আনন্দবার্তা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের শিখা করে তুলেছেন। কৃচ্ছ্রসাধনের দীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে তারা বরং সেই বার্তাটিকে দেখছেন পরিত্রাণের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ঘটনা' হিসাবে, খ্রিস্টের নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাবের বাস্তবরূপ হিসেবে এবং ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের যে করুণা দেখিয়েছেন তার প্রতিশ্রুতির করুণা হিসাবে। ফাদার সিস্টারদের নির্জন ধ্যান-সাধনায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

(৩) বার্তাটি জানাতে হবে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন এবং পবিত্র জীবনযাপনের প্রচেষ্টা যেন মঙ্গলবার্তার নীতির উপর ভিত্তি করে হয়, ধর্মশিক্ষার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এ-ই হওয়া উচিত। যে কেউ সেই 'বাক্য' লাভ করেছে এবং ঈশ্বর যে প্রেমস্বরূপ সেই অপূর্ব বার্তা বিশ্বাসের গুণে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে এবং এ-ও উপলব্ধি করেছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাকে আহ্বান করেছেন, সেই ব্যক্তি এই আহ্বান সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠবে এবং অনুভব করবে যে, তার প্রথম কর্তব্য হল সেই আহ্বানে উদার ভাবে সাড়া দেয়া এবং এরপরে তা শুধু প্রচারই করবে না, তা কবিতার ছন্দে বেঁধে গাইবে, যাতে পথে ঘাটে মানুষের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। কিছু দিন আগে ঠিক এই কাজটি গিটার বাজিয়ে প্রচার করেছেন আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের কয়েক জন অনুগামী, যেমন ফাদার ডুভাল, মারি ক্লেয়ার পিশো, জ্যাকলিন লিমে, সিস্টার সুরিয়ের এবং আরো অনেকে।

(৪) বার্তাটির মূল কথা

সাধু যোহনের লেখা মঙ্গলসমাচার এবং পত্রাবলীর শিক্ষার সার একটি মাত্র বাক্যে সংকলন করা যায়: প্রথমে ঈশ্বর আমাদের ভালবেসেছেন, কাজেই আমরাও এসো তাঁকে ভালবাসি। আমাদের ধর্মতত্ত্ব বিমূর্ত কিছু নয়: তা এক ব্যক্তি। ভালবেসে দেওয়া ঈশ্বরের সব উপহার নিহিত আছে যে ব্যক্তির মধ্যে তিনি হলেন খ্রিস্ট। প্রতিদানে আমরা ঈশ্বরকে কী দিতে পারি? অবশ্যই আর কিছু নয়, এক খ্রিস্টকে দেওয়া-ই হবে সঠিক দেওয়া, জীবন্ত খ্রিস্টের পুণ্য দেহ, যা ঐশ নমুনার একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি খ্রিস্টের মনুষ্য-স্বভাবের আর এক দিক এবং "তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গে, তাঁর মধ্যে সকল প্রেম, গৌরব ও মহিমা পবিত্র আত্মার সংযোগে যেন স্বর্গীয় পিতার কাছে উৎসর্গীকৃত হয়"। এই পৃথিবীতে যুগে যুগে এবং খ্রিস্টের যাতনাভোগের ফলে যে প্রভূত মুক্তি এসেছে পৃথিবীতে আরও বেশী মানুষ যেন সেই মুক্তি লাভ করতে পারে। কত মানুষ নিজেদের অজান্তে ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মধ্যে খ্রিস্টকে খুঁজছে এবং উপলব্ধি করতে পারছে না যে, ঐশরাজ্য এখন হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে এবং বাক্য দেহধারণ ক'রে এখনও তাদের মধ্যে ও তাদের সঙ্গে বাস করছে, যদি না তারা তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে দরজায় ধাক্কা দেবার জন্য।

(৫) বার্তাটির উৎস

আমরা জানি যে, মণ্ডলী আমাদের শিক্ষা দেয়, কিন্তু বর্তমান যুগে মণ্ডলী শুধু ঈশ্বরের বাণী শুনতে উৎসাহিত করে না, বরং পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের লিখিত বাণী প্রতিদিন পাঠ করতে মণ্ডলী আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ এবং পবিত্র বাইবেল হলো মানুষের কাছে তাঁর প্রেমপত্র। মঙ্গলসমাচারের একজন ধর্মপ্রাণ পাঠক প্রতিটি পৃষ্ঠায় খ্রিস্টের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুঁজে পাবে, যদি সে এই বিষয়ে সচেতন থাকে যে, যীশু তাঁর বিষয়ে তারই সঙ্গে কথা বলছেন, যখন তিনি তাঁর সময় মানুষের জন্য কিছু করছিলেন বা তাদের কিছু বলছিলেন। তিনি আমাদের এবং তাদেরও এই কথা বলছেন: "খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; তোমরা যদি জানতে, কী মহান

ঈশ্বরের আশীর্বাদ; শিমোন তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে....." । বাইবেলের প্রথম পঙ্‌ক্তি প্রকাশ করে তাঁর প্রথম ভালবাসার উপহার: "আদিতে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন ....." এবং শেষ পঙ্‌ক্তিতে ভক্তের বা মণ্ডলীর উত্তর : "এসো, প্রভু যীশু, এসো। আমেন"!

(৬) বার্তাটির আসল অনন্যতা

বর্তমানে বার্তাটি এক এক জনের কাছে আলাদা আলাদা অর্থ বহন করতে পারে, জনসমক্ষে বার্তা-বাহকেরা যেভাবে মঙ্গলসমাচার প্রচার করেছেন সেই অনুসারে, অথবা নীরবে প্রার্থনা করার সময় অন্তরে যেভাবে সাড়া পেয়েছে সেইভাবে। তবে তার সারমর্ম সেই একই, মহাদূত গাব্রিয়েল ধন্যা কুমারী মারীয়ার কাছে যা ঘোষণা করেছিলেন: "ঈশ্বর তোমায় ভালবাসেন, তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ; খ্রিস্টজননী ও বিশ্বজননী করার জন্য ঈশ্বর তোমাকে চান"। মারীয়া অথবা আমাদের উত্তর সেই একই মিনতিপূর্ণ কথায় প্রকাশ করা যায়: "আমি প্রস্তুত, আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু ভালবাসতে এবং আপনাকে ভালবাসার পাত্র করে তুলতে আপনাকে আমার প্রয়োজন"। এই সম্মতির মধ্যে নিহিত আছে নম্রতা এবং প্রেমের উদার সহযোগিতা ।

(৭) ঈশ্বরের ভালবাসায় বিশ্বাস

আমাদের প্রত্যেকের কাছে যে 'ঐশ বার্তা' এসেছে, তাঁর প্রতি আমাদের উপযুক্ত সাড়া দেবার প্রথম ধাপ হল বিশ্বাস। সাধ্বী এলিজাবেথ তাঁর প্রভুর মাতাকে এই কথা বললেন "ধন্য সে, যে বিশ্বাস করেছে"। দীনতা হলো পবিত্রতার একটি নিবৃত্তিমূলক বা নেতিবাচক ভিত্তি, কিন্তু কারও প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার বিশ্বাস হল গঠনমূলক সক্রিয় ভিত্তি। ঈশ্বর চান, তাঁর অসীম মহত্ত্ব স্বীকৃত হোক। কিন্তু এই পৃথিবীর দীনতমের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি তাঁর ভালবাসার বিপুলতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাই তো সাধু ভিয়ান্নি বলেছেন, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন তাঁর কাজের জন্য, কারণ আমার চেয়ে নিকৃষ্টতম কাউকে খুঁজে পাননি"। নিঃস্ব হৃদয়ে তাঁর করুণা নিরাপদ। তা চুরি যাবেনা, তছরুপ হবে না। তা দীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করবে এবং যোগ্য সাড়া দেবার জন্য তাঁর আশ্বাস পাবে।

মঙ্গলসমাচারে উল্লেখিত সেই নারী, যে যিশুর কাপড়ের একটু অংশ স্পর্শ করে সুস্থ হয়ে উঠেছিল, সে যিশুর ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতি, তথা যিশুর ঈশ্বরত্বের প্রতি, বিশ্বাসের গুণে যিশুর হৃদয় জয় করেছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, যিশুর ঈশ্বরত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত, তবে তার হৃদয়কে যা নাড়া দিয়েছে, তা হল তাঁর ভালবাসার প্রতি বিশ্বাস। যিশু চান এমন বিশ্বাস দিয়েই তাঁকে জয় করা হোক: "নারী অগাধ তোমার বিশ্বাস"। কানানীয় সেই মহিলাকে তিনি এই কথা বলেছিলেন, যে যিশুকে বোঝাতে চাইছিল খাবারের থালা থেকে পড়ে যাওয়া সামান্য এক টুকরো এঁটো ছাড়া যিশুর কাছে সে বেশী কিছু চাইছে না; এই বিশ্বাসের গুণে তার মেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। যিশু আজও তাঁর করুণা দেখাতে চান। তাদের, যারা নিজেদের যোগ্য মনে করেও সরল মনে এই বিশ্বাস করে যে, যিশু এতই মহৎ যে, তিনি তাদের ভালমন্দ বিচার না করেই ভালবাসেন। "আর্বজনার স্তূপ থেকে দরিদ্রকে করেন উদ্ধার" (সাম ১১৩)! "হে যিশুর হৃদয়, আমার প্রতি তোমার ভালবাসায় বিশ্বাস করি।"

(৮) ঐশপ্রেমের ধর্মতত্ত্ব

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, যে প্রকৃত পার্থিব ভালবাসা জেনেছে, সে পবিত্র বাইবেল থেকে ঐশপ্রেমের ধর্মতত্ত্বের ধারণা সেখানে পেতে পারে যেখানে খ্রিস্ট হল এই দুই ভালবাসার সংযোগ স্থল। যিশুর পুণ্য হৃদয় নিয়ে ঐশতত্ত্ব আছে; এ বিষয় সাধু আগস্তিন এবং বসুয়ে (Bossuet) শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তারা বলেছেন যে, ঈশ্বরই হলেন শাশ্বত হৃদয়: "ঈশ্বর মহানুভব, ঈশ্বর প্রেমময়" এবং সেই মহানুভবতার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই খ্রিস্টীয় নিগূঢ়তত্ত্বের ধারাবাহিকতার উত্তর – "কীভাবে" না পেলেও "কেন" প্রশ্নের উত্তর।

ঈশ্বর ভালবাসেন: ভালবাসা হল দেওয়া। ঈশ্বর আমাদের সবকিছু দিয়েছেন এবং তিনি নিজেকে দিয়েছেন – এই হল সৃষ্টি এবং ঊর্ধে-উত্তোলন ।

ঈশ্বর ভালবাসেন: ভালবাসার অর্থ হল, যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে কথা বলা – এই হল ঐশপ্রকাশ সুখবর বা মঙ্গলবার্তা।

ঈশ্বর ভালবাসেন: ভালবাসার অর্থ হল, যাকে ভালবাসি তার মত হওয়া – এই হল দেহধারণ।

ঈশ্বর ভালবাসেন: ভালবাসার অর্থ হল, যে কোন মূল্যে, এমন কি নিজের রক্তের বিনিময়ে যাকে ভালবাসি তাকে রক্ষা করা – এই হল পরিত্রাণ।

ঈশ্বর ভালবাসেন: ভালবাসার অর্থ হল, কখনও বিচ্ছেদ না হওয়া, বরং যাকে ভালবাসি সব সময় তার সঙ্গে থাকা – এই হল পবিত্র খ্রিস্টযজ্ঞ।

ঈশ্বর ভালবাসেন: ভালবাসার অর্থ হল, নিজেকে সর্মপণ করা, যাকে ভালবাসি যতদূর সম্ভব তার নিবিড় সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতা লাভ করা – এই হল পবিত্র কমূনিয়ন।

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ: ভালবাসা হল নিজেকে এবং ভালবাসার পাত্রকে চিরদিন সুখী করা – এই হল স্বর্গ।

এটা হল ভালবাসার একটি সুগভীর সারসংক্ষেপ, যা আমাদের বিশ্বাসেরও সার সংক্ষেপ। সাধু যোহনের কথায়, 'আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসায় আমরা বিশ্বাস করেছি'। সাধু ফ্রান্সিস দ্য সালের এই উক্তির মধ্যে সবকিছু নিহিত আছে: খ্রিস্টমণ্ডলীতে সব কিছু ভালবাসার আবরণে ঢাকা, সবকিছুর ভিত্তি ভালবাসা এবং সবকিছু শুধুই ভালবাসা।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরে সাতটি পথ ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন; উক্ত সাতটি পথ ধরে আমরাও তাঁর ভালবাসার সাড়াদান দিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারি:

দেওয়া: আমাদের হৃদয় ছাড়া আর কিছু না।

কথা বলা: ঈশ্বরের বাণীর উত্তর হল আমাদের প্রার্থনা।

একই রকম হওয়া: খ্রিস্টানুকরণ – ঐশ সাদৃশ্যের জীবন্ত উদাহরণ হয়ে ওঠা।

পরিত্রাণ করা: প্রতিবেশীদের মধ্যে যিশুকে সাহায্য করা, পরিত্রাণকার্যে সহযোগিতা করা।

সান্নিধ্যে থাকা: পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এবং নিজের অন্তরে থাকার প্রচেষ্টা।

নিবিড় সংযোগ স্থাপন: সংস্কারীয় বা আধ্যাত্মিক সংযোগের মিশ্রণ।

আনন্দ দান: অর্থাৎ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা ভাল সর্বদা তা-ই করা। সাধু আগস্তিন লিখেছেন, দু'রকম ভালবাসা দুটি নগরী তৈরী করেছে: ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ক'রে নিজের প্রতি ভালবাসা তৈরী করেছে মন্দতার নগরী; নিজেকে অবজ্ঞা করে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা তৈরী করেছে ঈশ্বরের নগরী ।

এমনই নিখুঁত আমাদের ধন্যা মাতার সাড়াদান: 'আমার জন্য সর্বশক্তিমান মহান কাজ করেছেন। আমি প্রভুর দাসী, আপনি যা বলছেন, আমার তা-ই হোক!'

ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্বাস সক্রিয়

(১) ত্রাণকারী বিশ্বাস

প্রভু তাঁর প্রেরিতদের বললেন, "সকল জাতির মানুষকে মঙ্গলবার্তা শোনাও, যারা বিশ্বাস করবে এবং দীক্ষাস্নাত হবে, ত্রাণ পাবে তারা"। খ্রিস্টের বাণী এবং পবিত্র শাস্ত্রে পরমেশ্বরের সকল বাণী একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায় -- প্রথমে ঈশ্বর তোমাদের ভালবেসেছেন এবং এর পরিবর্তে তিনি চান তোমরাও তাঁকে ভালবাস।

তবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই যে ঐশ্বরিক বার্তা দেওয়া হয়েছে সেই বার্তার প্রতি উপযুক্ত সাড়া দেবার প্রথম পদক্ষেপ হলো বিশ্বাস। সাধ্বী এলিজাবেথ তাঁর প্রভুর মাতাকে বললেন "বিশ্বাস করেছো তুমি, ধন্য তুমি, ধন্য," । নম্রতা হলো পবিত্রতার ভিত্তির নেতিবাচক দিক, কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসার উপর বিশ্বাস স্থাপন হলো সক্রিয় এবং ইতিবাচক দিক। ঈশ্বর চান, তিনি যেমন অসীম করুণাময়, আমরা যেন তাঁকে সেই ভাবেই গ্রহণ করি; কিন্তু তিনি তাঁর ভালবাসার মাহাত্ম্য দেখান পৃথিবীতে যে নিকৃষ্টতম তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে। সাধু জন ভিয়ানী বলেছেন, "তাঁর কাজের জন্য তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন, কারণ আমার চেয়ে নিকৃষ্টতম আর কাউকে খুঁজে পাননি"। দীন যে হৃদয়, তাঁর করুণা সেখানে নিরাপদ। সেখান থেকে তা চুরিও হবে না বা তার অপব্যবহারও হবে না। ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে নম্রতা যুক্ত হলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং সেই ভালবাসার প্রতি সুযোগ্য সাড়া দিতে সে ঈশ্বরের আশ্বাস লাভ করবে।

পবিত্র মঙ্গলসমাচারে উল্লেখিত সেই মহিলা, যে যিশুর পোশাকের প্রান্ত স্পর্শ ক'রে আরোগ্যলাভ করেছিল, সে যিশুর হৃদয় জয় করেছিল যিশুর ক্ষমতার উপর তথা যিশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস রেখে। তাঁর ঈশ্বরত্ব যখন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এবার তাঁর ভালবাসার প্রতি বিশ্বাস তাঁর হৃদয় গলিয়ে দিল: "নারী, অগাধ তোমার বিশ্বাস"। কানানীয় অঞ্চলের যে মহিলা তাঁকে এই যুক্তি দিয়েছিল যে, টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া উচ্ছিষ্ট খাবারের চেয়ে বেশী কিছু তাঁর কাছে চাইছে না, তাকেও যিশু এই কথাই বলেছিলেন; এই বিশ্বাসের গুণেই তার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। তিনি এখনও চান তাদেরকে তাঁর করুণা দান করতে, যারা নিজেদের অযোগ্য জেনেও সরল বিশ্বাসে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই আস্থা রাখে যে, যিশু সব দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের দোষ-গুণ নিয়েই ভালবাসেন: "আবর্জনার স্তূপ থেকে দরিদ্রকে করেন উদ্ধার" (সাম: ১১৩)। "হে যিশুর হৃদয়, আমার প্রতি তোমার ভালবাসায় আমি বিশ্বাস রাখি"।

(২) ঐশ অনুগ্রহ এবং মনুষ্য প্রচেষ্টা

ঐশ অনুগ্রহ এবং মানুষের স্বাধীন সাড়াদানের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে বুঝবো? আমরা যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অবহেলা করি এবং অনুগ্রহের প্রতি আমাদের যে সাড়া দেয়া উচিত তার গুরুত্ব বুঝতে যদি ভুল করি বা সেই অনুগ্রহের প্রতি আমাদের যা করণীয় তা করতে অবহেলা করি, তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যে এই অবহেলার পরিণাম কী হবে। কাজেই সেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা আরও বেশী দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হবে, যখন আমরা উপলব্ধি করব আমাদের উপেক্ষার কারণে, আমরা কোনদিকে পরিচালিত হচ্ছি। কিন্তু যেহেতু আমরা ভাল করেই জানি যে অনুগ্রহের ভূমিকা সবকিছুর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেই অনুগ্রহকে যদি আমাদের জীবনে যথোচিত আসনে না বসাই তাহলে তার বিপদও হবে আরও বেশী ভয়ঙ্কর।

এই দুটো বিষয়ের মধ্যে কী ভাবে সামঞ্জস্য আনা যায়: ঐশ অনুগ্রহই হচ্ছে সর্বপ্রথম; এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা, যাতে আমরা তার চাহিদা অনুযায়ী স্বাধীন সম্মতি দিতে পারি, সবকিছুই যে ঐশকরুণা থেকেই আসে, আমাদের ঐশজীবন, ঐশজীবনে অংশগ্রহণ, এ সবই তাঁর উদার দান; তৎসত্ত্বেও এ কথা ভুললে চলবে না যে, অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে কাজ করে না আমাদের সহযোগিতা ছাড়া, -- এই মূল সত্যগুলি কিভাবে আমরা আগলে রাখব?

এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেয়া কঠিন, যদি আমরা শুধু ন্যায়পরায়নতার দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি, যদি আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আমাদের যোগ্যতা এবং পুরষ্কারের মধ্যে সীমিত করে রাখি। এগুলি এতই ঐতিহ্যগত এবং বাইবেল ভিত্তিক যে তা অগ্রাহ্য করা যায় না, কিন্তু ঐশপ্রত্যাদেশের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তাকে সঠিক স্থানে রাখাও তো বারণ করা হয়নি, যেমন: ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ এবং তাঁর এই ভালবাসার দান সম্পূর্ণই অযাচিত উপহার।

ঠিক এই ভাবেই ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা আমাদের সময়কার আধ্যাত্মিকতা ন্যায়পরায়নতার পর্যায় থেকে ভালবাসার পর্যায়ে রূপান্তরিত ক'রে এই পথে চালিত করেছেন। বাইবেল ভিত্তিক নবায়নে, পিতৃগণের লেখায় ফিরে যাওয়া এবং উপাসনা বিষয়ক আন্দোলনে তার ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা স্বীকৃতি পাওয়া, মনুষ্য প্রচেষ্টার উপর সর্বাধিক মূল্য দেওয়া যা সিদ্ধতা অর্জনের জন্য মানবিক প্রচেষ্টার দিকেই ধাবিত, সেই ধারণা থেকে মুক্ত হতে আমাদের সক্ষম করেছে।

নিস্তার-রহস্য কেন্দ্রিক মণ্ডলীর উপাসনা-অনুষ্ঠানে আমাদের প্রার্থনা, যা খ্রিস্টের জ্যোতিতে অবগাহিত এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে খ্রিস্টের দিকে স্থির রেখে, নতুন ভাবে জীবনযাপন করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। দেহধারী বাণীর মানবপ্রকৃতি আমাদের পাপময়

পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণা গ্রহণ করেছে, এবং তিনিই আমাদের পরিত্রাণ ও সিদ্ধতার একমাত্র আশা। আমাদের পরিত্রাণ ব্যক্তিগত ভাবে এবং প্রধানত আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে লাভ করার বৈধতা আমরা স্বীকার করছি না।

কার্মেল সংঘের ২০ বছরের একজন সন্ন্যাসব্রতী নতুন এক সিদ্ধতায় প্রবেশের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তখনকার দিনের শিক্ষায় তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন, বিশেষতঃ মানুষের অন্তিম বিষয়ে (শেষ পরিণতির বিষয়ে) এমন শিক্ষা, যাতে পাপী মনপরিবর্তন করে, এমন কি ঈশ্বরকে ভয় ক'রে পবিত্র জীবনযাপন করতে উৎসাহী হয়, যে ভগবৎভীতি "প্রজ্ঞার প্রথম ধাপ"। তার সময়কালে যে ধর্মতত্ত্ব সবাই মেনে নিয়েছিলো তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। বিনম্রভাবে সেই বাঁধা অতিক্রম করতে তিনি একটি উপায় পেয়েছেন এবং তিনি সেই ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন এজন্য যে, তা তৈরী হয়েছে সেসব মহান আত্মাদের জন্য যাদের সাহসিকতা তিনি সম্ভ্রম করেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে সাড়া দিতে একদিকে তিনি দুর্বল চিত্ত হয়ে পড়েছেন এবং অন্যদিকে নিজেকে পবিত্র করে তোলার "একান্ত ইচ্ছাও" ত্যাগ করতে পারছেন না, তাই তিনি এমন একটি অহংকার বর্জিত পথের সন্ধান করলেন যেটি তার সাধ্যের মধ্যে। তিনি শুধু একাই আন্তরিক ভাবে এমন একটি পথের সন্ধান করছিলেন না। অনেক বছর আগে ওজেনাম-এর শিষ্য মরিস মেইগনেন লিখেছেন, "আমার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে। পুরোহিত, যিনি 'অনুশীলনের' শিক্ষা দেন, তিনি পবিত্র জীবনযাপনের যত উপায় তুলে ধরেছেন, সেগুলির জন্য প্রয়োজন একজন দৃঢ়চেতা মনের মানুষের। আজকের দিনে তেমন দৃঢ়চেতা মনের মানুষ কোথায়? দৃঢ়চেতা মনের মানুষের জন্য যে অনুশীলন তৈরী করা হয়েছে, তাতে আমার কোন লাভ হবে না । হে আমার ঈশ্বর, দুর্বল চিত্ত মানুষের জন্য যে পথ, আমাকে সেই পথ দেখাও! আমি এদেরই একজন। আমি তোমার করুণা ভিক্ষা করি এবং আমি নিশ্চিত জানি যে, দৃঢ়চিত্ত এবং মহান আত্মাদের কাছে তুমি যা প্রকাশ করনি, তুমি তা দুর্বল চিত্ত এবং নগণ্যদের কাছে প্রকাশ করতে পার"। (Dom Lefebvre: La foi dans les oeuvres)

(৩) ঐশ অনুগ্রহ এবং সহযোগিতা

ঈশ্বরের কাছে যাবার যে পথ ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা পুণ্য শাস্ত্রে খুঁজে পেয়েছেন, সেই পথকে বিশেষভাবে তিনি বলেছেন ক্ষুদ্র পথ, যা আধ্যাত্মিকতার শৈশবের পথ, প্রেমের পথ; "সেই পথে আমরা ঈশ্বরের উপর তত বেশী আস্থাশীল, যত বেশী আমরা দুর্বল ও বিনয়ী" (Fr. Desrochers)। মঙ্গলসমাচারে তিনি পড়েছেন যে, আমরা যতক্ষণ না নিজেদের পরিবর্তন করি এবং শিশুদের মত হই, ততক্ষণ আমরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না। তিনি একথা জেনেছেন যে, যারা বিনয়ী, ঈশ্বর তাদের অনুগ্রহ দান করেন। কাজেই তিনি ঈশ্বরের পিতৃসুলভ ভালবাসায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং একটি শিশুর মতোই তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে চেষ্টা করেন -- সর্বদা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহপূর্ণ সাহায্যের প্রতি আস্থাশীল এক শিশু। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঐশ অনুগ্রহের সঙ্গে সহযোগিতা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তার নিজের হৃদয় করুণাময় পিতার কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া, যাতে তার মত দুর্বলচিত্ত মানুষের যতটা ঈশ্বরের সহায়তা এবং অনুগ্রহের প্রয়োজন, ততটা পেতে পারেন। তিনি পবিত্র আত্মার কাছে এই জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, পবিত্র আত্মা তাকে স্বর্গে যাবার এমন এক সহজ পথ দেখিয়েছেন যা শুধু তার নিজের জন্যই উপযুক্ত নয়, বরং সঙ্গতিপূর্ণ সেই সকল পাপীদের জন্যও যথাযথ, যারা সংখ্যায় অনেক এবং ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। তারা জানেই না প্রেমময় ঈশ্বর কত দয়ালু। এই অজ্ঞতা নিয়ে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছে। আধ্যাত্মিকতার এই শৈশব নিয়ে তাঁর সময় থেকে অনেক পড়াশুনা হয়েছে এবং ধর্মতত্ত্ববিদরা এই চারটি গুণের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছেন -- নম্রতা, বিশ্বাস (সন্তানোচিত আস্থা) ভালবাসা এবং আত্মসমর্পণ। কিন্তু তা চিরাচরিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যেখানে মানুষের প্রচেষ্টাকে ঐশকরুণার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, ঈশ্বর তাদের সাহায্য করে, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে, ঠিক যেমনটি এই পৃথিবীতে গণকল্যাণমুখী রাষ্ট্র করে থাকে।

কিন্তু ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর পথের দিশা পেয়েছিলেন ঐশ আলোকের মধ্য দিয়ে। একবার মঠে রিক্রিয়েশনের সময় অন্য সিস্টারগণ পুণ্যতা লাভে ফলপ্রদ উপায় সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। ভালবাসার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বললেন, "আমার মতে, সিদ্ধতা কোনো বিশেষ অনুশীলনের মধ্যে নিহিত নয়, বরং তা নিহিত আছে অন্তরে, যা পিতার নিকট বিনয়ী এবং অনুগত এক অন্তর; সেই অন্তর নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু খুব বলিষ্ঠতার সাথে পিতৃসুলভ মহানুভবতার উপর আস্থাশীল।

এই হল ঐশ বদান্যতা বা ইচ্ছাশক্তির সিদ্ধতার সঠিক সংজ্ঞা। এই ইচ্ছাশক্তির সিদ্ধতাই হল সেই ক্ষুদ্র জীবনপথ এবং আচরণের পথে উৎকর্ষ লাভে বৃদ্ধির উপায়। ক্ষুদ্র জীবনপথের চারটি গুণ ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে অনুশীলন করা হয়, অপব্যয়ী পুত্র যেভাবে তার পিতার কাছে ফিরে এসেছিল তা অনুকরণ করে এবং এই ছিল ক্ষুদ্র পুষ্প তেরেজার গোপনরহস্য: জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সেই প্রত্যাবর্তনের নবীকরণ করা। শৈশবে তিনি তার বাবার সঙ্গে যা করেছেন এবং যত স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন, তিনি তা অনুভব করেছেন তার আধ্যাত্মিক জীবনে স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে। ক্রুশভক্ত সাধু যোহনের কাছে তিনি শিখেছেন, "আমাদের ভেতরের দোষগুণ উভয় থেকেই ভালবাসা উপকৃত হয়"। পিতার কাছে প্রত্যাবর্তনের নবীকরণ করতে তিনি তার তুচ্ছ ভুলত্রুটি, অবহেলা এবং দুর্বলতা গুলি কাজে লাগাতেন এবং তা করতেন ঘন ঘন আধ্যাত্মিক পাপস্বীকার ক'রে এবং পিতার কাছ থেকে ক্ষমার অনুগ্রহ লাভ ক'রে। "আমি তাঁর কাছে আমার সামান্যতম ব্যর্থতা এবং অবিশ্বস্ততা বিশদভাবে বর্ণনা করি এই আশায় যে, এই ভাবে আমি তাঁর হৃদয় আরও বেশী করে জয় করে নিতে পারি"। তিনি চাইতেন পাপীরাও তার এই আচরণ অনুসরণ করুক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে অনেক সুযোগ রয়েছে "আমার জন্য" অহমিকামূলক মনোভাব পরিবর্তন করে "ঈশ্বরের জন্য" এই মনোভাব সৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ করা। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা তার ভক্তি নিবেদন নবীকরণার্থে সব ঘটনাসমূহের সদ্ব্যবহার করেছেন। পরমেশ্বর, যিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে যজ্ঞবলী চান না, বরং তিনি আমাদের অন্তরের ভালবাসার জন্য অনন্তকাল তৃষ্ণার্ত।

আমাদের জীবনের সেই সব ঘটনাসমূহ, যা আমাদের স্বার্থপরতার জন্য আমাদের দুঃখ দেয়, কিন্তু যা সবসময়ই তাঁর কাছে মঙ্গলকর, সেইসব মুহূর্তে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করেন ঠিক যেমন যিশু খ্রিস্ট করেছিলেন যাকোবের কুয়োর কাছে: "বৎস আমার, আমি তৃষ্ণার্ত, আমায় কি তুমি জল দেবেনা? তুমি কি এখন আমায় তোমার হৃদয় দেবে"? এর একটিই উত্তর : হ্যাঁ দেব, আমেন, ধন্যবাদ! কাজে এবং শারীরিক পরিশ্রমে নয়, বরং অন্তরের অভিপ্রায়ের দিক থেকে পবিত্রতার এক উদাহরণ হলেন সাধ্বী তেরেজা। করুণাময় ভালবাসার কাছে তার আত্মোৎস্বর্গের উদ্দেশ্য "ত্রুটিহীন ভালবাসায় জীবনযাপন করা" এবং এই প্রসঙ্গের সমাপ্তিতে তিনি বলেছেন "এই প্রক্রিয়া আমি হাজারবার নবীকরণ করতে চাই"। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, অন্তরের শুদ্ধতা ব্যক্তিগত ভাবে অধিকৃত কোনো কিছু না এবং তা শুদ্ধ আচরণ থেকে কম উদ্দীপক নয়।

(৪) বিশ্বাসের কাজঃ দ্বিমাত্রিক ভালবাসা, সকল কর্মের প্রাণ

যদিও সাধু পল নবদীক্ষিত খ্রিস্টভক্তদের জোর দিয়ে বলেছেন যে, তারা যেন পরিত্রাণ লাভের জন্য বিধানের কার্যকারিতার উপর নির্ভর না করে, বরং নির্ভর করে খ্রিস্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসের উপর। সাধু যাকোব তাঁর ধর্মপত্রে প্রত্যেককে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, দ্বিমাত্রিক বিধান পালনের মধ্য দিয়ে, আমাদের প্রতিদিনের কাজে যেন আমাদের বিশ্বাস প্রকাশ পায়, ঈশ্বর এবং আমাদের প্রতিবেশীদের নিয়েই আমাদের সব কার্যক্রম। এই হল ভালবাসার মাধ্যমে সক্রিয় সেই জীবন্ত বিশ্বাস এবং তা প্রদর্শন করা হয় এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান খ্রিস্টের প্রতি আমাদের আচার-আচরণে। কিন্তু তা হল আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এক উপহার, যার দ্বারা আমরা আমাদের সীমিত চিন্তাধারা দিয়ে ঈশ্বরকে তাঁর স্বীয় রূপে জানতে পারি। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা এবং অদ্বিতীয় প্রভু হিসেবে জানার জন্য সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁকে অসীম প্রেমস্বরূপ জানা, ত্রিব্যক্তি এক ঈশ্বর, যারা আসলে একে অপরের প্রতি দান স্বরূপ এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে অনুগ্রহের মাধ্যমে বিশেষ এক দান, এই সকল জানতে বিশ্বাসের ঐশজ্ঞানের আলো দ্বারা আমাদের অন্তর আলোকিত করতে হবে। এইভাবে আমরা ঈশ্বরকে তাঁর প্রকৃত রূপে ভালবাসতে পারব এবং ভালবাসব আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক, তা প্রকাশ পায় আমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। যেহেতু ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা কখনই ক্ষান্ত হবার নয়, তাই আমাদের প্রভু আমাদের অবিরাম প্রার্থনা করতে বলেছেন। আমরা যদি আমাদের জীবনে বিশ্বাসের অনুশীলন করি, তবে আমরা লাভ করব বিশ্বাসের চেতনা যা প্রার্থনারত জীবনেরই সমান, ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা, খ্রিস্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ, তাঁর নিগূঢ় দেহের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর সহকর্মী, পৃথিবীতে তাঁর বর্তমান জীবনের ধারাবাহিকতা।

তাহলে মৌখিক এবং নীরব প্রার্থনার বিশেষ মুহূর্তগুলি মনে হবে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কের কেবলমাত্র সুস্পষ্ট এবং গভীর এক মুহূর্তের প্রকাশ। প্রার্থনার দুটি উৎস সততই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান: আমাদের হৃদয়, যা সর্বদা নিরীক্ষণ ও অর্পণ করে; আমাদের চাহিদা বা দুঃখ কষ্ট, যা সর্বদা সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করে। কাজেই বিশ্বাস নিজেকে নীরবে প্রকাশ করতে পারে। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা তার অসুস্থতার সময় বলেছেন: "আমি এত কষ্ট পাচ্ছি যে, ঘুমোতে পারছি না ... আমি তখন প্রার্থনা করি; যিশুকে কী বলব? আমি কিছুই বলছি না, আমি তাঁকে ভালবাসি"। নীরব প্রার্থনার সময় আমরাও এই কথা যোগ করতে পারি: আমি কিছুই বলছি না, তাঁর সহায়তা আমার প্রয়োজন। তাঁর জন্য তৃষ্ণার্ত আমার প্রাণ।

অতএব পরমেশ্বরের কাছে আমাদের বিশ্বাসের জীবন যদি প্রকাশ পায় আমাদের প্রার্থনার দ্বারা, তাহলে মানুষের কাছে তা দৃশ্যমান হবে আমাদের কর্মের মধ্যে। ঈশ্বর এ-ও আশা করেন যে, আমাদের বিশ্বাস আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হোক; খ্রিস্ট কথা এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা সর্বদা তা-ই করব, যা আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার কাছে প্রীতিকর। তা সাধারণতঃ বাস্তবায়িত হবে আত্মত্যাগের বিনিময়ে। আমাদের প্রভু বলেছেন, "যদি কেউ আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, তার নিজের ক্রুশ কাঁধে তুলে নিক এবং আমায় অনুসরণ করুক"। একমাত্র বিশ্বাসই পারে আমাদের এই উপলব্ধি দিতে যে, দুঃখ-কষ্ট আর শাস্তি নয় বরং তা পরিত্রাণ ও শুদ্ধিকরণের একটি উপায়। এর ফলে আমরা হয়ে উঠি ঈশ্বরের জন্য এক উপহার, এবং "যন্ত্রণাভোগে ও ক্রুশের বলিদানে এখনও যা বাকী আছে তা পূরণ করি"।

সাধু যাকোব জীবন্ত বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করেছেন দৃশ্যমান প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালবাসার নিরিখে এবং শেষ বিচারের কথা বলতে গিয়ে আমাদের প্রভু বলেছেন, আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি আমরা যা কিছু করেছি, তা তাঁর প্রতিই করা হয়েছে বলে তিনি ধরে নেবেন। কাজেই আমাদের চারপাশে যাদের দেখছি তাদের প্রতি ভালবাসাই হ'ল আমাদের বিশ্বাসের সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান প্রকাশ ও প্রমাণ।

দ্বিতীয় আজ্ঞাটি কিভাবে প্রথম আজ্ঞাটির সমান, তা উপলব্ধি করার অনুগ্রহ ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজা পেয়েছিলেন তার জীবনের শেষ বছরগুলিতে। সহ-সন্ন্যাসিনীদের প্রতি তার অন্তরে ছিল ভগিনী সুলভ কোমল ভালবাসা। "একজন ভক্তপ্রাণের গল্পের"- নবম অধ্যায়টি হলো ভালবাসার উপর একটি বাস্তব রচনা। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলেছেন যে, সেই ঐশ্বরিক উৎকর্ষতার অনুশীলনের একমাত্র পথ হল যিশুকে আমাদের মধ্যে অন্যদের ভালবাসতে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে যিশুকে ভালবাসা; মানুষের বাহ্যিক-দোষত্রুটি উপেক্ষা কর কেননা সেগুলি মানুষটির আসল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু তার ভালবাসা ছিল সর্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী। বিশ্বাসের পরীক্ষার সময় তাঁর মনে হয়েছে যে, তিনি যেন অবিশ্বাসী ও পাপীদেরই একজন যাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে তাদের তিক্ত খাদ্য আহার করছেন এবং ঈশ্বরকে অনুনয় করছেন তাঁকে যেন ঐসব পাপীদেরই একজন মনে করে রেহাই দেওয়া হয়। করুণাপূর্ণ ভালবাসার নিকট আত্মোৎসর্গের দ্বারা তিনি নিজেকে মহান নিগূঢ় ত্রাণকার্যে যুক্ত করেছেন। আমরাও সবাই খ্রিস্টের সেই সংহতি ও ঐক্যে যুক্ত হতে

ব্যক্ত। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, বিশ্বজনীন পরিত্রাণকার্য আরও আশাপ্রদ বলে মনে হয়। পাপবিদগ্ধ এমন এক পৃথিবীর কথা চিন্তা না ক'রে – যেখানে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত, যিনি বিচার করেন, তিনি দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তৎক্ষনাৎ অগ্নি বর্ষণ ক'রে শাস্তি দিতে প্রস্তুত, যে অগ্নি গ্রাস করেছিল সদোম নগরী – আমরা এমন এক পৃথিবীর কথা ভাবতে পারি যেখানে মর্মবেদনাদগ্ধ বিপদগামী মানুষের প্রতি ঈশ্বর অসীম ধৈর্যশীলতা প্রদর্শন করেন; যেখানে রয়েছে তাঁর অসীম সহিষ্ণু ও কৃপাপূর্ণ এক হৃদয়, যে-হৃদয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাল এবং অকপটতার আভাষও দেখতে পায়, যেখানে মানুষ উদার, ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করে, তাঁর পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞের প্রতি আবেদন করে, যে-যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত পৃথিবীর সকল মনপরিবর্তনশীল পাপী; যেখানে অদৃশ্য সাধু-সাধ্বীগণের সঙ্গে সহযোগিতা আছে, যে সাধু-সাধ্বীগণ এই পৃথিবীর অন্তিমকাল পর্যন্ত স্বর্গে বাস ক'রে মর্তে মঙ্গলকর কার্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন। আমরা ভাবতেই পারি সেই বলিদানের কথা, যা হচ্ছে বিশ্বাস ও প্রেমের ফল, যা পৃথিবীর অপরিমেয় দুঃখ বেদনার পরিমাপ ছাড়া আর কিছু নয়, এবং যার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীকে রক্ষা করার অনুগ্রহের শক্তি। "বিশ্বাস রাখ", যিশুর পবিত্র হৃদয় বলে, "আমি বিশ্বকে জয় করেছি।"

বিশ্বাস এবং কর্ম

(১) প্রার্থনা এবং বিশ্বাস

হতাশ না হয়ে কিভাবে অবিরাম প্রার্থনা করে যেতে হয়, সেই প্রশ্নের উত্তর আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় কখনও পাওয়া যায়নি। প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করা অসম্ভব, কারণ আমাদের কাজ করতে হয়, ঘুমাতে হয়, অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয় এবং সে সময় আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সান্নিধ্যের বিষয়ে সচেতন থাকি না। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রার্থনা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল আমাদের জীবনকে বিশ্বাসে অনুগত, এক আধ্যাত্মিক অর্ঘ্য এবং ঐশ অভিপ্রায়ের প্রতি সংযুক্ত হিসাবে দেখা।

প্রার্থনা হল – ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। এছাড়া প্রার্থনা হয় না। আমরা পার্থিব সাহায্য চাইতে পারি - দৈনিক অন্ন, রোগীর স্বাস্থ্য ইত্যাদি, কিন্তু সমাপ্তিতে এই কথা বলতে হবে: "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হে পিতা তুমিই জানো, আমাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলকর কী"। প্রার্থনা করার অর্থ ঈশ্বরের পরিত্রাণ কর্মের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকা; ঈশ্বর যেমন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, এই জেনে সন্তুষ্ট থাকা যে, ঈশ্বর হলেন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, ঈশ্বর আনন্দময়, ঈশ্বর গৌরবময়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। প্রার্থনা হল আমাকে দিয়ে তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে, যেখানে ঈশ্বর চান নিজেকে সেই ঐশ ধারায় ভাসিয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন। মানুষ পারে বিনিময় করতে। আধ্যাত্মিক পর্যায়ে কেউ সান্ত্বনা লাভ করতে পারে না, যদি না সে নিজে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়; কেউ পেতে পারে না, যদি না সে প্রথমে দেয়; কেউ ক্ষমা পেতে পারে না, যদি না প্রথমে সে ক্ষমা করে; এবং বিতরণের ক্ষেত্রে এই জগতের নিয়মের প্রতিকূলে, যে যত বেশী দান করে, সে তত বেশি সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। কাজেই, বিশ্বাসের মনোভাব বা বিশ্বাসের অনুশীলন, যা প্রকাশিত সত্যের প্রতি কেবল বুদ্ধিগত সম্মতি নয় বরং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতার বাইবেল-ভিত্তিক মনোভাব, যা হচ্ছে খ্রিস্টকে অনুসরণ করা এবং তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, যা সাধু পলের কথায় বিশ্বাসের আনুগত্য, কাজকর্মের মধ্যেও ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। আর প্রার্থনা হল দু'টি ইচ্ছার মিলনের একটি বিশেষ মুহূর্ত যা প্রকাশ পায় মৌখিক ও ধ্যান প্রার্থনায়।

বিশ্বাস আমাদেরকে আধ্যাত্মিক বলিদান উপলব্ধি করতে শেখায়, যে-বলিদান প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত ও প্রত্যেক যাজকের প্রাত্যহিক খ্রিস্টযাগ ছাড়াও, ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা উচিত। একজন সাধারণ খ্রিস্টভক্তের আধ্যাত্মিক যাজকত্ব নিহিত আছে তার যাজকত্ব এবং তার নিত্যদিনের যজ্ঞনৈবেদ্যের মধ্যে।

সাধু পল যখন আমাদের অনুপ্রাণিত ক'রে বলেন, "আমাদের এই দেহটাকে এমন অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে জীবন্ত নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করতে হবে, যেন তা ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়", তখন তিনি এই কথা বলতে চান যে, আমরা যেন আমাদের নিজস্ব আমিটাকে, যা আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে, মানব সমাজের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে, সেই আমিটাকে উৎসর্গ করি, এবং আমরা তা করতে পারি একমাত্র আমাদের কাজকর্মের মধ্যদিয়ে। অর্থাৎ, আমাদের আমিটাকে বাস্তব পরিস্থিতিতে উৎসর্গ করা। আমাদের আমিটাকে নিবেদন করি ঈশ্বরের কাছে, কিন্তু তা করি ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশীকে দেওয়ার জন্য, এবং সেই বিশেষ প্রতিবেশীর মধ্য দিয়েই আমাদের আমিটাকে নিবেদন করি সমাজ আর জগৎ সংসারের কাছে। যে ধর্মাচরণে আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী, তা হল আমাদের জীবন, যা একটি বিশেষ অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করা হয়েছে। খ্রিস্টান হওয়ার অর্থ খ্রিস্টান হতে চেষ্টা করা। তা করতে হলে প্রয়োজন অবিরাম এবং কঠিন এক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সমাজের সাথে আমাদের সম্পর্ককে এমন জগত হিসেবে দেখানো হয়, যেখানে একজন আপ্রাণ চেষ্টা করে তার নিজের জন্য এবং প্রিয়জনের জন্য যতদূর সম্ভব একটি সুখকর এবং মনোহর স্থান প্রস্তুত করতে। আমাদের পরিবর্তন সেখানেই লক্ষণীয় হবে যেখানে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক লম্বালম্বি ভাবে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে দেখতে পারব, পাশাপাশি জগতের সাথে দৈহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নয়। এর অর্থ হচ্ছে 'আমার জন্য' এই মনোভাব পাল্টে, করতে হবে 'ঈশ্বরের জন্য', অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে 'অন্যদের সাথে ঈশ্বরের জন্য'। আমাদের আধ্যাত্মিক বলিদান তখনই সার্থক হবে যখন আমরা যা কিছুর সম্মুখীন হই, যা কিছু করি না কেন, সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পাই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার এবং অন্যদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করার জন্য আত্মত্যাগের কারণ। এই হল বিশ্বাসের জীবন।

(২) ধর্ম এবং বিশ্বাস

খ্রিস্টধর্ম প্রকাশ করে উচ্চতর ব্যক্তিত্ববাদ, নিজের প্রিয় আত্মার যত্ন এবং ধর্মনিষ্ঠ নারীর ভক্তি। কমিউনিষ্টরা দাবি করে যে, তারা খ্রিস্টানদের চাইতে আরও বেশী প্রতিবেশীকে ভালবাসে। তাদের মনে হয় ধর্ম লক্ষ লক্ষ কর্মজীবি এবং হত দরিদ্রদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে না। ধর্মকে যদি সংকুচিত ক'রে একটি মতবাদে পরিণত করা হয়, একটি উপাসনামূলক আচরণ মনে করা হয়, সংরক্ষিত ও রক্ষা করে রাখার মত একটি আচরণবিধি ভাবা হয়, তাহলে খ্রিস্টানরা বাস্তব জীবনের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত নয়, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিতে অস্বস্তি বোধ করে। একমাত্র বিশ্বাসই আধ্যাত্মিকতাকে জীবন্ত করতে পারে, যা ধর্ম এবং কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে। বর্তমান যুগে প্রৈরিতিক কাজে জড়িত মানুষদের জন্য এই আধ্যাত্মিকতারই প্রয়োজন – যে আধ্যত্মিকতা তাদের এই জগত ত্যাগ না করেই জগতটাকে খ্রিস্টীয় আদর্শে গ্রহণ করতে শেখাবে, ব্যস্ত রাখবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে খ্রিস্টীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে। সেই আধ্যাত্মিকতা হল জগতের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে তোলা, তবে জগতের একজন হয়ে নয়। অনাসক্ত হয়ে জগতের কাছে মৃত হওয়া, একজন খাঁটি খ্রিস্টভক্ত প্রতিনিয়ত তা নতুনভাবে লাভ করে, এই মর্তলোকে "নিম্নতর স্বভাব"

অনুসারে নয়, বরং উর্ধ্বলোক থেকে "ঐশ সান্নিধ্যে" ঈশ্বরের আত্মিক প্রেরণায়, পিতার কাছ থেকে আহূত ও প্রেরিতজন হিসাবে। কাজেই, খ্রিস্টীয় জীবন প্রধানত: জীবনীশক্তি লাভ করবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে বিনীত ও আন্তরিক ভাবে উৎসর্গীকৃত হয়ে। এই হল সকল পবিত্রতার শুরু এবং শেষ। মধ্যযুগের যে ধর্মাচরণ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি, তা জীবন্ত ঈশ্বর, ইম্মানুয়েল, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, প্রকৃত বিশ্বাসের এই কষ্টিপাথরে পরিক্ষীত হয়েছে। প্রথমত: ধর্মাচরণ হল সক্রিয়তা যা উর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যায়, অন্যদিকে বিশ্বাস হল একটি সম্পর্ক, যা উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের কাছে নেমে আসে। যেহেতু ধর্মাচরণ উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়, তাই ঈশ্বর হলেন আমাদের পরিসমাপ্তি: আমি আমার প্রার্থনা, আমার উপাসনা, পূজা অর্চনা তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি। বিশ্বাস হল এর বিপরীত: সবকিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে নিম্নলোকে নেমে আসে এবং ঈশ্বর হলেন আদি ও মূল উৎস। দ্বিতীয়ত: ধর্মাচরণ ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বইতে চেষ্টা করে। কেউ তার জীবনে আলাদা একটি অংশ বেছে নেয়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পূজা অর্চনা পদ্ধতি, যা একটি শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস হল সর্বাত্মক। তা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে আলাদা ভাবে দেখে না, বরং এই জীবনটাকে বিবেচনা করে, সমগ্র জীবনটাই হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। ঈশ্বর সর্বদা এবং সর্বস্থানে সক্রিয়।

(৩) বিশ্বাসের ঈশ্বর

বিশ্বাসের ঈশ্বর হলেন জীবন্ত ঈশ্বর, প্রকৃত ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর যিনি আমাদেরই সঙ্গে আছেন। কথিত আছে যে, বাইবেল মানুষের জন্য ধর্মতত্ত্ব নয়, বরং ঈশ্বরের জন্য নৃ-তত্ত্ব। বাইবেলে বাস্তবতার প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কখনই মানুষ ছাড়া ঈশ্বরকে দেখানো হয়নি। বাইবেলে কখনই স্বয়ং ঈশ্বরকে এক রকম অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে দেখানো হয়নি, বা "বিশ্বভুবনের চিরকুমার" হিসেবেও দেখানো হয়নি। তাঁকে দেখানো হয়েছে মানুষের ঈশ্বর হিসেবে, মানুষের প্রতি আকৃষ্ট এক প্রেমময় ঈশ্বর হিসেবে। বিশ্বাস হল ঈশ্বরে মানুষে সংলাপ। একজন অখ্রিস্টান ধর্মশহীদ থিওফিলস্‌কে বলল, "তোমার ঈশ্বরকে দেখাও"। উত্তরে থিওফিলস্ বললেন, "আপনি আপনার সত্তা দেখান, তবেই আমি আমার ঈশ্বরকে দেখাব"। এর অর্থ হল: যদি কেউ সত্যিকারের মানুষ হয়, অন্তর থাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ সজীব, তবেই সে ঈশ্বরকে দেখতে পাবে, কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। এই ভাবধারাই কার্ডিনাল সুইনেন্স ব্যক্ত করেছেন "The nun in the World.'' পুস্তকে। কেবলমাত্র দুর্নীতিগ্রস্থ, পাপে পূর্ণ একটি জগত, যে জগতের জন্য আমাদের প্রভু প্রার্থনা করেননি, সেই রূপ জগত হিসেবে সেই সন্ন্যাসিনী দেখেননি, কেননা সে জগতকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি এমন এক মানুষের জগতকে দেখেছেন যাদের ঈশ্বর এত ভালবেসেছেন যে, তাদের ত্রাণ করতে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করেছেন, এমনই এক জগত যেখানকার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে খ্রিস্টের অমূল্য রক্ত দ্বারা, দীনহীন পাপীদের এক জগত, যাদের সঙ্গে খ্রিস্টের পরিচয় ঘটেছে, অর্থাৎ এমনই এক জগত যেখানে আমাদের সবাইকে বাস করতে হবে।

বিশ্বাস সর্বদা আমাদের কাছে ঈশ্বরের কিছু দাবি রাখে। এমন কি ধ্যানমগ্ন জীবনেও, ঈশ্বরের ভালবাসা ও দাবি ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত সাক্ষাৎ হয় না। ঈশ্বর অন্তরে প্রবেশ করেন, কিন্তু সবসময়ই কিছু দাবি নিয়ে। মোশী জ্বলন্ত ঝোপে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই নৈকট্য মোশী বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারেননি: "আর এগিয়ো না। মিশর থেকে আমার লোকদের মুক্ত করে নিয়ে এসো"। একই ভাবে মেরী মাগদালেন যখন সমাধির কাছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন: "আমায় স্পর্শ ক'রো না। যাও, আমার ভাইদের বল: আমি আমার এবং তাদের পিতার কাছে উন্নীত হচ্ছি"। কাজেই আমরা একা একা এবং শুধুমাত্র আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতে পারি না। "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি" এই কথার সঙ্গে আমাদের যোগ করতে হবে "আমি মানুষকে বিশ্বাস করি"; ঠিক যেমন "আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি" এই কথার সঙ্গে যোগ করতে হবে "আমি আমার প্রতিবেশীকেও ভালবাসি"। মানুষের প্রতি এখনও ঈশ্বরের বিশ্বাস আছে, যদিও জগতের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত অনেকেই তাঁকে হতাশ করেছে।

(৪) বিশ্বাস এবং প্রৈরিতিক কাজ

এই জগত নিয়ে ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে এবং সেই পরিকল্পনার প্রধান রেখাচিত্র আমাদের ভালভাবে জানা আছে; মানবজাতির ইতিহাসে খুঁটিনাটি আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই, যদিও আমরা জানি না গন্তব্য কোথায়। বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল ঐশরাজ্যের প্রস্তুতি এবং ঈশ্বরের করুণায় ও সহযোগিতায় মানুষের প্রচেষ্টায় এই জগতকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ করে গড়ে তোলা। এই পরিকল্পনা হল পুনর্মিলনের, সৌভ্রাতৃত্বের, ন্যায্যতার, দুঃখ-বেদনা উপশমের, যা হারিয়ে গেছে তা পুনরুদ্ধারের: "আমি এসেছি যা হারিয়ে গেছে তা পুনরুদ্ধার করতে"। জীবিত ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র, সর্বশক্তিমান, অ-লৌকিক হলেও তিনি আমাদেরই ঈশ্বর। এর কারণ সাধু যোহন আমাদের বলেছেন। তিনি বলেছেন: অনন্ত অসীম হল প্রেমস্বরূপ, ঈশ্বর হলেন প্রেমস্বরূপ। জীবনদায়ী ঈশ্বর চারিদিক-ঘেরা একটি জলের বিশাল সরোবরের মতো নয়, বরং একটি বিশাল ঝর্ণাধারার মতো, যেখান থেকে জল প্রবাহিত হয়ে জগতকে উর্বর করে তোলে। এই জগতে জীবের অস্তিত্ব থাকে এবং সে বেঁচে থাকে সেই অনুসারে, যে অনুসারে সে ধারণ করে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা, সততা এবং তাঁর দ্যুতি। আমরা হলাম স্রোতস্বিনী, তাঁর উষ্ণতা ও জ্যোতির ধারা, যা মানবতার প্রাণসঞ্চারে যত্নবান। ভালবাসার খাতিরে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের মতো দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ মানুষদের তাঁর কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন। তিনি আমাদের শুধু তাঁর ঐশ জীবন প্রদান করতে চান না, বরং তাঁর ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ডও প্রদান করতে চান। জীবন হল জ্যোতি, সেই জ্যোতি বিচ্ছুরিত করতে তিনি সবার উপরই আস্থা রাখেন। ঈশ্বরকে প্রকৃত সত্য ঈশ্বররূপে, ঈশ্বরের কাছে নয়, বরং এই জগতের কাছে, প্রকাশ করতে হবে আমাকে: দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন ইহুদী ধর্মীয় নেতা লিখে গেছেন "তোমরা যদি আমার সাক্ষী হও, তাহলে আমি ঈশ্বর।" এই কাজ শুধু প্রার্থনা দ্বারা হয় না, বরং তা সম্ভব বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিটি সাধারণ কাজ কর্মের দ্বারা। এক যুবক শ্রমিক বলেছেন, "আমি যদি আমার কাজ খারাপভাবে করি, তাহলে আমি ঈশ্বরের সময় নষ্ট করি"। একজন খ্রিস্টের সাক্ষী বিরোধিতার মুখোমুখি হলে যেন আশ্চর্য না হয়। প্রেরিতদূতদের, যারা ছিলেন যিশুর প্রথম সাক্ষী, সবাইকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাসে অটল থাকতে শক্তি দেবার জন্য ঈশ্বর

আমাদের সঙ্গে আছেন। বিভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলীর সমাবেশে দেয়ালে একটি বড় পোষ্টারে লেখা ছিল: "ঈশ্বরকে ঈশ্বর হয়েই থাকতে দিন"। বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত হয় নিখুঁত কার্যপ্রণালী; আমার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর যেমন, ঠিক তেমনটাই প্রকাশ পাবে এই পৃথিবীর কাছে; এই আমি, যার আচরণে তাঁর কর্মধারা বয়ে চলে। একজন খ্রিস্টভক্তের সবচেয়ে সাধারণ আচরণ ভক্তির অভাব নয়, বরং এক অর্থে তা হল আধ্যাত্মিকতা, কারণ সেই আচরণের মধ্যে আছে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, ঈশ্বরকে তাঁর মতোই হতে দেওয়া। শেষ যুদ্ধের পরে বিজয়ী সৈন্যরা যিশুর নির্মল হৃদয়ের একটি মূর্তি, যেটি যুদ্ধের সময় গীর্জায় বোমা পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে ছিল, সেটিকে জোড়া লাগিয়ে ছিল। শুধু হাত দু'টি লাগানো গেলো না, কারণ সেগুলি গুড়ো গুড়ো হয়ে গেছে। মূর্তিটির নীচে তখন লিখে দেওয়া হলো: "তোমার হাত দুটি ছাড়া আমার কোন হাত নেই"।

(৫) বিশ্বাস এবং সমাজ

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর এক ব্যক্তি নয়, বরং ত্রি-ব্যক্তির একই সত্তা। খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করেছেন খ্রিস্টভক্তদের একত্রিত করে, নবসন্ধির ঈশ্বরের জনগণ রূপে। তাঁর এই নবমিলনে, ঈশ্বর স্বর্গরাজ্যের বিবাহ ভোজে সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন, এবং তিনি চান বিশাল এক পরিবারের পিতা হতে। কাজেই আত্মাভিমান এবং আত্মকেন্দ্রিকতা খ্রিস্টধর্ম বিরোধী, আর এসবে শয়তান উৎসাহ দেয়। "আমি আমার জন্য" বেঁচে থাকি – অবিশ্বাসীদের এই মানসিকতা একজন খ্রিস্টভক্তের আর থাকে না, বরং তার মধ্যে অন্যদের প্রতি একটি দায়িত্ববোধ জন্মায়, এই পৃথিবীতে তার চারপাশের মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করে। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একজন খ্রিষ্টভক্তের সংঘবদ্ধ-মানসিকতা থাকা উচিত; খ্রিস্ট নিজে যেমন আমাদের শিখিয়েছেন প্রার্থনার সময় ঈশ্বরকে "আমাদের পিতা" বলে সম্বোধন করতে, তেমন খ্রিস্টমণ্ডলীর উদাহরণেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বহুবচণের ব্যবহার দেখা যায়। সে এমনই একজন মানুষ হবে যে সহভাগিতা করে, যে অন্যদের সঙ্গে সংযুক্ত, কারণ সে বিশ্বাস করে "সিদ্ধগণের সমবায়" এবং সংগ্রামরত মণ্ডলীর সঙ্গে সে গভীরভাবে যুক্ত। সে এমনই একজন ব্যক্তি যে গান গায়, কারণ গান তাকে অন্যদের সঙ্গে যুক্ত করে, বিশেষ করে খ্রিস্টযাগ এবং সাধারণ অনুষ্ঠানের সময়।

পালকীয় নবজাগরণের অর্থ হল উপাসনা-অনুষ্ঠানকে এমন এক উদ্‌যাপন হিসেবে পুনঃ আবিষ্কার করা যা হবে বিশ্বাসী ভক্তজনের সক্রিয়তা। একজন খাঁটি খ্রিস্টভক্ত হল সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের ঘরে বা অন্য যে কোনও স্থানে, সেই খ্রিস্টের আদর্শ অনুসরণ করে, যে খ্রিস্ট সেবা পেতে নয় বরং সেবা দিতে এসেছিলেন, নমিত হয়েছিলেন যুদাসসহ অন্য শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে। এই নবজাগরণের আন্দোলনে খ্রিস্টভক্ত উপলব্ধি করতে পারে যে, সে সরাসরি দায়িত্বভার গ্রহণ করতে আহূত হয়েছে; অন্যদিকে সন্ন্যাসব্রতীদের ভূমিকা হল সেই আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা দিয়ে পরিচালনা করা।

(৬) বিশ্বাস এবং বার্তা

মনসিনিওর শারডেঁ একবার ধর্মপ্রচার এবং ধর্মশিক্ষার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন: "ধর্মশিক্ষা দেবার সময় যাজকগণ সাধারণত ভুল পথে চালিত হন। এতে যাজকদের কোনও দোষ নেই, কারণ তারা তাদের শিক্ষার শিকার। তারা এমন সব সেমিনারী থেকে বেরিয়ে আসেন যেগুলি দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্ব দিয়ে ঠাঁসা। তারা উপদেশ দিতে উঠে ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ দু-তিনটে পয়েন্টে ব্যাখ্যা করেন। তারা যা বলেন তা ভক্তদের মাথার উপর দিয়ে বেড়িয়ে যায়, কারণ তারা ভক্তদেরকে কাছে থেকে দেখেন না।" পাহাড়ের উপর থেকে পাথরে খোঁদাই করা ঈশ্বরের আজ্ঞা নিয়ে মোশীর মতো না এসে, বা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মতো ক্রুশ তুলে আস্ফালন না করে, অথবা শিখর থেকে শুরু না করে যাজক এবং ধর্মশিক্ষকদের তৃণমূল থেকে শুরু করা উচিত; এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় ঘটানো উচিত। আপনি কী করেন? মাইনে কড়ি কেমন পাচ্ছেন? কাজকর্ম ভাল চলছে তো? বিয়ে থা করেছেন? ছেলেমেয়ে আছে? আচ্ছা আপনার জীবন নিয়ে কিছু ভাবছেন কি? আপনার আশা আকাঙ্খা কী? এই সব ব্যাপারে সাধারণ মানুষের নিজস্ব মতামত আছে। এই হল তাদের ব্যক্তিগত জীবন। তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের এই আশা আকাঙ্খাই হল তাদের জগত, এবং..... এখানেই আছেন ঈশ্বর।

এইভাবে শুরু করলে দেখা যাবে যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হৃদ্যতা, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা গড়ে উঠেছে। এমন কি একজন নিরক্ষর মানুষও নিজেকে একজন প্রকৃত মূল্যবান গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করার প্রেরণা পাবে। সেই দ্ব্যর্থহীন ও নিঃশর্ত গ্রহণযোগ্যতার প্রেরণা এমনই এক মিশনারীর কাছ থেকে আসে, যিনি একজন সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসে অন্যদের সাথে কথা বলেন, অন্যদের মনের স্বতঃস্ফুর্ত বিস্ময়ের বাঁধন খুলে দেন, তাদের নিজেদের বিকশিত করতে এবং দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে মনের মধ্যে এক অদম্য আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলেন। এখানে মানুষে মানুষে সরাসরি ও নিঃসংকোচ সংযোগ স্থাপিত হয়। এই হল মূল কথা। সকল প্রৈরিতিক কর্মীদের কাছে, ধর্ম শিক্ষকদের কাছে সেই সজীব সংযোগ 'অন্ত' নয়, বরং 'আদি'। একমাত্র এইভাবে প্রকৃত খ্রিস্টীয় জীবনে ভালবাসার সূচনা হয়। সেই মানবীয় প্রচার কার্য, এমন কি যারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেয়নি, তাদের কাছেও সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়, কারণ প্রথমত তা হল কোনো বিশ্বাসোক্তি থেকে আগত নয়। কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি হলো সাধারণ জীবনের ব্যাপার। কিন্তু এগুলিকে আরও ভালো করে তোলার একমাত্র পথ হল প্রভুর শিক্ষা: "তোমরা একে অপরকে ভালবাস"। পারস্পারিক সহযোগিতা এবং সমাজবোধ, অনিয়মের মধ্যে নিয়মের অনুশাসন, অহংকারবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, ইত্যাদি থেকে পরিবর্তন এনে দেয়। "মানুষের পক্ষে একা থাকা মঙ্গলকর নয়"।

ভক্তরা যদি একা একা তাদের পুরোহিতের মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করে এবং তারা যদি একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধ জীবন গড়ে না তোলে, তাহলে স্থানীয় মণ্ডলী বা খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে না। সে ক্ষেত্রে যারা "মণ্ডলীর বাইরে পরিত্রাণ নেই" এই সাবেক মতবাদ দিয়ে

নিজেদের পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল, তাদের সেই মতবাদের উত্তরে একমত হয়ে বলাই যেতে পারে "সংঘবদ্ধ জীবনের মানসিকতা ব্যতিরেকে কারও পরিত্রাণ নেই: না পার্থিব পরিত্রাণ, না শাশ্বত পরিত্রাণ"। মানব সমাজ থেকেই শুরু ক'রে ঐশ্বরিক সমাজে, অর্থাৎ সেই পুণ্য ত্রি-ব্যক্তির পরিবারে পৌঁছানো সক্ষম হবে।

মিশনারি প্রেরণা

(১) মিশনারি প্রেরণা কি?

"দেশের কাজ করতে হবে মিশনারি উদ্দীপনা নিয়ে", করাচিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা এই ঘোষণা দিলেন। একজন অ-খ্রিষ্টানের দৃষ্টিকোন থেকে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সামগ্রিক ভাবে সমাজের সেবা করতে হবে নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠতার সঙ্গে। একজন খ্রিস্টভক্তের কাছে মিশনারি প্রেরণা হল মনে প্রাণে এই চাওয়া যে, যিশুর মহিমময় দ্বিতীয় আগমনের প্রস্তুতির এবং অন্তিমকাল থেকে রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্ট সব জাতির মানুষের অন্তরে প্রবেশ করুন। অর্থাৎ খ্রিস্টের গৌরব এবং তাঁর রাজত্ব তথা তাঁর নিগূঢ় দেহ খ্রিস্টমণ্ডলী, তথা ঐশ পরিবারের জন্য অন্তরে উদ্বেগ, আকুলতা, উৎকণ্ঠা এবং গভীর আগ্রহ পোষণ করা। খ্রিস্টের ভালবাসা যদি অগ্নি হয়, তবে আগ্রহ হ'ল সেই অগ্নির বহ্নি-শিখা। তা হ'ল প্রতিটি মানুষের কাছে পরমেশ্বরের দ্বৈত আহ্বানের প্রতি উদার সাড়াস্বরূপ। প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের দেহধারণের প্রতি সাড়া ব্যক্ত করা যেতে পারে উদার মনের প্রথম চাওয়া হিসাবে: পরিবর্তে ঈশ্বরকে ভালবাসা, তাঁকে সবসময় ভালবাসা; অন্যভাবে বলতে গেলে, "ঈশ্বর আমার অন্তরে বাস করুন এবং রাজত্ব করুন"! "আমার মধ্যে তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক!" আলোর দিশারী হওয়া, আন্তরিক হওয়া, অন্যের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করা-এই সব করার প্রবল ইচ্ছা মানব মুক্তি সাধনের প্রতি কম সাড়া দেওয়া নয়। তা এই ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, "আমার মধ্য দিয়ে তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তা যে-কোনও মূল্যেই হোক না কেন"।

(২) কেন আমরা এর অধিকারী হব?

প্রথমত: তা সম্ভব। সৃষ্টির শুরু থেকে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাণীর মিশন ছিল ধীরে ধীরে তাঁকে নিজেকে প্রকাশ করা এবং মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করা যা প্রবক্তারা এবং সবশেষে ঈশ্বর পুত্র মানুষ হয়ে সেই কাজ ক'রে গেছেন। তাঁর পরে এই কাজে আমরা সাহায্য করতে পারি সত্যিকারের অকপট সাক্ষী হয়ে, স্পষ্ট নিদর্শন হয়ে, যার মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। এক নিখুঁত মনুষ্যজাতি গঠন করতে বাক্য কারিগরের মত এই ধরাধামের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। সেই বাক্য আমাদের মধ্যে যেন খুঁজে পান এক সহকারী ও সহযোগী। এরিওপেগাটের ডেনিস লিখেছেন, "সকল পুণ্যের মধ্যে মানবাত্মার পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরকে সহযোগিতা করার চেয়ে পুণ্য আর কিছু নেই,"কর্মরত সেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমরাও কর্মী হয়ে উঠব যে ঈশ্বর কঠোর পরিশ্রম করছেন", তিনি একমাত্র স্থায়ী সমাজ তথা স্বর্গীয় জেরুসালেম গড়ে তুলতে বিশ্বজগত জুড়ে সক্রিয়। এই সম্ভাবনা বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা দেখিয়েছে যে, বর্তমানে মণ্ডলীকে শুধু তত্ত্ব হিসাবে নয়, বরং কর্মক্ষেত্রেও মিশন হয়ে উঠতে হবে। সাম্প্রতিক কালের পোপগণ এবং বর্তমান পোপমহোদয়গণ-ও প্রেরিত। তাদের কাজের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ক'রে মহাসভার পিতৃগণ বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁরা শুধু নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের কাছে দায়বদ্ধ নয়, বরং সমষ্টিগত ভাবে সারা বিশ্বের কাছে দায়বদ্ধ। পোপ পদে নির্বাচিত হওয়ার কিছু পূর্বে পোপ ষষ্ঠ পল আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ সফর করেন যেগুলি প্রচার কাজের জন্য উন্মুক্ত। তার উদাত্ত উক্তি এইরূপ: "বর্তমানে মণ্ডলীর ইতিহাস এবং বিশ্বের জীবনের জন্য প্রয়োজন এক সর্বজনীন মিশনারি প্রচেষ্টা। খ্রিস্টানদের, কাথলিকদের হতে হবে মিশনারি। প্রচার কাজের দায়িত্ব, সাক্ষ্যদান, লব্ধ ধর্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করার প্রবল ইচ্ছা, খ্রিস্টীয় জীবনের সংগ্রামী বৈশিষ্ট্য বর্তমান কালে প্রত্যেক ভক্তের মধ্যে প্রতিটি কাথলিক সমাজের এবং একই সঙ্গে সমগ্র মণ্ডলীর মধ্যে ফুটে উঠবে। কেউ যেন ভীত-সন্ত্রস্ত বা নিষ্ক্রিয় অলস অথবা উদাসীন হয়ে না থাকে। পরগাছার মতো কেউ যেন না হয়, বরং ঐশরাজ্যের জন্য প্রত্যেকে সক্রিয় ভাবে ব্যস্ত থাকুক"। পোপের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কার্ডিনাল সুনেন্স বিশাল এক জনসমাবেশে এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন সে ঈশ্বরকে জানতে পারে ও ঈশ্বরকে অন্যের কাছে জানাতে পারে, তাঁকে ভালবাসে এবং ভালবাসাতে পারে, তাঁকে সেবা করে আর সেবা করাতে পারে"। তার লেখার মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন পৃথিবীর হাজার হাজার সন্ন্যাসব্রতীগণ সক্রিয় প্রচার কার্যের জন্য বেরিয়ে আসুক, কারণ তাদের পুরানো আদর্শ ছিল নিজেদের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখে সেই দুর্নীতিগ্রস্ত পৃথিবী থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা, যে পৃথিবী দিন দিন আরো দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে । (The Nun in the world)

বিংশ শতাব্দীর খ্রিস্টভক্তদের পবিত্র জীবনধারনের বিষয় যখন মহাসভায় পাঠ করা হয়, তখন দেখা গেছে যে, সেই জীবনধারনের মূল লক্ষ্য ছিল ভালবাসা এবং তাদের প্রতিবেশী। খ্রিস্টের অঙ্গ হিসেবে তার দায়িত্ব সমগ্র দেহের বৃদ্ধির, আবার অন্যদের সঙ্গে সংযুক্ত হিসেবে সে একা একা নির্জন নিস্তব্ধ দ্বীপের মতো হয়ে থাকতে পারেনা: যে শাখা ফল ধরে না তার ধ্বংস অনিবার্য। প্রত্যেকটি মহৎ পরিবর্তন ঘটেছে হঠাৎ পাপী থেকে খ্রিস্টের শিষ্যে রূপান্তরিত হয়ে। প্রার্থনা বিমুখ চার্লস দ্য ফুকো পরিবর্তনের আশির্বাদ লাভ করেছিলেন এক মুসলমান সৈনিকের ভর্ৎসনার মাধ্যমে। পরিবর্তনের পরে তিনি অনুভব করলেন, তিনি তার ভ্রাতাদের অভিভাবক এবং তাঁকে "সর্বজনীন ভ্রাতা" বলে অভিহিত করা হ'ত। প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত, যাজক বা সন্ন্যাসব্রতী, যদি তার মধ্যে মিশনারি প্রেরণা থাকে, তবে সে নিজ দেশ ত্যাগ না করেও মিশনারিদের স্বর্গীয় প্রতিপালিকা ক্ষুদ্র পুষ্পের মতো আত্মিক ভাবে একজন মিশনারি, আর তার মধ্যে যদি সেই উদ্দীপনার অভাব থাকে, তবে সে কোনও অর্থেই মিশনারি নয়, হতে পারে সে অনেক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে বিদেশের মাটিতে। আমরা এই পৃথিবীতে শুধু নিজ পরিত্রাণার্থে জন্মাইনি। এই গান বর্তমান যুগে অচল:

" শুধু একটি মাত্র আত্মা আমার, বাঁচাতে হবে তাকে। প্রদান কর লক্ষ্য আমার, নিরাপদ অগ্নিময় সমাধি থেকে"!

অন্যভাবে বলা যায় যে, যিশু যে-আগুন জ্বালাতে চাচ্ছেন তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হবে এই প্রার্থনা। আমরা এই পৃথিবীতে আছি পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য। এই পৃথিবীতে আমরা আছি অন্যের যত্ন নেবার জন্য। এ ভাবেই পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা হয়।

(৩) কীভাবে তা অর্জন করতে পারি?

মিশনারি প্রেরণা অর্জন ও ধারণ করার একটি মাত্র পথ আছে: পবিত্র আত্মার অনুগত হওয়া এবং তাঁর প্রেরণার প্রতি বিনীত ভাবে সু-গ্রাহী হওয়া। সেই প্রথম পবিত্র আত্মার অবতরণ থেকে অন্য দুই ঐশ ব্যক্তি অনবরত পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করে যাচ্ছেন যাতে, যারা তাকে আকুল ভাবে কামনা করে তাদের মধ্যে ঐশজীবন বজায় থাকে।

পবিত্র আত্মার নীরব নিঃশব্দ অবতরণ ঘটে যাচ্ছে। জর্দন নদীতে যিশুর দীক্ষাস্নানের সময় যা ঘটেছিল, আমাদের দীক্ষাস্নানেও তার পুণরাবৃত্তি ঘটছে। পবিত্র আত্মা আমাদের উপর নেমে আসছে এবং আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা নীরবে বলছেন, "এই আমার প্রিয় সন্তান"। হস্তার্পনের সময় এই কথার পুণরাবৃত্তি ঘটে এবং তার সঙ্গে যোগ হয় যিশুর রূপান্তরের সময় যা বলা হয়েছিল, "তোমরা এর কথা শোন"! এই কথাগুলি আমাদের খ্রিস্টের সাক্ষী করে তোলে; প্রতিটি মানুষের কাছে মানবমুক্তির যজ্ঞ তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হয়েছে। পবিত্র আত্মা বন্ধ ঘর থেকে শিষ্যদের বের করে নিয়ে এসেছিলেন পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের সাক্ষ্য দিতে এবং পবিত্র আত্মা আজও আমাদের জীবনে ঘটা প্রতিটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরমেশ্বরের প্রকৃত করুণাধারা বর্ষণ করছেন আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে এবং যে সব সাক্ষ্য আমাদের দিতে হবে, তার জন্য আলো ও শক্তি দিতে আর আমাদের মধ্যে আরও বেশি করে খ্রিস্টকে গড়ে তুলতে। আমাদের খ্রিস্টীয় কার্যক্রম এইরূপ: খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহে এবং প্রচারকার্যে আমাদের জীবন। এই পৃথিবীতে খ্রিস্টের কাজ চালিয়ে যেতে তাঁর নামে অনেকে মিলে এক হয়। খ্রিস্ট এবং তাঁর সাধু-সাধ্বীগণ এই পাপময় পৃথিবীতে, অদৃশ্যভাবে হলেও অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন এবং অন্তিমকাল অবধি কাজ করে যাবেন। "জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি। পৃথিবীর সব প্রান্তে তোমরা আমার সাক্ষী হয়ে থাকবে"। আমরা তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতে দৃশ্যমান কর্মী, সেই অদৃশ্যের সঙ্গে আমরা সবাই যুক্ত হয়ে আছি, এই পৃথিবীতে মঙ্গল সাধন ক'রে স্বর্গরাজ্যের সূচনা করছি।

(৪) কীভাবে তা অনুশীলন করব?

মনোভাব ছিল, আমাদের মধ্যেও সেই মনোভাব থাকতে হবে: "এই লোকদের জন্য আমার দুঃখ হয়, তারা যেন পালকবিহীন মেষপালের মতো"। আমাদের সহানুভূতি দেখাতে হবে, সমব্যথী হতে হবে, অন্তঃবেদনা পীড়িত মানবজাতির প্রতি, তাদের প্রতি কর্তৃত্বের আসন থেকে দৃষ্টিপাত করব না। সকল স্খলিত আদম সন্তানদের সঙ্গে আমাদের সংহতি স্বীকার করতে হবে। এরপর, আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব বাণীপ্রচারের তিনটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করব: কাজ করা যে শুধুই ভাল; প্রার্থনা যে আরো ভালো; তবে কৃচ্ছ্রসাধন সর্বোৎকৃষ্ট। কাজ করার অর্থ ধর্মোপদেশ, শিক্ষাদান, সুপরামর্শদান এবং সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন। এই বিনম্র উপায় গুলি হলো মণ্ডলীতে কর্মরত প্রচারক, মিশনারি, যাজক, এবং সন্ন্যাসব্রতীদের দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ কর্মসূচী, যে কর্মসূচি গুলি সাধারণত: ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীতে প্রস্তুত করা হয়, যদিও এই ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীগুলি এখনও পৃথিবীর অনেক দেশে যৎসামান্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এখনও মঙ্গলবার্তা প্রচারকদের ছোঁয়া পায়নি। হিসেব করে দেখা গেছে যে, মহাধর্মসভায় আর্চবিশপ ও বিশপদের সংখ্যা দু'হাজারের বেশী হলেও, নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে মণ্ডলীতে খুব বেশি হলে হাজার খানিক মিশনারি আছেন - অর্থাৎ প্রচার কাজের জন্য - অন্যদিকে পুরানো খ্রিস্টভক্তদের যত্ন নিতে আছেন কয়েক হাজার মিশনারি। কাজ অনেক কিন্তু কর্মীর সংখ্যা সব সময়ই অপ্রতুল। উন্নতির শ্লথগতিতে নিরুৎসাহ না হওয়ার একমাত্র পথ হ'ল দলের একজন হয়ে অন্যদের সঙ্গে কাজ করা। এক জোট হ'লে দুর্বল সবল হয়ে ওঠে; বিভাজনে সবলও দুর্বল হয়ে পড়ে।

কার্য সম্পাদনে অধিকতর কার্যকরী উপায় হচ্ছে প্রার্থনা। দূরদেশে কর্মরত মিশনারিদের পিতামাতা এবং বন্ধু-বান্ধবরা ক্ষুদ্র পুষ্পের অনুকরণে প্রার্থনা এবং ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাদের রক্ষক হতে পারেন। সবার জন্য এই হ'ল প্রভুর সুপারিশ "তোমরা শস্যক্ষেত্রের মালিককে অনুরোধ কর, তিনি যেন শস্য সংগ্রহ করার জন্য মজুর পাঠিয়ে দেন"। "হে প্রভু! তুমি তো চাও সকলে পরিত্রাণ লাভ করুক এবং সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হোক -- দিকে দিকে তোমার মঙ্গলবাণী ছড়িয়ে পড়ুক ও তোমার পুত্রের গৌরব হোক"।

মাঝে মাঝে নিরিবিলি জায়গায় চলে গিয়ে বাণীপ্রচারক তার জীবন্ত বার্তার পুনঃনবীকরণ করবে। তার গুরুর উদাহরণ অনুসরণ ক'রে সে নিজের কাছে প্রার্থনায় মৃত্যুবরণ করে। আমাদের আহ্বান করা হয়েছে দেহধারণ এবং পরিত্রাণের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে, এবং আমাদের উত্তর হ'ল: "এই দেখ প্রভুর দাসী। এই যে আমি, প্রভু, তুমি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও আমি তা করতে প্রস্তুত। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করি, যাতে আমি নিজের কাছে মৃত হয়ে তোমার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারি, নবরূপে গ্রহণ করতে পারি তোমার পবিত্র আত্মাকে"। তাহলেই আমরা খ্রিস্টকে অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারব, তাঁকে আমাদের মাধ্যমে, আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের মধ্যে কাজ করতে দিয়ে। তাঁকে আমাদের হৃদয়ে, আমাদের ওষ্ঠাধারে এবং আমাদের হস্তে অবস্থান করতে অনুরোধ ক'রে আমরা হয়ে উঠব তাঁর প্রকৃত সাক্ষী, তাঁর মঙ্গবার্তার প্রকৃত বাহক।

সবচেয়ে কার্যকারী পন্থা হ'ল যন্ত্রণাভোগ। রক্ত না ঝড়ালে মানব মুক্তিসাধন হ'ত না, এবং তাঁর সকল ভ্রাতা-ভগ্নীদের উদ্ধার করতে খ্রিস্ট যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনও নিশ্চিত ফলপ্রসূ উপায় খুঁজে পাননি। এই ভাবে খ্রিস্ট যন্ত্রণাভোগকে শাস্তির বদলে পবিত্রীকরণ ও মঙ্গলবাণী প্রচারের উপায় হিসাবে পরিণত ক'রে পবিত্রীকৃত ক'রে তুলেছেন। এই বিষয়ে তিনি সাধু পিতরের জন্য পূর্বাভাস দিয়েছিলেন: "আমার মেষদের লালন পালন কর। -- তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, অন্য কেউ তোমার কোমর বন্ধনী বেঁধে দেবে এবং

তুমি যেখানে যেতে চাইবে না, সেখানে নিয়ে যাবে" এবং সাধু পল এ সম্বন্ধে বলেছেন: "আমি নিজেই তাকে বোঝাব আমার নামের জন্য কত দুঃখ তাকে ভোগ করতে হবে"। ক্রুশের পথের ৪র্থ এবং ৫ম তীর্থে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম খ্রিষ্টভক্ত (ধন্যা মাতা) থেকে শেষ ব্যক্তি (অনিচ্ছুক সিরেনবাসী) পর্যন্ত সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে খ্রিস্টের যন্ত্রণাভোগের অংশীদার হতে এবং তাঁর দেহরূপ এই মণ্ডলীর জন্য খ্রিস্টের যন্ত্রণাভোগের যেটুকু অভাব রয়েছে তা পূরণ করতে। আমরা নিজেদের কাছে মৃত হয়ে সেই সহযোগিতা শুরু করতে পারি, তবে ক্রুশ এবং কষ্টভোগ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, আমাদের পছন্দ অপছন্দ অগ্রাহ্য ক'রে, এমনই এক ত্রাণকর্তা কর্তৃক যিনি আমাদের এতই ভালবাসেন ও আমাদের উপর আস্থা রাখেন যে, তিনি তাঁর নিয়তি তথা তাঁর যন্ত্রণাভোগ আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান এবং আমাদের ত্রাণ ক'রে তাঁর মহিমায় ভূষিত করতে চান। আমরা যখন অন্যদের বিশেষত, আমাদের প্রিয়জনদের কষ্টভোগ করতে দেখি, এবং তাদের কষ্ট উপশম করতে কিছুই করতে পারি না, সেই না পারার ব্যথা আমাদের বেশি কষ্ট দেয় যা প্রকৃত শারীরিক যন্ত্রণা দেয় না, কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দেব, "পরমেশ্বর আমার চেয়ে ঐ ব্যক্তির উপর বেশি আস্থা রাখেন। পরমেশ্বর আমার চেয়ে ওর জন্য আরও অধিক উচ্চাশয়ী পরমেশ্বর, ঐ ব্যক্তিকে অতি উৎসাহী হয়ে ভালবাসেন, আমায় তিনি সেভাবে বাসেন না। আমি মনে মনে ভাবি যে, আমার মতো কৃপণ হয়ে তারা বুঝি যথেষ্ট এবং শক্তিপূর্ণ ভালবাসায় ঈশ্বরকে ভালবাসে না। আসলে তিনি সেই ব্যক্তিকে উৎকৃষ্টতম শিষ্য হতে আহ্বান করেছেন, আহ্বান করেছেন তাকে তাঁর সঙ্গে জীবন্ত বলি হতে।

তৃতীয় ভাগঃ খ্রিস্টীয় মনোভাব ও আধ্যাত্মিকতা

বাইবেলীয় আধ্যাত্মিকতা

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল, আমাদের আধ্যাত্মিকতা এবং খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা আরও বেশী বাইবেল ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। উৎসে ফেরার অর্থ প্রকৃতপক্ষেই 'উৎসে' ফেরা। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে জীবনময় ঈশ্বরের প্রকাশিত 'বাক্য' তথা খ্রিস্ট ছাড়া আর কোন উৎস নেই। ভুল পথে চালিত হওয়া থেকে আমাদের বিরত রাখতে, মণ্ডলীর অভ্রান্ত কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসতত্ত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন, কিন্তু ব্যবহারিক এবং গঠনমূলক শিক্ষার জন্য আমরা আধ্যাত্মিক লেখকদের শরণাপন্ন হই। বিংশ শতাব্দীর খ্রিস্টধর্মে যখন নানা জটিলতা এবং বোঝা চাপানোর ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, তখন আমরা কোথায় যাব ? এসো ঈশ্বরকে বেশি করে কথা বলতে দিই এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনে আমাদের এই সংসারের আচার্যরা তাদের মতামত দেবেন। পাপ অথবা আমাদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে, অন্যদের এবং আমাদের নিজেদের নৈতিক উপদেশের সুরে বক্তৃতা দিতে শুরু না করে আমাদের উচিৎ আমাদের গুরুর পথ অনুসরণ করা, যিনি গরুর সামনে লাঙ্গল বাঁধেননি। বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের আমন্ত্রণ করেন, প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর উপহার প্রদান করেন এবং বলিদানের চেয়ে দয়া পছন্দ করেন। পালকীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে এই হ'ল অনেক ভাল পথ। মুল্যবোধ এবং উদ্যমশীলতা মনুষ্য হৃদয় ও মন গলিয়ে দেয়, অন্যদিকে নিয়ম-নীতির বজ্র আঁটুনি টকটকে লাল গরম লোহার ছেঁকার মত হৃদয় মনকে জমাট বাঁধায়। আমাদের নিরাপত্তা এবং আশা-আকাঙ্খা আমাদের সক্রিয়তা এবং প্রচেষ্টার উপর ততটা নির্ভরশীল নয়, যতটা নির্ভরশীল আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার উপর।

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই একটি 'ঘটনা', যা খ্রিষ্টীয় রহস্যের নৈতিক দিকের ভিত্তি। এই ঘটনাটির পরে আসবে মনপরিবর্তন এবং ঘটনা অনুসারে জীবনযাপন।

(১) ঘটনা

(ক) কী সেই ঘটনা?

বাইবেলে বর্ণিত সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিত্রাণের ইতিহাস। আসলে তা হল খ্রিস্টের আগমন, যার পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই প্রাক্তনসন্ধিতে করা হয়েছিল, ত্রাণকর্তার জীবনের মধ্যদিয়ে তা বাস্তব রূপ পেয়েছে এবং এখন আমাদের মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত হচ্ছে। পাস্কা পর্বের নিগূঢ়রহস্যে (Pascal Mystery) তা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যা খ্রিস্টীয় জীবনের নিবেদন এবং পুণ্য সংস্কার, তা হল ঈশ্বরের উপহার, একজন ব্যক্তিকে উপহার। যিশুর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের ঘটনাগুলি এমনই ঘটনা যার মধ্যে প্রতীয়মান ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ। এই ঘটনাসমূহ প্রকাশ করে ঈশ্বরের মনোভাব: "তিনি জগৎকে এতই ভালবেসেছেন" (যোহন ৩:১৬)।

এই ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করার উপায় হল সেই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের উপর 'বিশ্বাস' স্থাপন, যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন ঘটনাক্রম এবং তথ্যের মাধ্যমে। শাশ্বত জীবন এবং ঈশ্বরের গৌরবই হল চরম পরিণতি: 'হে প্রভু শাশ্বত জীবন, সে-তো তোমাকে জানা" (যোহন ১৭:৩)। একটি ক্ষুদ্র ঘটনা, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আমাদের অতীত জীবনে খ্রিস্টের আগমন এবং প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনে যা ঘটে তার মধ্যে খ্রিস্টের অবিরত আগমন। সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে ক্ষুদ্র ঘটনা যা-ই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরই উদ্যোগী হন। তিনি আমন্ত্রণ করেন, তিনি প্রদান করেন; তাঁর ভালবাসা ৯৯ শতাংশ নয়, পুরোপুরি ১০০ শতাংশ। এই ১০০-র সঙ্গে আমরা যখন আমাদের ০ যোগ করি, তিনি সেই শূণ্য বসিয়ে দেন সংখ্যাটির শেষে এবং দয়ার গুণে সেই সংখ্যা হয়ে যায় ১০০০।

(খ) আমরা কীভাবে তা বুঝব?

মানব পরিত্রাণের সেই মহান ঘটনা বুঝতে হলে ব্যক্তিগত ভাবে বাইবেল পাঠ করতে হবে, খ্রিস্টযাগ বা বাইবেল আলোচনা সভায় গিয়ে বাইবেল পাঠ এবং তার ব্যাখ্যা শুনতে হবে, ধর্মোপদেশ শুনতে হবে এবং উপাসনা সংগীতে অংশ নিতে হবে; ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক পাঠ এবং বিশেষ করে নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে, অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ধ্যান-প্রার্থনা, কারণ এটি হল ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ, যেখানে আমরা তাঁর কথা শুনি এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলি। এ কথা একজনের জীবনের ঘটনাসমূহ এবং খ্রিষ্টের আগমনের ক্রমবৃদ্ধির ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

আমাদের জীবনে বর্তমানে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা বুঝতে পারা কঠিন, কিন্তু সেগুলির মূল্য সমাদর করা আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বরের উপহার সব সময় আমাদের কাছে আসে বর্তমান মুহূর্তের মোড়কে, আমাদের যা কিছু করতে হবে তার জন্য যথার্থ অনুগ্রহের রূপে। ত্রিমাত্রিক আধ্যাত্মিক জীবনের তৃতীয় মাত্রা হল বাস্তবতা এবং ব্যবহার সম্পর্কিত। প্রথমটি ঐশতাত্ত্বিক (Thological) বা সত্তাসম্পর্কিত (Ontological); দ্বিতীয়টি উপাখ্যান-সম্বন্ধীয় (Hagiological) – সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পাঠ ও তা অনুকরণ। তা আমাদের শেখায় ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে তাঁর আগমনের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে (তৃতীয়টি "প্রকৃত বাস্তববাদ" True

Existentialism নামক প্রবন্ধটি দেখুন)। "সন্ধ্যাকালীন ধ্যান-প্রার্থনার" মাধ্যমে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগ হয়, যাঁকে খুঁজে পাই তাঁর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এবং যাঁর সাক্ষাৎ পাই তাঁর নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার মধ্যে, যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি সেই 'বাক্য' এবং বর্তমান মুহূর্তের অনুগ্রহের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি (দেখুন, কার্যকরী আধ্যাত্মিকতা)। খ্রিস্ট, যিনি তাঁর অপরিহার্য সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন, কখনই চান না আমরা একই সময় দুটো বিষয় নিয়ে চিন্তা করি। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি সবসময় যা চান, তা হল আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা। আমরা যে কাজকর্ম করি, আমাদের মন পড়ে থাকে সেখানে, কিন্তু আমাদের ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যাবে পিতা ঈশ্বরের এবং সেই সঙ্গে খ্রিস্টের ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে। খ্রিস্টকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। তিনি চান না আমরা দুই মনিবের সেবা করি। আমরা যদি সতর্ক না থাকি, তাহলে খুব সহজেই আমরা সাধারণ এক রাজ্যে বাস করে, সেবা করব আত্মকেন্দ্রিকতার সুবহ বিগ্রহের এবং খুব সাধারণ পরিস্থিতি বা ঘটনার মাধ্যমে আমাদের কাছে খ্রিস্টের আগমন বুঝতে ব্যর্থ হব।

(২) মন পরিবর্তন

(ক) ব্যক্তির প্রতি পরিবর্তন

খ্রিস্টের আগমনে আমাদের সাড়া, নব বিধানে আমাদের পুণঃ পুণঃ প্রবেশ, এ সবই হয় পরিবর্তনের মাধ্যমে। এটি কোনো নৈতিক ঘটনা নয় - খারাপ আচরণ থেকে ভাল আচরণে পরিবর্তন নয়, বা ভাল থেকে আরও ভালর দিকে উত্তরণ নয়, বরং এটি হল ব্যক্তি-মানুষে পরিবর্তন। নৈতিক পরিবর্তন আসে পরে। খ্রিস্ট আমাদের দরজায় ঘা দিলে আমরা যখন সেই দরজা খুলে দিই এবং খ্রিস্ট যে সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসেন, যেমন পুণ্য-সংস্কারের মধ্য দিয়ে, তখন তা হয় তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যক্ষ চিহ্ন। আমরা জাখেয়োর মতো তাঁকে গ্রহণ করি এবং আমাদের গৃহে পরিত্রাণ আসে। পরিত্রাণের জন্য আমাদের সক্রিয় হতে হবে না, বরং বেঁচে থাকতে হবে, কারণ আমাদের পরিত্রাণ ইতিমধ্যেই খ্রিস্ট আমাদের জন্য অর্জন করেছেন। ঈশ্বরের স্বাধীন পছন্দের ফলে আমাদের ঐশরাজ্যে প্রবেশ হল পবিত্র আত্মায় নব জন্ম। ঈশ্বরের সন্তান এবং পরিত্রাতার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হওয়ার ফলে আমরা যে বিশেষ সুবিধা পেয়েছি, এবার আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে তা দেখাতে হবে। একই সঙ্গে আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিবার তথা মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে আসেন, কিন্তু তিনি চান আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাই সংঘবদ্ধ ভাবে।

(খ) তা কীভাবে ঘটে?

পরিবর্তন হল আমাদের জীবনের বিরামহীন কার্যক্রম। প্রতি মুহূর্তে আমাদের হৃদয় তুলে ধরতে হবে এবং নিজেদেরকে খ্রিস্টমুখী করতে হবে। মন্দের প্রতি সব সময়ই আমাদের স্বাভাবিক পক্ষপাত রয়েছে, জন্ম থেকেই স্বার্থপরতার প্রতি আমাদের ঝোঁক রয়েছে। সাধু পল যেমন বলেছেন, "আমি যা করি তা তো করতে চাই না, বরং যা ঘৃণা করি, তা-ই তো করে বসি..... মৃত্যু-পরিণামী এই দেহটা থেকে কে-ই বা আমাকে উদ্ধার করবে? আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের করুণাই আমাকে উদ্ধার করবে" (রোমীয় ৭:১৫-২৫)। এই হল ইচ্ছার সিদ্ধতা তাৎক্ষণিক পরিপূর্ণতা (দেখুন প্রবন্ধ, ইচ্ছার সিদ্ধতা), অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতা, সদয় ভালবাসার কাছে প্রত্যাবর্তন। এর ভিতরে নিহিত আছে, যখনই আমাদের বিবেক দংশন করে তখন, আধ্যাত্মিক স্বীকারোক্তির অনুশীলন: "বিনম্র ও অনুতপ্ত হৃদয় তুমি প্রত্যাখ্যান করো না" (সাম: ৫১:১৯)। এই হল ভুলত্রুটির সদ্ব্যবহারের দক্ষতা। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ কাজ কর্মের দ্বিধাহীন নৈবেদ্য এবং 'অপব্যয়ী পুত্রের' প্রতিনিয়ত ফিরে আসা আর সামান্য ভুলের জন্যেও ক্ষমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়া, এ সবই আমরা যা হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের পাইয়ে দেবে। যে ক্ষমা আমরা লাভ করেছি সেই অনুপাতে আমরা ভালবাসায় উন্নতির পথে অগ্রসর হই এবং একই সঙ্গে খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পথেও অগ্রসর হই। এই প্রীতিপূর্ণ অনুশোচনার মনোভাব আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট করে আমাদের সঙ্গী সাথীদের দিকে, আমাদের পাপের জন্য প্রকৃত অনুতপ্ত ক'রে তোলে এবং আমরা 'ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ' এই সম্বোধন করে তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, 'আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।' সংগ্রামরত দণ্ডভোগকারী এবং বিজয়ী মণ্ডলীর এই ত্রিমাত্রিক স্তরের মধ্য দিয়ে আমরা বারবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য।

(৩) নৈতিক আচার-আচরণ

(ক) এর প্রকৃতি

আমাদের এ রকম চিন্তা করার একটা প্রবণতা আছে যে, আমরা ভাবি আমাদের শুরু করা উচিত নৈতিকতার অনুশীলন বা ভুল ত্রুটি সংশোধনের মধ্য দিয়ে, যেন আমরা নিজেদের শক্তিতেই এ সব করতে সক্ষম। আসলে আমাদের উচিত ঘটনা এবং অন্তরের রূপান্তর দিয়ে শুরু করা। নৈতিক আচরণ কোনও উদাহরণের পূর্বশর্ত হওয়া উচিত নয়, বরং তা হওয়া উচিত পরিণাম। ঘটনাবলির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে জানতে এবং অন্যদের কাছে তাঁকে জানাতে সক্ষম হই; রূপান্তরের মাধ্যমে আমরা তাঁকে ভালবাসি এবং অন্যদেরকেও ভালবাসতে শেখাই; খ্রিস্টের সাথে এবং খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে, অন্যদের সঙ্গে আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি এবং অন্যদের দিয়ে তাঁকে সেবা করাতে পারি। আমরা এই যা হয়ে উঠেছি, সেই ভাবে জীবনযাপন করাই হল খ্রিস্টীয় জীবন। তা হল একটি অনুকরণ, পুর্নজীবন, খ্রিস্টের সেই পার্থিব জীবনের ধারাবাহিকতা, যে জীবনে খ্রিস্ট অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন; অথবা অন্য ভাবে বলতে গেলে, আমাদের মধ্য দিয়ে 'ছুতোরের কাজ' করে যাচ্ছেন, যা আমাদের পিতার ইচ্ছা। সাধু পল তার মূল

পত্রাবলিতে প্রথমেই ব্যাখ্যা করেছেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং তাঁর অপরিমেয় দানের কথা, এই আশা নিয়ে যে, সকলে যেন আগমন-ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, যাকে তিনি খ্রিস্টের নিগূঢ় রহস্য বলেছেন এবং পরবর্তী অংশে, ঘটনার ফলশ্রুতি স্বরূপ, নৈতিক বিধিবিধানের অবতারণা করেছেন।

(খ) কীভাবে সেই জীবনযাপন করা যায়?

একত্রিত ভাবে আধ্যাত্মিক যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ়দেহের পূরক হই এবং পূর্ণতা লাভ করি; আমরা যা হয়ে উঠেছি সেই ভাবে জীবনযাপন করি, (দেখুন প্রবন্ধ; *"আমাদের জীবনে খ্রিস্টযাগ"*)। ঘটনা খ্রিস্টকে নিয়ে আসে আমাদের দৃষ্টির মধ্যে, অন্তরে আনে পরিবর্তন এবং খ্রিস্টীয় জীবন আনে আমাদের নাগালের মধ্যে। আমরা তাঁকে দেখতে পাই, তাঁকে ভালবাসি এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করি।

খ্রিস্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পাস্কার রহস্যে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তার শুরু হয়েছে আমাদের দীক্ষাস্নানের দিন থেকে; এই সব কিছু প্রতিনিয়ত আমাদের কাছ থেকে দাবি করে আমরা যেন পাপের দিক থেকে এবং আমাদের আমি-টার দিক থেকে মৃত হই এবং খ্রিস্টের সঙ্গে আবার পুনরুত্থিত হই। খ্রিস্টের আধ্যাত্মিক দেহের প্রতিটি সদস্য প্রতিনিয়ত এবং সর্বত্র খ্রিস্টযাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখন যে বিশ্বজনীন বলি উৎসর্গ করে, তা হল পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করা বা মেনে নেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি সন্তানোচিত আনুগত্যের যজ্ঞ, যার সঙ্গে উপাসনার কোনও যোগ নেই। তা হল একটি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান যা স্বয়ং খ্রিস্ট পরিচালনা করেন এবং সংগ্রামী নির্যাতিত ও বিজয়ী মণ্ডলী অংশগ্রহণ করে। এ হল একটি সক্রিয় যজ্ঞ, যার জন্য নেই কোনো বিধি-বিধান, প্রয়োজন হয় না কোনো মন্ত্র উচ্চারণেরও। সন্তানসুলভ ভালবাসার উপহার হিসাবে আমরা নিয়ে আসি আমাদের কাজ-কর্ম, ব্যাথা-বেদনা, প্রতিবেশীদের সেবা, যার প্রতীক হল রুটি ও দ্রাক্ষারস এবং তা খ্রিস্টের দ্বারা রূপান্তরিত এবং অসীম মূল্যে ভূষিত হয়ে বিনিয়োগ হয় ঈশ্বরের মহিমা ও সিদ্ধগণের মিলনের উদ্দেশ্যে।

উপসংহার

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'ঈশ্বরের বাক্যে গঠিত হয়ে' এবং ঐশ্বরিক মূল্যবোধে 'সংবেদনশীল' হয়ে আমরা বিধি-বিধানের আচারানুষ্ঠান অতিক্রম করে যেতে পারি এবং আক্ষরিক অর্থে নয় বরং বিধানের মূল ভাবনাকে অনুসরণ করতে পারি। এই ভাবে আমরা ত্রি-ব্যক্তির সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আনন্দ উপভোগ করব। আগমন-ঘটনার মাধ্যমে আমরা পিতার উপহার চিনতে পারব এবং তা গ্রহণ করব। পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা প্রীতিপূর্ণ অন্তরে পুত্রের দিকে ঘুরে দাঁড়াবো, যাতে আমরা আরও বেশি করে তাঁর সঙ্গে, তাঁর মধ্যে এবং পরস্পরের সঙ্গে, অনেকে এক হয়ে তাঁর মতো হতে পারি। ঘটনা এবং আমাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে পবিত্র আত্মা আমাদের নিয়ে যাবেন বাস্তব এবং সক্রিয় ও একত্রিত ভাবে খ্রিস্টযাগ উৎর্সগের জন্য।

প্রকৃত বাস্তববাদ

(১) আধ্যাত্মিক জীবনের তৃতীয় মাত্রা

মিশনারী আধ্যাত্মিকতার তিনটি দিক আছেঃ ঐশতাত্ত্বিক, জীবন-কাহিনী ভিত্তিক এবং বাস্তববাদী। প্রথমটিতে আমরা পাই সেই সব নীতি-তত্ত্ব, যা আমাদের কর্মে প্রয়োগ করতে হবে। ধর্মশিক্ষা শেখায় আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের অসীম ভালবাসার কথা এবং নৈতিক আধ্যাত্মিকতা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ভালবাসার প্রতি সন্তানোচিত সাড়া দিতে। দ্বিতীয়টি, যেটিকে ঐতিহাসিকও বলা যেতে পারে, আমাদের সামনে তুলে ধরে সাধু-সাধ্বীদের পবিত্র জীবনের উদাহরণ, যা আমরা আমাদের নিজ নিজ বিশেষ আহ্বান অনুযায়ী অনুকরণ করতে পারি। তৃতীয়টি হল, বর্তমান ঘটনা সমূহের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা খুঁজে বের করা, যদিও এই সব ঘটনা প্রায়শঃই প্রথম দিকে সমস্যা এবং বাধা মনে হয়। এই হল সেই আধ্যাত্মিকতা, যা দলগত ভাবে চর্চা করতে হয়।

(২) প্রার্থনা এবং কর্মের সমন্বয়

শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার কাজে পারদর্শী ফাদার ল্যু তার লেখা: "Comme S'il voyait l'invisible" *("অদৃশ্যকে যেভাবে দেখেছেন")* বইতে লিখেছেন যে, প্রার্থনা এবং কর্মের মধ্যে সঠিক যোগসূত্র হল বর্তমান ঘটনা সমূহ। "মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে পরমেশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে মানুষের পক্ষ থেকে মধ্যস্থতা করতে" (হিব্রু ৫:১) – এই কথার প্রেক্ষিতে, বাণীপ্রচারক এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যেখানে একদিকে রয়েছে ঈশ্বরের অভিপ্রায় আর অন্যদিকে নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যা তৈরী হয়েছে মানুষের সঙ্গে তার মেলামেশার ফলে। সেই একই ধর্মবিশ্বাসে ভর করে সে দৃঢ়প্রত্যয় রাখে আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য এবং ময়দার সঙ্গে খামির মিশ্রণে। সে জানে ঈশ্বর ঈশ্বরই, একমাত্র তিনিই অদ্বিতীয় এবং যে জমি কর্ষণ করা হবে সেখানে তিনি পিছন ফিরে না দেখে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করেন। সে জানে "দিনের জন্য যা যথেষ্ট তার অতিরিক্তটা অনিষ্টকর"। প্রচারকার্য এবং অন্তরাত্মার মধ্যে কোনও প্রকার দ্বিত্বতা প্রত্যাখ্যান ক'রে, দ্বাদশ পিয়ুসের শিক্ষা সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে: "তোমার প্রৈরিতিক কার্য তোমার অন্তরাত্মাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করবে এবং একই ভাবে তা পুষ্ট ও নবজীবন দান করবে"।

(৩) বাস্তবতার মধ্যে সম্ভাবনা

তবে এই সব বাস্তবতা নিয়েই প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকতে আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে, আর তা করা সহজও নয় বা তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয় না, যদিও মূলত তা অনায়াসসাধ্য। তাহলে আমাদের জীবনের সেই আংটা কোথায় যা আমাদের দুই প্রকৃতি জুড়ে রাখবে? একজন প্রেমময় স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে যতটা সংযুক্ত, একজন ঈশ্বরপ্রেমী ভক্ত কি তার চেয়েও বেশি সংযুক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে? এবং বেশির ভাগ স্নেহময়ী মাতা তাদের সন্তানদের প্রতি যতটা যত্নশীল, ঈশ্বর ভক্তরা কি তার চেয়েও বেশী যত্নশীল তাদের মানুষ ভাইদের প্রতি? সেই আংটা হ'ল বর্তমান ক্ষণ, যা ঈশ্বর এবং আমার কর্ম একসঙ্গে সংযুক্ত করে, এই মুহূর্তে ক্ষণস্থায়ী তথাপি সদা বিদ্যমান, আমাকে প্রদান করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে আমি পারলৌকিক জীবনের একজন অংশীদার হতে পারি।

(৪) মানবস্বভাবের মূর্খতা

পাস্কাল এমনটাই মনে করতেন। ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর সময়কার মানুষজনের প্রতি অকপটতার এক সুন্দর উদাহরণ ছিলেন তিনি। মানুষের অস্বস্তির কথা তিনি অতুলনীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন; মানুষ কেবলই ভবিষ্যত বা অতীত নিয়ে বিভোর: বর্তমান নিয়ে আমরা একদমই মাথা ঘামাই না। ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে বিলম্বিত, তাই ভবিষ্যতের আগমনে আমরা ত্বরান্বিত হই, বা অতীত নিয়ে আমরা জাবর কাটি যাতে তা শীঘ্র চলে না যায়। আমরা এতই মূর্খ যে, আমাদের আয়ত্বের বাইরে যে সময়, তা নিয়ে আমরা বিস্ময়াবিভূত হই। অথচ এই মূহুর্তে আমাদের কাছে যেটুকু পরিমাণ সময় আছে তা নিয়ে কদাচিত মাথা ঘামাই। এর কারণ সাধারণত বর্তমান আমাদের আঘাত দেয়। আমরা তা আমাদের দৃষ্টিগোচর থেকে লুকিয়ে রাখি কারণ তা আমাদের পীড়া দেয়, অথবা তা যদি উপস্থিত থাকেও, তবে তা নিঃসৃত হতে দেখে আমরা আক্ষেপ করি।

আমরা যদি নিজ নিজ চিন্তাধারা নিয়ে একটু ভাবি, তাহলে দেখতে পাব যে, আমরা প্রত্যেকে অতীত বা ভবিষ্যত নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমান নিয়ে আমরা কদাচিৎ মাথা ঘামাই, আর যদিও বা মাথা ঘামাই, তবে তা শুধু ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য। বর্তমান কখনই আমাদের সমাপ্তি নয়। কাজেই আমরা কখনো-ই বেঁচে থাকিনা বরং আমরা বেঁচে থাকার আশা করি এবং সবসময় সুখী থাকার পরিকল্পনা করি কাজেই এটাই বাস্তবতা যে, আমরা কখনই বর্তমানে বেঁচে থাকি না।

(৫) ঐশ্বরিক সমাধান

মহান পাস্কালের ঐ নির্মম সত্য কথাগুলি আমাদের ভাবিয়ে তোলে: অতীত ও বর্তমান এই যুগ্ম আকর্ষণ থেকে আমাদের কী তবে নিষ্কৃতি নেই? যিশু তাঁর ঐশ্বরিক পন্থায় আমাদের উদ্ধার করবেন; পাস্কালের চেয়ে আরও স্পষ্ট কিন্তু গভীর মর্মগ্রাহী বাক্য: "মৃতদের সমাধি দেওয়ার কাজটা মৃতদের হাতেই ছেড়ে দাও" (লুক ৯:৬০) – এই হল অতীত নিয়ে তাঁর কথা; "আগামীকাল নিয়ে চিন্তিত হয়ো না" (মথি ৬:৩৪) – এই হ'ল ভবিষ্যত নিয়ে তাঁর কথা।

যিশু কিন্তু শিক্ষা দিয়েই সন্তুষ্ট নন; ঐ দুটি বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার গোপন রহস্য তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। রহস্যটি খুবই চিত্তগ্রাহী: তা হল বর্তমান মুহূর্তে ঈশ্বরের উপস্থিতি। এই বিষয়ে যিশুর বাণী অসংখ্য, তা স্থিতিশীলতা ও শান্তি আনে। "যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করাই আমার আহার" (যোহন ৪:৩৪)। "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন, তিনি আমাকে একলা রেখে যাননি, কারণ যে সমস্ত কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই করে থাকি" (যোহন ৮:২৯)। এই ভাবে যিশু দেখিয়ে গেলেন আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে কিভাবে পূর্ণতা আসবে, সবসময় নতুন কিছু, রুটিন মাফিক একঘেয়েমির কোনও সম্ভাবনা নেই। সময় আমার কাছে খালি হাতে আসে না। প্রতি মুহূর্তে সময় আমার কাছে নিয়ে আসে নির্দিষ্ট কোনও কাজ: কাজ-কর্ম, প্রার্থনা, কথোপকথন, পড়াশুনা বা দলগত কাজ। কাজেই আমি এই সব ইশারা-ঈঙ্গিত, প্রার্থনা বা প্রীতি-ভোজের মধ্যে বাস করতে পারি এবং তাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক ভাবে যা দৃষ্টিগোচর হয় তা দর্শন করে এগুলি আমার কাছে যেভাবে আসে, তাদের আমি সেই ভাবেই গ্রহণ করতে পারি। অথবা এ গুলির বাহ্যিক চেহারার পিছনে দৃষ্টিপাত করতে পারি এবং এই সকল কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হচ্ছে, সে কথা ভেবে সব গ্রহণ করতে পারি।

(৬) বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দর্শন:

ঘটনা আমার কাছে নিয়ে আসে ঈশ্বরের উপস্থিতি, যা আমাকে দেওয়া ঈশ্বরের একটি উপহার। এই বর্তমান মুহূর্তটি আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে আমার কাছে ঈশ্বরকে নিয়ে আসে, তবে তা আসে কর্মের পরিধানে ভূষিত হয়ে, যে কর্ম সাধনের জন্য আমার সম্মতি চাওয়া হয়েছে। আমার বিছানা প্রস্তুত করা বা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা ও তাতে অংশগ্রহণ করা, আলুর খোসা ছাড়ানো বা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা, বাসের জন্য অপেক্ষা করা বা ধ্যানপ্রার্থনা করা, ঠিক সেই মুহূর্তে যে কাজ আমাকে করতে দেওয়া হয়েছে তা হল আমার জীবনে ঈশ্বরের সান্নিধ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটির পূর্বলগ্নে ঈশ্বরের দূত নাজারেথের কুমারীকে বুঝিয়ে বললেন: "পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি" (লুক ১:৩৫)। স্বর্গদূত ভাল করেই জানতেন যে, এই কথাগুলি মারীয়াকে স্মরণ করিয়ে দেবে মিশর দেশ থেকে নিষ্ক্রমণের সময় সেই মেঘস্তম্ভের কথা, যে মেঘস্তম্ভ ছিল পরমেশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন, কিন্তু অস্পষ্ট। তা স্মরণ করিয়ে দেবে নিয়ম সিন্দুকের উপর অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের মহিমার কথা।

কাজেই উভয় ঘটনাই কুমারী মারীয়া এবং আমাদের কাছে পরম মহিমান্বিত এবং সবচেয়ে সহজরূপে ধরা দেয়, পরমেশ্বরের সক্রিয় উপস্থিতি আমাদের সামনে আসে আমাদের সুপরিচিত কাজকর্মের আকার ইঙ্গিতের ছায়ায় লুকিয়ে, যা ঠিক এই সময় আমাদের সমাধান করতে বলা হচ্ছে। আমাদের প্রথম কাজ হল এই ব্যাপারটা বুঝতে পারা, তারপর তা অন্তর দিয়ে ভালবাসা এবং সযত্নে চর্চা করা। এই বর্তমান মুহূর্ত আমার কাছে ঈশ্বরকে নিয়ে আসে এবং তা এতটাই সত্য (যথোচিত অনুপাত সংরক্ষিত), কুমারী মারীয়ার ক্ষেত্রে দূতসংবাদের মুহূর্তে যেমন, তেমনি একই মুহূর্তে, যখন ঈশ্বর বলেন আমার চুল আচঁড়াতে।

(৭) ঐশ-ইচ্ছায় ঈশ্বরকে পাওয়া

এই প্রক্রিয়াটি এমন কোনও আধ্যাত্মিকতা নয়, যা আমরা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারি। বরং এটা শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির সাক্ষাতের স্বীকৃতি দান। তাহলে আমরা এই গভীর সত্যের মধ্যে বাস করব: ঈশ্বরের ক্ষেত্রে – ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছা অভিন্ন। এমনটা নয় যে, একদিকে ঈশ্বর তাঁর নিজের মধ্যে আছেন, আবার অন্যদিকে আছে আমাদের জন্য তাঁর কর্ম এবং পরিকল্পনা; এ যেন আমরা ঈশ্বর ও তাঁর সত্ত্বাকে ভালবাসি অথচ তার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করি। মানুষের ভালবাসার ক্ষেত্রে এমনটা সম্ভব যেখানে আমরা কাউকে খুব ভালবাসি। কিন্তু এই পৃথকীকরণ নৈর্ব্যক্তিক সত্তার ক্ষেত্রে সম্ভব না, কারণ তাঁরা যা এবং তাঁরা যা চান তা অভিন্ন। পরমেশ্বর বিশুদ্ধ প্রেম এবং যখনই তিনি নিজে এই প্রেম অন্যের কাছে নিয়ে আসেন, তিনি নিজে হয়ে ওঠেন সেই ব্যক্তির সৃষ্টিকর্তা বা সেই ব্যক্তির মধ্যে একজন। ঈশ্বর যা করেন বা সৃষ্টি করেন, তা প্রত্যাখ্যান করার অর্থ ঈশ্বরকেই প্রত্যাখ্যান করা। আমাদের জীবনদানের সময় আমাদের পিতা-মাতা এক মুহূর্তে যা করেছেন, ঈশ্বর প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি সৃষ্টির অস্তিত্ব বজায় রাখতে তাই করছেন। বর্তমান মুহূর্তে আমার অস্তিত্ব আছে, তার একমাত্র কারণ পরমেশ্বর তাঁর অস্তিত্বে আমাকে অংশ নিতে দিয়েছেন। ঈশ্বরের ভালবাসা সতত সক্রিয় এবং সুসংগত কারণেই ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি সতত সক্রিয়, পরিত্রাণকারী এবং পবিত্রকারী। আমার কাছে যা-উপস্থাপন করা হয় তার মধ্যে প্রকাশ পায় এই ভালবাসা। প্রতিটি মুহূর্ত হল সৃষ্টি, মানবদেহধারণ এবং পবিত্রআত্মার অবতরণের বহমান ধারা। কাজেই সবই কৃপা এবং বর্তমান ঘটনা হলো সেই কৃপার চিহ্ন – সাক্রামেন্ত।

(৮) আমাদের সহযোগিতা

বর্তমান মুহূর্তের গোপনরহস্য আমাদের জানা থাকলে কোন কিছুই আমাদের একঘেয়ে লাগবে না, এমনকি একাকিত্বও না এবং কোনও কিছুতেই আমাদের দুঃশ্চিন্তা হবে না, এমন কি আমাদের চরম দুর্দশায়ও না। আমাদের ভুলের পরিণতি যতই খারাপ হোক না কেন আমরা তা মেনে নিই, কারণ ঈশ্বর যদিও চান না আমরা পাপের মধ্যে পড়ি, কিন্তু তার পরিণতিতে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত এবং সংশোধন স্বরূপ যে বিশৃঙ্খলা ও কষ্টভোগ আমাদের করতে হয়, তা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। পাস্কাল বলেছেন, "ঈশ্বর যদি তাঁর পক্ষ থেকে কোনও শিক্ষাদাতা পাঠাতেন, তাহলে আমরা কত খুশি হয়েই না তাঁকে মেনে চলতাম!

প্রয়োজন ও ঘটনাসমূহ একই সত্য বলে। ফাদার কসেড ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে এই সর্বাত্মক সংযুক্তির বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি: "এই দুটো নীতি সর্বদা স্মরণে রাখবে: (১) কোনও কিছুই, তা যতই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হোক-না-কেন ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে ঘটে না।

এমন কি গাছের একটি পাতাও খসে পড়ে না। (২) ঈশ্বরের পুণ্য আজ্ঞা যারা নম্রতার সঙ্গে গ্রহণ করতে এবং ভালবাসতে জানে, তাদের জন্য আপাতঃ ক্ষতিকারক কোন ঘটনার মধ্য থেকে সুফল এনে দিতে ঈশ্বর যথেষ্ট প্রাজ্ঞ, যোগ্য, শক্তিমান এবং করুণাময়।

(৯) ঘটনাসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের বার্তা

আমাদের জীবনে ঘটনাসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করার অর্থ হলো, ঐশবাণীর সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগে প্রবেশ করা। সামসংগীত **১৩৯:২**..... "তুমি জান কখন যে উঠি আমি, কখন যে বসি, সবই জান তুমি; আমার মনের কথা দূর থেকে বুঝে ফেল তুমি" – অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, সাম রচয়িতার জগত অর্থপূর্ণ: সব কিছু সুসংহত, সুগভীর এবং সুনির্দিষ্ট।

যা কিছু অশুভ তার রহস্য বেদনাদায়ক এবং দূর্বোধ্য কষ্টভোগ হলেও – ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কাজেই আমরা এই মৌলিক প্রবণতায় জীবনযাপন করতে শিখি.... "তোমার বাণী তো আমার হৃদয়ে গেঁথেই রেখেছি যাতে তোমাকে না হারাই আমি" (সাম **১১৯:১১**)। লিখিত এবং ঘটনাসমূহে প্রকাশিত ঈশ্বরের বাণীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

"আহারই কর, পানই কর, আর যাই কর, পরমেশ্বরের মহিমা-প্রকাশের জন্যেই তা কর," (**১** করি **১০:৩১**)। সাধু পলের এ ছাড়া অন্যভাবে বাঁচার পথ ছিল না। এ কথা শুনে প্রথমে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি: মনে হয় যেন আমরা আমাদের সব চেয়ে স্বাভাবিক কাজ কর্ম থেকে বেড়িয়ে আসব। আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, ঈশ্বর যা প্রথমে চান তা - একাজ বা ওকাজ নয়, অথবা হীন কিংবা মহৎ যাই হোক না কেন - তিনি চান আমরা তাঁর ইচ্ছা, যা তিনি নিজেই তা পালন করি। "শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা - তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে" (মথি: ৫:৯)। এই শান্তি, যা আর সব অনুভূতি ছাপিয়ে যায়, তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে আমাদের নিজেদেরকে হতে হবে শান্তির মানুষ। ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে একাত্মতা আমাদের নিয়ে যাবে সেই "সুশৃঙ্খল প্রশান্তিতে"। এটাই হলো শান্তির যথার্থ সংজ্ঞা।

যিশুর হৃদয়ের ঐশতত্ত্ব

(১) ধর্ম বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ আছে
যা ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক জীবন সম্পর্কে লেখা হয়ে থাকে।
তবে আমাদের বিশ্বাস খুবই সরল ও সংক্ষিপ্ত
শুধু এই কথা: ঈশ্বর আমাদের কত ভালবেসেছেন!
ঈশ্বরও একটি কর্তব্যের কথাই বলেন:
তুমি তাঁকে ভালবাসবে তোমার সকল অন্তর ও প্রাণ দিয়ে!

ধুয়ো: সঁপে দাও, বলো, তাঁর মতো হতে চেষ্টা কর
যাতনা ও মৃত্যু দ্বারা পরিত্রাণ লাভ কর,
প্রিয়জনের সাথে একাত্ম হয়ে জীবনযাপন কর,
তাঁকে সন্তুষ্ট কর, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসো – তা কতই না মহৎ!

(২) সর্বদা সঁপে দেওয়া, দুঃখ না করে সমর্পণ করা,
প্রত্যেকের অন্তরে সেটাই তো সত্যিকারের আনন্দ;
আমাদের জীবনের অস্তিত্ব সে তো তাঁরই দান;
তাঁর সৃষ্টি তো তাঁর সত্যিকার রাজসিক উপহার,
তবে তিনি চান: তার প্রতিদানে, ভক্তির চিহ্ন রূপে
আমার তুষ্টির জন্য তুমি শুধু কর আত্মদান;
পূর্ণ স্বাধীনভাবে, উদার ক'রে, তুমি দান কর তোমার হৃদয়।

(৩) যাকে ভালবাসি তারই সাথে কথা বলার বাসনা করি,
ভালবাসা চায় প্রকাশ:
ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কতবার ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেছেন,
এটাই তো ঐশপ্রকাশের ঐশ্বর্য।
তোমার জন্য ঈশ্বরের সাথে কথা বলা হচ্ছে প্রার্থনা করা,
সুতরাং অক্লান্তভাবে সর্বদা প্রার্থনা কর;
"পিতা" বলে তুমি ডাক তাঁকে।

(৪) যে বলে তাঁকে ভালবাসে,
সে তো প্রিয়জনের মতোই হতে চায় যাকে সে ভালবাসে;
ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রমাণ করেছেন
মানব দেহধারণে নিজেকে অবনমিত করে।
তোমার কোমলপ্রাণ প্রমাণ করার জন্য একই পথ অনুসরণ কর:
যিশুর মধ্যে তোমার জীবনের আদর্শ দেখ;
পুনরায় উদ্ধার কর, অবিরাম সন্ধান কর
সর্বদা কথা বলতে থাক।

(৫) আমরা যাদের ভালবাসি তাদের জন্য জীবন দান করা,
এটাই তো ভালবাসার মহৎ প্রমাণ,
যিশুও তাই বলেছে এবং তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন,
আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে দান করেছেন।
অন্যেরা অন্তরে যিশুকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে,
কিন্তু তার জন্য নিজেকে তোমায় সমর্পণ করতে হবে,
প্রেরিতশিষ্যদের পদাঙ্ক আনন্দের সাথে অনুসরণ ক'রে এবং
সত্যিকারে ত্যাগস্বীকার ক'রে।

(৬) আমরা যাদেরকে ভালবাসি তাদের সান্নিধ্যে থাকতে চাই

তাদের ছেড়ে দূরে থাকা হবে বেদনাদায়ক
মৃত্যুর পূর্বে যিশু তার সমাধান দিয়েছেন,
পবিত্র সাক্রামেন্তে তার উপস্থিতি দিয়ে।
জীবনের সেই উৎসের কাছে কাছে থাক
তোমার চোখের আড়ালে থাকলেও
তোমার হৃদয়ে যিশুর সান্নিধ্যে থাক যিনি পবিত্র রুটিকায় অবস্থান করছেন।

(৭) ভালবাসা চায় অন্তরঙ্গ মিলন,
এটা হচ্ছে দু'টো অন্তরের একাত্মতা;
ঈশ্বর, যিনি তাঁর মহান ভালবাসায় আমাদের ভালবাসেন
তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মিলনপ্রসাদ।
আমার হৃদয়, এই জগতে তোমার স্বর্গ,
বাস্তব ও আত্মিকভাবে ঈশ্বরকে আলিঙ্গণ করো
খ্রিস্টপ্রসাদের মাধ্যমে রহস্যাবৃত আচ্ছাদনে।

(৮) যে-ব্যক্তি ভালবাসে সে কতদূর যাবে,
তার ভালবাসার ব্যক্তিকে তুষ্ট করার জন্য?
ঈশ্বর সেই অবিশ্বাস্য প্রমাণ দিতে চান;
এটাই হচ্ছে তার স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য – অপরিসীম ভালবাসা,
ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, এ জগতে তুমি তা করতে পার
পুষ্প ছড়িয়ে; সেটাই হোক তোমার বাসনা।
তাঁর মায়ের দৃষ্টির সামনে থেকে, তুমি তাঁকে কর পরিতুষ্ট।

প্রভুর দাসী

(১) মারীয়ার ভূমিকার গুরুত্ব

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ২য় অধিবেশনে গৃহীত ভোটের মাধ্যমে "খ্রিস্টমণ্ডলী" বিষয়ক প্রস্তাবিত খসড়ায়, ধন্যা মারীয়াকে আলাদা ভাবে আলোচনা না করে মণ্ডলীর মাতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে, মারীয়ার ভূমিকার গুরুত্ব মণ্ডলীর কাছে এবং ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষাদানে আমাদের মুক্তিদাতার মাতা মারীয়ার স্থান সম্পূর্ণ ভাবে নির্ধারণ করা হয় মুক্তির নিগূঢ়তত্ত্বে তাঁর অনন্য অংশগ্রহণের মাপকাঠিতে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, ঈশ্বর পুত্রকে দৈহিক জন্মদানেই তাঁর অবদান শেষ বা এই সত্য যে, মারীয়া গর্ভধারণ করলেন সেই "বাণী যা অনন্তকাল থেকে ঈশ্বর নিজের অন্তরে গোপন করে রেখেছিলেন" (এফেসীয় ৩:৯) এবং বাণী হলেন রক্তমাংসের মানুষ আর বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝে, ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যের পূর্ণতা নিয়ে" (যোহন ১ঃ ৯); বরং তা এ-ও সত্য যে, মানুষের কাছে পরমেশ্বরের সেই রহস্যাবৃত পরিকল্পনাটি রূপায়িত করার ক্ষেত্রে মারীয়ার রয়েছে মহৎ অংশগ্রহণ, কেননা তিনি একাধারে মুক্তিদাতার মাতা এবং ত্রাণকর্তার অতীন্দ্রিয় দেহের সবচেয়ে নিখুঁত অংশ। পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং স্বর্গধামে তিনি যে মহিমায় ভূষিত হয়েছেন তা বিবেচনা করে মারীয়াতত্ত্বের উদঘাটন হতে পারে এবং তাতে মারীয়ার প্রতি আমাদের প্রশংসা বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। তবে আদি খ্রিস্টানদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির মত, আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি, মানব জাতির মাতা ও আদর্শ এবং খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবে তাঁর স্বর্গীয় মহিমা এবং মারীয়াতত্ত্ব ব্যতিরেকে আরও তেমন কোন উপকারে আসবে না।

(২) অনুকরণ ঃ প্রকৃত ভক্তি

একদিন ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা বললেন: "ধন্যা কুমারী মারীয়াকে আমি কত ভালবাসি! আমি একজন পুরোহিত হলে তাঁর বিষয়ে কত সুন্দর করে বলতে পারতাম। তাঁকে দুর্লভ বলে দেখা হয়েছে, তাঁকে অনুকরণযোগ্য বলে গণ্য করা উচিত। কত সাদামাটা অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন!" মধ্যস্থতা এবং আবেদনমূলক ভক্তি ও বিশ্বাসের মূল্য নিয়ে কারও সন্দেহ থাকতেই পারে। কিন্তু যে ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে ধন্যা মা মারীয়াকে অনুকরণ করা হয়, তার মূল্য নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। খ্রিস্টান হিসাবে খ্রিস্টকে অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর হয়েও মানব-প্রকৃতি ধারণ করেছেন, সেই প্রেক্ষিতে তাঁকে হুবহু অনুকরণ না করার অজুহাত দেখানো যেতে পারে; মারীয়া ছিলেন রক্তমাংসের সাধারণ এক মানুষ, আমাদেরই মত একজন, যিনি ঈশ্বরের কৃপার সাথে সহযোগিতা করেছেন। তাই খ্রিস্টকে আরও গভীর ভাবে অনুকরণ করতে মারীয়াই হলেন আমাদের আদর্শ, আমাদের কাছের মানুষ।

(৩) মারীয়ার নম্রতা

মহাদূত গাব্রিয়েলের বার্তার প্রতি মারীয়ার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার মধ্যে যে নম্রতা ফুটে উঠেছে তা বাস্তব হলেও আমাদের কল্পনার অতীত। আমরা নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করে মারীয়ার থেকে নিজেদের বেশী নম্র মনে করি এবং মনে মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করি। আসলে আমরা যে পাপী, তা-ই আমাদের জন্য নম্র হওয়ার পথে বাঁধা স্বরূপ। নম্র হওয়ার অর্থ হল, মনে এই প্রত্যয় জন্মানো যে ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে একটি দূরত্ব রয়েছে – একটি সীমাহীন দূরত্ব। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধন্যা কুমারী মারীয়ার সঠিক জ্ঞান ছিল। তাই তাঁর নম্রতাও অসীম। অন্যদিকে আমরা যে পাপী সেই জ্ঞান লব্ধ করার অর্থ এই দূরত্বের কথা জানা, যে-দূরত্ব পাপবিহীন সত্তা এবং পাপযুক্ত সত্তার মধ্যে অবস্থিত; অর্থাৎ একটি সসীম দূরত্ব। তাছাড়া আমাদের পাপ আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করে, ঈশ্বরের প্রতি অন্ধ করে তোলে। কিন্তু আমাদের তুলনায় কুমারী মারীয়ার নম্রতা ছিল পূর্ণতাভরা এবং সেই জন্যই তিনি আপত্তি করেননি। আমরা হয়তো বলতাম, "অসম্ভব! আমি এখন প্রস্তুত না। আমাকে প্রস্তুত হতে দিন"। মারীয়া কিন্তু তা বলেননি। তিনি অত্যন্ত সরল মনে বললেন, "ঈশ্বর অদ্বিতীয়, ঈশ্বর মহানুভব, ঈশ্বর দয়াবান, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বর বলেই তাঁর এই দীনহীন দাসীর প্রতি এমনটি ঘটিয়েছেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই"। আমরা কিন্তু বাকরুদ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু তিনি যেহেতু ঈশ্বরকে জানতেন, তাই তিনি আশ্চর্য হননি। তাই তিনি পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন। সেই গেৎসিমানীর সম্মতি আর মারীয়ার হুবহু একই। "আমার জীবনে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। "আমার ইচ্ছা নয় বরং তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। এই হল আমাদের পৈত্রিক 'সম্মতি'। এরপর আমরা আমাদের মাতার মত হতে শুরু করি। আমাদের সবার কাছে সেই একই কথা উচ্চারণের আবেদন রাখা হচ্ছে।

(৪) মারীয়ার বিশ্বাস

ধন্যা কুমারী মারীয়ার মধ্যে আরো যা প্রশংসনীয় এবং একই সাথে আরো অনুকরণীয় তা হল তাঁর বিশ্বাস। তিনি যাপন করেছেন বিশ্বাসের জীবন। তিনি ঠিক আমাদের মতই জীবনযাপন করেছেন। প্রতিদিন তিনি সেই সব উদাহরণ দিয়েছেন, যা অনুসরণ করার আহ্বান আমাদের কাছেই আসে। "তুমিই সেই পুরুষ"। "তুমিই সেই নারী"। খ্রিস্টকে আমরা আমাদের বিশ্বাসের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না, যেহেতু মানুষ হিসেবে তাঁর মধ্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিলনা: তিনি সবকিছু দেখেছেন ও জেনেছেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ও জেনেছেন।

তুমি হয়তো বলবে: হ্যাঁ, ঠিকই; কিন্তু মারীয়া অমলোদ্ভবা হওয়ায় তাঁর তো ছিল বিশেষ সুবিধা। তবে একটু ভেবে দেখ, এর সঠিক অর্থ কী? অর্থ এই যে, তিনি দীক্ষাস্নানপ্রাপ্ত হয়েই মাতৃগর্ভে এসেছিলেন, গর্ভস্থ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই তিনি ঐশকৃপা লাভ করেছিলেন। আর তুমি তা লাভ করেছ তোমার জন্মের দু-তিন দিন পরে। তাঁর মধ্যে আদি পাপ ছিল না, তোমার মধ্যে এখন আর তা নেই। তবে মারীয়ার আরো বিশেষ সুবিধা ছিল। কী রকম? মৃত্যু থেকে রেহাই? না, তা নয়, দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি? না, তা-ও না। মারীয়ার বিশ্বাসের পূর্ণ ধারণা পেতে হলে সাধ্বী যোয়ান অফ আর্কের কথা স্মরণ করতে হবে। অনুরূপ একটি ঘটনা: ১৬ বছরের একটি তরুণী, একজন স্বর্গদূত ও দুজন সাধু তার কাছে একটি বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের বার্তা প্রকাশ করলেন, সীমিত একটি দায়িত্ব, বেশ জাগতিক-ও একটি দায়িত্ব: ফ্রান্স-কে রক্ষা করতে হবে। বেশ কথা! এই দায়িত্ব পালনের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করার আগে তিন বছর ধরে কথাটি তাকে বলা হচ্ছিলো। অন্যদিকে ধন্যা কুমারী মারীয়া, তাঁরও বয়স ১৬, সংসারের কাজে ব্যস্ত, একজন ছুতোর মিস্ত্রির বাগদত্তা, এক স্বর্গদূত তাঁর কাছে আর্বিভূত হলেন, স্বর্গদূত তাঁকে আরও অসম্ভাব্য ঘটনামালার কথা বললেন: তিনি মা হবেন, তিনি কুমারী থাকবেন, একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দেবেন, সেই পুত্র হবে জগতের ত্রাণকর্তা, অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব। তাঁর কুমারীত্ব যে অক্ষুন্ন থাকবে সে সম্বন্ধে শুধু একটি মাত্র বাক্য এবং মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলেন। মারীয়ার বিশ্বাস প্রকাশ পায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভরতায় এবং সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মারীয়ার পূর্ণ আত্মসর্মপণ ও সহযোগিতার উপর আস্থা রাখতে পারেন। এরপর যা ঘটবার তা-ই ঘটল। ঈশ্বরের আহ্বানে কেউ প্রশ্ন তোলে না, বা কারও স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না, যা ঘটবার তা সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে শুরু করে। মারীয়া বিচলিত হলেন, উদ্বিগ্ন হলেন, ভয় পেলেন। তৎক্ষনাৎ তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণা শুরু হলো। এখন প্রশ্ন হলো, ঈশ্বরকে তিনি কিভাবে চিনলেন? আমরা সবাই যেভাবে চিনি, সেই ভাবে - ঈশ্বরের দাবী দেখে। ঈশ্বর মারীয়ার থেকে সব কিছু আদায় করে নিলেন। ঈশ্বর তাঁর পাওনা, অর্থাৎ মারীয়ার সন্তানকে নিয়ে নিলেন। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মারীয়া দিনে দিনে ঈশ্বরকে চিনতে লাগলেন এবং তাই তিনি সব সময়ই বলেছেন: "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলছেন, আমার তা-ই হোক"। প্রথমেই তাঁর বাগদান বিসর্জন দিতে হল। মারীয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তাঁর গর্ভধারণ ছিল ঈশ্বরের গোপন বিষয়, ঈশ্বরের একান্ত নিজস্ব বিষয়। কিন্তু কী কঠিন পরীক্ষা, কী দুঃসহ বেদনা! বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষায় বশ্যতা স্বীকার করিয়ে ঈশ্বর যোসেফের জীবনেও প্রবেশ করলেন। যোসেফ মারীয়াকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করলেন না। মারীয়ার উপর বিশ্বাস তাঁকে ঈশ্বর বিশ্বাসের পথে চালিত করল। এই রহস্যাবৃত তত্ত্ব থেকে যোসেফ নিজেকে সরিয়ে নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অবশেষে এক স্বর্গদূত এসে তাঁর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মারীয়ার অলৌকিক গর্ভধারণই শুধু তাঁর কাছে প্রকাশ করা হল না, যোসেফকে এ-ও জানানো হলো যে জগতের মহান ত্রাণকার্যে ঈশ্বর তাঁর জন্য যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

মারীয়ার আনুগত্যের আরও একবার কঠিন পরীক্ষা নেওয়া হলো নিঃসঙ্গ এবং চরম দৈন্যদশার মধ্যে যিশুর জন্মের সময়। যিশুর জন্মের সময় মারীয়া যতটা দীন, ক্লান্ত এবং নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছিলেন, তেমনটি জীবনে আর কখনও করেননি। ঈশ্বর অবশ্য তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সঠিক সময় বেছে নিয়েছেন। এমনই এক সময় যা আমরা কখনই বেছে নিতাম না। স্বর্গদূতের সেই কথাগুলো নিয়ে মারীয়াকে আবার ভাবতে হল এবং পারিপার্শ্বিক বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিশ্বাস করলেন: "তিনি মহান হয়ে উঠবেন এবং যাকোব বংশের উপর রাজত্ব করবেন"। কিন্তু বেৎলেহেমে এরকম কোন আভাষ পাওয়া গেল না। আর সেই নিষ্পাপ শিশু বধ! ত্রাণকর্তার জন্মের প্রেক্ষিতে দুবছরের নীচে কত শিশুকে নির্মম হত্যা, সন্তানহারা হতাশাগ্রস্থ মায়েদের বুকফাটা হাহাকার! তাদের নিদারুণ যন্ত্রণা ঈশ্বর মাতার হৃদয় কত না বিধেঁছে! তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকা এবং সেই স্তোত্রগাথা আবৃতি করা সে তো এক বিরোচিত প্রয়াস: "যত নৃপতিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনেছেন, আর দীন মানুষকে বসিয়েছেন উচ্চ আসনে। তিনি তাঁর সেবক ইস্রায়েলের সহায় হয়েছেন; স্মরণে রেখেছেন তাঁর সেই চিরন্তন করুণার কথা"।

কিন্তু ঘটনা দেখে তেমনটি মনে হল না। ঈশ্বর কিভাবে এতগুলি শিশুকে মারতে দিলেন? কেন এতগুলি পরিবারকে ভেঙ্গে ছারখার হতে দিলেন? হেরোদের মত অত্যাচারী এক রাজাকে কেন শাসন করতে দিলেন? আমাদের কাছে এসব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমরা শিশু হত্যা পর্ব পালন করছি। কিন্তু সেই সময় তা কোন পর্ব ছিল না। মারীয়া ধৈর্য্য ধরে রইলেন। তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তাঁর চেয়ে বেশী ভাল বোঝেন। ত্রিশটি বছর পার হয়ে গেল। গোটা ত্রিশ বছরে কিছুই ঘটল না। তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন: কেন? সিমিয়োন যে বর্শার কথা ভবিষ্যতবাণী করে ছিলেন তা স্মরণ করে মারীয়া হয়তো মনে মনে ভাবছিলেন, যে যন্ত্রণাভোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা কি তার মত ঐশ প্রেম প্রত্যক্ষ করা একজন মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকবে? স্বয়ং ঈশ্বর তার গৃহে বাস করছেন, আর প্রসাদ সিন্দুকের প্রদীপ হয়ে মারীয়া একা তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন। তিনি কিছুই বললেন না বা কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করলেন না। তিনি নীরব রইলেন। তিনি জানতেন যিশু নীরব থেকেই জগতের মুক্তি আনতে পারবেন। ঠিক যেমনটি শিষ্যদের বিশ্বাস করা উচিত ছিল যে, জলমগ্ন নৌকায় ঘুমিয়ে থাকলেও যিশু তাদের রক্ষা করতে পারেন। মারীয়া ধৈর্য্য ধরে রইলেন। তিনি আশা ছাড়লেন না, ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে তিনি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন: এই বিফলতা আর এক অর্থে.... সফলতারই নামান্তর। ..... যদিও আমি সব কিছু বুঝতে পারি না, তবু আমি ঈশ্বরের এই কথায় বিশ্বাস করি: "তিনি মহান হয়ে উঠবেন, তিনি হবেন জগতের মুক্তিদাতা। পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই"।

প্রকাশ্য জীবন শুরু হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। শাস্ত্রে উল্লেখিত যিশুর কঠোরতম উক্তি তাঁর মায়ের প্রতি "কে আমার মা? যে কেউ আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা" (মথি, ১২ঃ৫০)। ঈশ্বরের চোখে জাগতিক বন্ধনের চেয়ে আধ্যাত্মিক বন্ধনই যে বেশী মূল্যবান, সেই বিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে মারীয়ার মধ্যে ছিল এবং যিশুর বাণী শুনে, তাঁর শিক্ষা দেখে এবং দিনে দিনে তাঁর সঙ্গে মননে ও মরমে একাত্ম হয়ে সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

কালভেরীতে মারীয়াকে ঈশ্বরের আহ্বানে তার 'হ্যাঁ' ফিয়াৎ বলা এবং তার আনুগত্য সবচেয়ে বেশী দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে হয়েছিল, যদিও যা কিছু ঘটছে তার সবটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। পৃথিবীতে যে দুজনকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন, সেই পিতা এবং পুত্রের মধ্যে তিনি বৈপরিত্য স্পষ্ট দেখতে পেলেন। "ঈশ্বর আমার! ঈশ্বর আমার! কেন আমায় পরিত্যাগ করেছো" – এ যেন মারীয়ার বিশ্বাস ও আশার গভীরে একটি ফাটল। কিন্তু তিনি বিশ্বস্ত; অন্তরের অন্তস্থলে এই সত্য উপলব্ধি করতেন যে, যা ঘটছে তা মঙ্গলকর, কল্যাণকর, ভবিতব্য এবং ঈশ্বর নির্ভুল। তিনি ঐশ যজ্ঞের একজন অংশগ্রহণকারী এবং এখন শুধু এই কথা বললেই হবে না: আমি ঈশ্বরের দাসী, (যা বলা সহজ), বরং এখন বলতে হবে; আমি ঈশ্বরের ভৃত্য, যিশুর জীবনে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এই হল মারীয়ার দ্বিতীয় সম্মতি, যা যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ। কালভেরীতে তিনি প্রকৃত জননী হয়ে উঠলেন। তখনই একজন প্রকৃত মাতা হয়ে ওঠেন যখন তিনি জীবন দেন এবং সন্তানের সব চিন্তা, ইচ্ছা ও কাজের সঙ্গে নিজেকে এক করে নেন। কালভেরীতে খ্রিস্টকে তিনি পরিত্রাণের কাজে এবং তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মারীয়া সম্মতি দিলেন এবং তাঁর সম্মতির ফলে তিনি হয়ে উঠলেন সহ-পরিত্রাতা, পরিত্রাতা এবং পরিত্রাণপ্রাপ্ত উভয়ের-ই মাতা। ধন্যা কুমারী মারীয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা যদি তাঁকে এমনই এক উচ্চ-আসনে বসাতাম যে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন মিল-ই থাকত না, তবে তা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হ'ত। মারীয়া আমাদের কাছে শুধুই ঈশ্বরের পরম এক বিস্ময় নন। তিনি জননী – আমাদের মা। তিনি চান ছেলেমেয়েরা হবে তাঁরই মত, যারা ঈশ্বরের দাস বা দাসী হতে সম্মত। ছেলেমেয়েরা যদি মায়ের মত হতে চায় তাহলে মায়ের কাছে তার চেয়ে বেশী আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। মারীয়ার জীবনে অসাধারণ কিছু ছিল না। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করা যায়। তিনি বিনয় এবং বিশ্বাসে নিখুঁত ঐশপ্রেমের নিদর্শন। আমাদের প্রত্যেককে জন্ম দিয়ে তিনি চান আমাদের একটু একটু করে তাঁরই মতো গড়ে তুলতে, যাতে আমরা একদিন নিশ্চিতভাবে খ্রিস্টের মতো আরও অনেক অনেক খ্রিস্ট হয়ে উঠতে পারি।

(৫) আমাদের প্রৈরিতিক কাজে মারীয়ার উপস্থিতি

মারীয়া এখন কোথায় আছেন? একথা মনে করবে না যে, ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গের রাণীর মুকুট পরিয়ে দেবার পর তিনি এখন অনন্তসুখ ভোগ করছেন। তিনি যখন রাণী, তখন তিনি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাণী, এই পৃথিবীরও রাণী এবং যেহেতু, প্রথমতঃ তিনি মা তার পরে রাণী, তাই এই অশ্রুবিধৌত পৃথিবীতে তাঁর শোকাতুর সন্তানদের তিনি চিরসহায় ছাড়া আর কী বা হতে পারেন। স্বর্গনিবাসী কেউ যদি পৃথিবীর মঙ্গল করে থাকেন, তাহলে তিনি ধন্যা মা মারীয়া এবং তারও আগে যার নাম করতে হয়, তিনি তাঁর ঐশপুত্র যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি "। খ্রিস্ট এবং তাঁর মনোনীত জনেরা এখনও পূর্ণ সক্রিয়। ধন্যা মা মারীয়া একাধিক দর্শনে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সন্তানদের পবিত্র জীবনযাপনের জন্য তাঁর কত আগ্রহ। 'সিদ্ধগণের সমবায়' এর অর্থ হল এই: যারা এই জীবনের সৎকর্মের গুণে একদিন স্বর্গলাভ করবে সেই সকল পুণ্যাত্মারা স্বর্গনিবাসী সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তির জন্য লড়াই করবে। এরা উভয়ে মিলে গঠন করে বিশ্বের পবিত্রবাহিনী। আমাদের সব রকমের সেবামূলক এবং প্রৈরিতিক কাজে মারীয়া হলেন একজন ক্ষমতাশালী সহায়। আমাদের সবসময় তাঁর সান্নিধ্য কামনা করা উচিত এবং ইস্রায়েলীয়দের পরাক্রান্ত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে ঈশ্বর-প্রেরিত দেবোরাকে বারাক যেমন বলেছিলেন, আমাদেরও তেমনি ধন্যা মারীয়াকে বলা উচিত: "তুমি আমার সঙ্গে গেলে, আমি যাবো"। ধন্যা মারীয়া এখন সেই নারী যাকে ঈশ্বর পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত করেছেন শয়তান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় এনে দিতে।

(৬) আমাদের পবিত্রীকরণে মারীয়ার সহযোগিতা

ধন্যা মা মারীয়ার ভূমিকা হল আমাদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনা করা। ঐশ করুণার মাতা ধন্যা মারীয়ার উপর ন্যস্ত হয়েছে আমাদেরকে খ্রিস্টের অনুকরণে গড়ে তোলা, গৌরবময় খ্রিস্টমণ্ডলীর সক্রিয় অংশীদার করে তোলা এবং দিনে দিনে খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের একাত্ম হয়ে উঠতে সাহায্য করা। দীক্ষাস্নানে আমরা হয়ে উঠেছি ঈশ্বর-সন্তান, লাভ করেছি 'প্রথম জাত' - ও সেই ঐশজীবন; বাস্তবিক আমরা অপর খ্রিস্ট হয়ে উঠেছি। এই যে ঐশজীবন আমাদের মধ্যে বীজের মত রোপন করা হয়েছে, তা আমাদের সহযোগিতা ছাড়া বেড়ে উঠবে না। কথায় নয় কাজে আমাদের খ্রিস্ট হয়ে উঠতে হবে; পুরানো আমি-টাকে ঝেড়ে ফেলে নতুন আমি-টাকে পরিধান করে নিতে হবে। আমাদের এই দৈব গর্ভাবস্থা চলবে অনন্তজীবনে প্রবেশ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এবং পরম পিতা আমাদের গ্রহণ করবেন না যদিনা আমরা খ্রিস্টে রূপান্তরিত হই ও খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠি। আমাদের এই কঠিন প্রচেষ্টায় যিনি সাহায্য করবেন, তিনি হলেন আমাদের স্বর্গীয় মাতা। কারণ তিনি যে শুধু যিশুর পার্থিব জীবন ধারণ করেছেন এবং তাঁকে জন্ম দিয়েছেন তা নয়, বরং আমরা দীক্ষাস্নানে যে ঐশ করুণা ও জীবন লাভ করেছি, তিনি নিজে যে মুহূর্তে মাতৃগর্ভে এসেছিলেন সেই মুহূর্তে সেই একই করুণা ও জীবন লাভ করেছেন এবং তার পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সেই ঐশ বীজের বেড়ে যাওয়ার পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তিনি ধারণ করেছেন যিশুর আধ্যাত্মিক জীবন এবং ধীরে ধীরে যিশুর সঙ্গে একমন এক আত্মা হয়ে উঠেছেন। স্বর্গারোহনের সময় মারীয়ার যে পার্থিব দেহ ছিল, তার সঙ্গে সবচেয়ে নিখুঁত সাদৃশ্য মেলে যে-কোনও পার্থিব দেহধারী মানুষের সঙ্গে। আমরা তো তাঁরই সন্তান, এমন কি পাপীরাও, কিন্তু আমরা যতক্ষণ না যিশুর সমরূপ হয়ে উঠছি ততক্ষণ আমরা তার পূর্ণ সন্তান হয়ে উঠব না, এবং সেই পূর্ণতার বাস্তবরূপ দিতে মা মারীয়া আমাদের জীবনে উপস্থিত আছেন। তার প্রধান আকাঙ্খা সাধু পল উল্লেখিত এই বাণীর চাইতেও বলিষ্ঠ: "আমার স্নেহের সন্তানেরা খ্রিস্ট যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে জন্ম নেন, ততক্ষণ আমি তোমাদের নতুন করে জন্ম দিয়ে যাব"।

কাজেই আমাদের ধন্যা মা মারীয়াকে অনুকরণ ক'রে, বিশেষতঃ তার নম্রতা ও বিশ্বাস অনুকরণ ক'রে এবং আমাদের প্রৈরিতিক কাজে ও আমাদের নিজেদের পবিত্র জীবনযাপনে তাঁর উপস্থিতি ও সহায়তার কথা স্বীকার ক'রে, আমরা এই বিশ্বাস করতে পারি যে, মারীয়ার মধ্যস্থতায় আমরা যিশুর কাছে পৌঁছতে পারব এবং যিশুর মধ্য দিয়ে পবিত্র ত্রিত্বের কাছে পৌঁছে যাব।

কার্যকরী আধ্যাত্মিকতা

(১) মারীয়ার চেয়ে মার্থাই আমাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য আদর্শ

কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না যে, বস্তুনিষ্ঠ ভাবে প্রার্থনা কর্মের চেয়ে মহত্তর। প্রার্থনা নিবেদন করা হয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে কর্ম জড়িত থাকে প্রাণীকুল ও মানুষকে নিয়ে। খ্রিস্ট যেমন বলেছেন আমাদের অবশ্যই, "অবিরাম প্রার্থনা করে যাওয়া উচিত কখনো নিরাশ হয়ে পড়া উচিত নয়" (লূক ১৮ঃ১)। আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার জন্য যিশুর নির্দিষ্ট সময় ছিল; তিনি তখন জনতার কাছ থেকে দূরে সরে যেতেন, মাঝে মাঝে তিনি সারা রাত প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে, আমাদের জীবনাবস্থা অনুসারে দায়িত্বের অংশ হিসেবে, দিনের বেশির ভাগ সময় কাজ করা ও কাজে সক্রিয় থাকা আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার চেয়ে অধিক বাঞ্চনীয় বলে মনে হয়। এমন কি সন্ন্যাসব্রতীর জীবনে দেখা যায় যে, দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ২ ঘন্টার বেশি প্রার্থনা করা হয় না। ভক্তজনগণের জন্য প্রার্থনার সময় আরও কম। প্রার্থনা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হলে কাজকে প্রার্থনাময় করে তুলতে হবে। আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে যে কাজ করা হয়, সেটা তো কর্মময় প্রার্থনা হয়ে যায়। সাধু জন খ্রিসোস্তম, মঙ্গলসমাচারে উল্লেখিত মার্থার সম্পর্কে বলেছেন যে, আমাদের প্রভু, মার্থাকে তার আতিথ্যের জন্য তিরষ্কার করেননি, বরং যে কাজ তুলনামূলক ভাবে কম প্রয়োজনীয়, সেই কাজের জন্য অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হওয়ায় যিশু অভিযোগ করেছেন।

কোন ধর্মীয় সম্মেলন শুরু করার আগে ঈশ্বরের বাণী পাঠ করা উচিত, কেননা যিশু খ্রিষ্ট নিজে হচ্ছেন ঐশবাণীর দেহধারণ। বেথানিয়ার পরিবার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ঘরের কাজের পরেও তো দুই বোন একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারতো। সাধু এফ্রেম মারীয়ার চেয়ে মার্থার সেবা শ্রেয় মনে করেন, কারণ অতিথিবরণ করতে মার্থাই তো সবসময় প্রথমে এগিয়ে আসত। প্রভু যিশু নিজেই তো বলেছেন যে, পাওয়ার চেয়ে দেওয়া তো অনেক শ্রেয়। তারা দু'জনেই সিদ্ধ কুমারী; স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা হয় যে, মার্থা কাজের মাধ্যমে তার পবিত্রতা লাভ করেছে এবং মারীয়া করেছে ধ্যান প্রার্থনার মাধ্যমে। তাই কর্মব্যস্ত খ্রিস্টভক্তদের কাছে মার্থাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য আদর্শ বলে মনে হয়।

(২) সকল প্রৈরিতিক কাজের মূল বিষয়

ডম চৌটার্ডের মূল চিন্তা ছিল এই যে, আন্তজীবনই হল সকল বাণীপ্রচারকদের প্রাণসত্তা। তিনি তার গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, অনেক সময় অতি উৎসাহী ব্যক্তিরা অতিমাত্রায় কাজ করে ও ব্যস্ত থাকে। এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর, কর্মব্যস্ততায় বেশি ঝুঁকে পড়লে নিজের পবিত্রতা অর্জনের জন্য অবহেলা করা হয়। তার মতে, সকল শুভকর্ম আন্তজীবন থেকে উৎসারিত হওয়া উচিত। তা না হলে প্রার্থনা-জীবনে যা অর্জন করা হয়, তা কাজের মধ্যে সীমিত করে রাখা হবে, যার ফলশ্রুতিতে প্রৈরিতিক আগ্রহ হ্রাস পাবে। এ কথা সত্য যে, "আমার কাছে যা নেই, তা দেব কি করে"? কিন্তু মানুষ কর্মপ্রচেষ্টার ফলে নৈতিক উন্নতি লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে লেখকের গবেষণাটির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। সঙ্কল্পের উৎকর্ষতা ঈশ্বরের দয়া থেকেই আমাদের কাছে আসে। প্রথমেই ঈশ্বরের করুণার উপর বিনীত নির্ভর করার প্রবণতা থাকতে হয়; ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম বাণীপ্রচারকদের সকল প্রৈরিতিক আহ্বান ও সকল কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, আন্তজীবন বাণীপ্রচারকদের প্রাণ হলেও, প্রেম-ই হল তাদের হৃদয় ও আত্মার চালিকা শক্তি।

প্রচারকার্যে কর্মরত কাথলিক একশন গ্রুপের কিছু তরুণ-তরুণী ডম চৌটার্ডের-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, যে-আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণ ভাবে ধ্যান-প্রার্থনার ওপর ভিত্তি ক'রে (অন্ততঃপক্ষে মনে ও বাসনায়) তিনি লিখেছেন, বিশেষ করে পুরোহিত এবং খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের জন্য, তার বাইরে এমন কোনও আধ্যাত্মিকতা আছে যা কর্মকাণ্ডকে ভিত্তি করে গঠিত হয়, যা একটি মরমী সাধনা হয়ে ওঠে, যা এমন একটি কর্মমুখী আধ্যাত্মিকতা যা পবিত্রতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি না ক'রে বরং সহায়ক রূপে কাজ করে? সিস্টারসিয়ান সংঘের এই সন্ন্যাসী গভীর ভাবে চিন্তা করে বললেন, "নিশ্চয়ই, কর্ম-ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতাও আছে; কিন্তু আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সেই বিষয়ের উপর বই লেখা এখন সম্ভব নয়"। এরপর থেকে অনেকেই এই বিষয়ের উপর লেখালেখি করতে শুরু করেছেন। (ফাদার লালাণ্ড, "মূলে পরিবর্তন", ফাদার লোয়ে, "অদৃশ্যকে যেভাবে দেখ", ফাদার কংগার, "খ্রিষ্টভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতা", ইত্যাদি)। খ্রিষ্টভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতা থেকে যাজক ও ধর্মব্রতী নর-নারীরা শিখতে পারেন যে, তাদের কর্মব্যস্ত জীবনও সিদ্ধিলাভের একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

(৩) কর্ম কীভাবে পবিত্র হওয়ার উপায় হতে পারে?

ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কোন একটি বিশেষ স্থানে, যেমন যাকোবের কুয়োর কাছে, বা কোন বিশেষ ক্ষণে, যেমন ষষ্ঠ প্রহর, ইত্যাদির মধ্যে সীমিত থাকে না। এমন কি তা সীমাবদ্ধ থাকে না আত্মমূল্যায়ন, বা ধ্যান-প্রার্থনার মধ্যে, বরং তা অনুভব করা যায় খ্রিষ্টভক্তের শুভ কর্মে ও যে-কোন মুহূর্তে। প্রত্যেকটি বছর যেমন ঐশ অনুগ্রহের বছর (প্রভুর বছর), তেমনি যে-কোন দিন, যে-কোন ঘটনা, যে-কোন মুহূর্ত ঐশকরুণায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। একজন প্রেরণকর্মীর কর্ম ঐশজীবনে উন্নতি লাভ করার একটা সুযোগ, একটা উপায় হয়ে উঠতে পারে, অবশ্য সেই কর্ম যদি ঈশ্বরের কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয়।

(৪) পরমেশ্বরের দ্বিবিধ কর্মকাণ্ড

পরমেশ্বর সতত পরম সুখময় ধ্যানে মগ্ন। সৃষ্টির শুরু থেকেই তাঁর ধ্যানময়তা দ্বিমাত্রিক। তাঁর মূল ও চিরন্তন ধ্যানময়তাকে "প্রভাতী" ধ্যানময়তা রূপে অভিহিত করা হয়েছে। "নীতিগত" অর্থে এই ধ্যানময়তার কোন শুরু নেই, তা কালাতীত ও চিরন্তন। পিতা পরমেশ্বরের পূর্ণ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে বাক্যে, অর্থাৎ বাক্য দেহধারণ করল পুত্ররূপে – যিনি স্বয়ং পিতার সমতুল্য; পিতা ও পুত্র উভয়ের কাছ থেকে আগত হচ্ছে প্রেম, যার ব্যক্তি-নাম পবিত্র আত্মা। এই ধ্যানময়তা হল অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, পরম সুখময়তা এবং অনন্তকালীন মহিমা। সৃষ্টির পরে পরমেশ্বর নিজের ধ্যানময়তা প্রকাশ করেন তাঁর বিচিত্র প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে; প্রতিটি প্রতিমূর্তি তাঁর ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, মঙ্গলময়তা ও সৌন্দর্যের আংশিক দিক প্রকাশ করে। বিশেষ করে তিনি প্রকাশ করেন মানুষের মাধ্যমে, যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে। তাঁর "সান্ধ্যকালীন" ধ্যানময়তায় তিনি উপলব্ধি করেন বাহ্যিক, দৃশ্যরূপ, 'উপচে পড়া' এক পরমানন্দ, বাইবেলে যার উল্লেখ করা হয়েছে সৃষ্টির দিনগুলির প্রতিদিনের সমাপ্তিতে: পরমেশ্বর দেখলেন, তাঁর (হাতের, অর্থাৎ ইচ্ছাপ্রসূত) কাজ ভালই হয়েছে (আদি ১)। তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়া সতত বহমান রেখেছেন মনুষ্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে (কোনকিছুরই থেকে সৃষ্ট নয়)। সৃষ্ট সকল বস্তুর সংরক্ষণার্থে প্রয়োজন সেই একই শক্তিমত্তা, যে শক্তিমত্তা তাদেরকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সৃষ্টবস্তুর ক্রমবিকাশার্থে এবং প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারার্থে, পরমেশ্বর মানুষের উপর ভরসা রেখে সকল বিশ্বভ্রমাণ্ডের উপর প্রভুত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; তিনি মানুষকে বসিয়েছেন জৈব, অজৈব এবং প্রাণীকুল- এই ত্রিমাত্রিক সাম্রাজ্যের সিংহাসনে। কাজেই পরমেশ্বরের সহকর্মী রূপে মানুষ তার কার্যকলাপ সম্পন্ন করে থাকে।

(৫) মানুষের দ্বিবিধ ধ্যানময়তা

বিশ্বাসের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত ক'রে, আমরা তাঁর ধ্যানময়তা অনুকরণ করতে পারি, যেখানে ঈশ্বর আমাদের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা, যেমন, খ্রিষ্টযাগ, মননধ্যান, মন-পরীক্ষা, আধ্যাত্মিক পাঠ, নীরবতা, ধ্যানসভা, প্রভৃতি সময়ে উপস্থিত থাকেন। এই সময়ে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলি, তাঁর প্রেরণাবাণী শুনি বা শুধুই বসে থাকি তাঁর দৃষ্টিগোচরে। তিনি নিরন্তন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকেন: "তুমি সর্বদা আমাদের প্রতি প্রেমের দৃষ্টি রেখে চল" যেমন বালক যিশু ভক্তা সাধ্বী তেরেজা বলেছেন। প্রার্থনার এই সবল মুহূর্ত ছাড়া, আমরা যখন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, তখন আমরা "ঈশ্বরের জন্য প্রার্থনাময় কর্ম" অথবা "পরিব্যাপ্ত প্রার্থনা", "প্রচ্ছন্ন প্রার্থনা", সম্পাদন করতে পারি। এটা হল "সান্ধ্যকালীন" ধ্যানময়তা, যার মানে হচ্ছে ঐশকর্মের মধ্যে তাঁকে দেখা, তাঁর জীবন্ত প্রতিমুর্তি যে মানুষ, তার মধ্যে তাঁকে সাক্ষাৎ করা এবং প্রতিনিয়ত তাঁর সৃষ্টিকর্মে সহকর্মী হয়ে কাজ করা; এই প্রার্থনা নিয়ে আসে জগতের উন্নয়ন এবং ইহজীবনের নবীকরণ।

এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্গধামে উভয় ধ্যানময়তা একসঙ্গে চলমান থাকবে। কিন্তু এই ধরাধামে, যদিও আশান্বিত হয়ে ভালবাসার উষ্ণতায়, বিশ্বাসের অন্ধকারে সরাসরি ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে আমাদের স্বর্গধামের সূচনা হয়, তথাপি আমাদের অতিপ্রাকৃত বোধশক্তির দ্বারা ঈশ্বরের স্পষ্ট দর্শন, কেবলমাত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়েই অনুভব করা হয়। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এবং তাইয়ার্ড দ্য সারদেঁ'র দর্শন ও বিবেচনা অনুসারে, জগত প্রকৃতি ছিল ঐশমহিমার উৎস স্বরূপ; যার ফলে তাঁরা সূর্য এবং বিশ্বব্রাম্মাণ্ড নিয়ে প্রভুর জয়গান করতেন কারণ তারা সবকিছুকে দেখেছেন খ্রিস্ট যিশুর আলোকে যিনি ছিলেন জগতের আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত। আমরা ঈশ্বরের এবং খ্রিস্টের সুস্পষ্ট উপস্থিতি দেখি তার সকল জীবন্ত প্রতিমূর্তির মধ্যে অর্থাৎ তাঁর সকল ভাইবোন ও বন্ধু, সাধু-সাধ্বী ও পাপীদের সমাজে; যখন তারা যিশুর নামে একত্রিত হন তখন যিশু তাদের মাঝে বর্তমান, যদিও দৈহিক ভাবে তাদের মধ্যে আছে বিচ্ছিন্নতার দূরত্ব।

(৬) ত্রিব্যক্তি রূপে ঈশ্বরের কর্মক্রিয়া

কথায় বলে, কর্মে কর্তার পরিচয়। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রত্যেকজনের নিজ নিজ কর্ম রয়েছে। পিতার কাজ সৃষ্টি করা, মানবদেহধারী পুত্রের কাজ মানবপরিত্রাণ সাধন করা এবং পবিত্র আত্মার কাজ পবিত্রীকরণ করা। মানুষের মাঝে এই প্রেমপূর্ণ কর্মক্রিয়া সদাসর্বত্রই বিরাজমান; ফলতঃ সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া অনুগ্রহ। এই ঐশক্রিয়ার ধারা, সৃষ্টি, মুক্তি এবং পবিত্রীকরণের কাজের মধ্যে অবিরাম চলছে।

(৭) খ্রিস্টে আমাদের ত্রিবিধ ভুমিকা

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের অঙ্গ হয়ে উঠেছি; হয়েছি অপর খ্রিস্ট। খ্রিস্টেরই সঙ্গে, খ্রিস্টেরই মধ্যে, প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত হয়েছে রাজা, যাজক এবং প্রবক্তা (শিক্ষক)। একজন খ্রিস্টভক্ত রাজা, কারণ সে প্রকৃতির শক্তির উপর কর্তৃত্বভার লাভ করেছে; তবে ইহজীবনে সে সকলের সেবক – সে ভাইয়ের পা ধুইয়ে দেয়। একজন খ্রিস্টভক্ত যাজক, কারণ খ্রিস্টের সঙ্গে এবং তাঁর ভাই-পুরোহিতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে প্রভু যিশুর পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞ উৎসর্গ করে, যার প্রকাশ যিশুর তেত্রিশ বছরের আনুগত্য। একজন খ্রিস্টভক্ত প্রবক্তা বা শিক্ষক – কারণ সে জীবন্ত ঐশবাণী; তার কাজ, কথা ও আধ্যাত্মিক প্রভাব দ্বারা অন্যের কাছে মঙ্গলবার্তা হয়ে ওঠে।

(৮) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ধ্যানময়তা: ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সহকর্মী

পিতার সঙ্গে সহকর্মী হয়ে, পুত্রের সঙ্গে মধ্যস্থ এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে "কথন" হয়ে আমরা আমাদেও ত্রিবিধ ভূমিকা সম্পন্ন করি। পিতার সঙ্গে রাজা হয়ে প্রকৃতির ত্রিবিধ রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করি, তবে সকল ভাইবোনদের মাঝে খ্রিস্টের সেবা করি।

পুত্রের সঙ্গে আমরা প্রেমপূর্ণ আনুগত্যের যজ্ঞ উৎসর্গ করি, নৈবেদ্য হিসেবে অর্পণ করি আমাদের প্রার্থনা, কাজকর্ম, দুঃখকষ্ট ও আনন্দ, যা খ্রিস্টযাগে প্রতীকরূপে প্রকাশ পায় রুটি ও দ্রাক্ষারসের মাধ্যমে এবং যা খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয় ঈশ্বরের মহিমা এবং মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য। আমরা খ্রিস্টের দেহ পুষ্টিকর খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, যে খাদ্য হচ্ছে প্রভুর ইচ্ছা পালন করা। পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমরা হয়ে উঠি অনুগত এক হাতিয়ার স্বরূপ – তাঁর মুখপাত্র, প্রাণবায়ু, উষ্ণতা, আগুন, যা পৃথিবীর সবপ্রান্তে বিস্তার লাভ করবে এবং দূরের ও কাছের মানুষের সকল কাজ ও প্রভাব পবিত্র করে তুলবে।

"সান্ধ্যকালীন" ধ্যানময়তার মাধ্যমে আমরা সর্বদাই ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসতে পারি এবং তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারি। ঈশ্বর তাঁর তৃষ্ণা মেটাতে অর্থাৎ আমাদের কর্মময় ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর তৃষ্ণা মেটাতে এবং তাঁর কাছ থেকে জীবনদায়ী জলের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে, তিনি আমাদের সতত আহ্বান করেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমাদের সকল বাসনার অগ্রবর্তী হয়ে চালিত করে। ঈশ্বরের সাথে এক হওয়ার জন্য কাজকর্ম থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে না। ঈশ্বরের দিকে শুধু তাকিয়ে থেকে নয়, বরং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে কাজ করলে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করব। পারস্পরিক প্রয়োজন পার্থক্যের পরিমাণ হ্রাস ক'রে ফেলে। আমরা আসলে ত্রিমাত্রিক মণ্ডলীর মধ্যে একযোগে কাজ করছি।

এই হল কার্যকরী আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব। এর অনুশীলন কঠিন। কিন্তু আমাদের এক শতাংশ প্রচেষ্টার সঙ্গে ঈশ্বর তাঁর নিরানব্বই শতাংশ অনুগ্রহ দান করতে সদা প্রস্তুত। সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত দান হিসেবে সফলতা দেওয়া হবে।

ইচ্ছার সিদ্ধতা

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা কি প্রাচীনপন্থি বা প্রগতিশীল, রক্ষণশীল বা মুক্তচিন্তাবিদ বলে অভিহিত হব? যে-যিশু একবার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি কোন বিধান বিলুপ্ত করতে আসেননি, বরং পূর্ণ করতে এসেছেন, সেই ব্যক্তিই প্রচলিত ও নিয়ম সর্ম্পকিত ব্যাখ্যা বিষয়ে নিজেকে বিপ্লবী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা এক-পক্ষাবলম্বী না হই এবং আরও বলেছেন যে, "যে-শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন, তিনি তো তেমনই এক গৃহস্বামীর মতো, যিনি নিজের ধনভাণ্ডার থেকে নতুন আর পুরনো, দু'রকমের সম্পদই বের করে আনতে পারেন।" "*নোভা অ্যাৎ ভেতেরা*" – "নতুন ও পুরনো" (মথি ১৩:৫২)।

(১) ইচ্ছার সিদ্ধতা বলতে কী বুঝায়?

সাধু ফ্রান্সিস দ্য' সেলের মতে সিদ্ধতা হচ্ছে দু'রকমের: অন্তরে ইচ্ছার সিদ্ধতা এবং আচরণের সিদ্ধতা কিংবা সৎগুণ ও সৎকর্মের অনুশীলন। আচরণের সিদ্ধতা সম্বন্ধে বহু আধ্যাত্মিক লেখা পাওয়া যায় কিন্তু ইচ্ছার সিদ্ধতার সম্বন্ধে খুব কমই লেখা হয়েছে। মঙ্গলসমাচারে খ্রিস্ট কিন্তু খুব স্পষ্টভাবেই এই দু'রকমের সিদ্ধতা সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করেছেন। দু'ধরনের সিদ্ধতার ব্যাখ্যা করে তিনি অন্তরে ইচ্ছার সিদ্ধতারই প্রাধান্য দিয়েছেন। অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনীতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সুদীর্ঘকালের উত্তম আচরণ, উত্তম সেবা, তার আজ্ঞাবহতা, পিতৃসুনাম রক্ষায় তার যত্নশীলতা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারত, অথচ কনিষ্ঠ পুত্র অসৎ আচরণ করার পরও সমাদৃত হল কেবলমাত্র তার অনুতপ্ত হৃদয়েরই গুণে। করগ্রাহকও তেমনি "ধার্মিক" আখ্যায়িত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করেছিল বলে। এদিকে ফরিসি - যার সৎকর্ম ও সৎগুণের অনুশীলন ছিল যথার্থ - তিনি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেও ধার্মিক গণ্য হতে পারলেন না। কালভেরীতে সেই দস্যুটি মরণের আগে আমাদের প্রভুর স্বীকৃতি পেল অনুতপ্ত হয়ে ত্রাণকর্তার প্রেমপূর্ণ দয়া ভিক্ষা করেছিল বলে, যদিও ভাল ব্যবহার দিয়ে ভালবাসা প্রকাশ করার এতটুকু সময়ও তখন তার হাতে ছিল না। আচরণের সিদ্ধতা ও গুণার্জন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । এর শুরু হয় দোষ দুর্বলতা সংশোধন ক'রে। ঐশ্বরিক কৃপার সাহায্যে এই সংশোধন কার্য অসম্ভব কিছুই নয়, কারণ ঈশ্বর নিজেই এর নির্দেশ দিয়ে আব্রাহামের কাছে বলেছিলেন "আমার উপস্থিতিতে চল এবং পবিত্র হও"। যিশু খ্রিস্ট বলেছেন "তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনি পবিত্র হও"। শরীরের পুনরুত্থানের পরে প্রত্যেকের বিচার করা হবে তার কাজ অনুসারে। মণ্ডলী একজনকে ধন্য শ্রেণিভুক্ত করতে গিয়ে সৎকর্ম সাধনার বীরোচিত প্রমাণসাক্ষ্য চান। কিন্তু অনেক খ্রিস্টভক্ত এবং ব্রতচারী বহুবছর যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে পবিত্রতার জন্য সংগ্রাম করেও যখন তেমন কোন উন্নতি দেখতে পাননা তখন তারা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। ঠিক তখনই যেন মনে হয় তারা পবিত্রতার চরম শিখরে পদার্পণ করেছে। তাদের এই ভাব দেখলে মনে হয় পবিত্র হওয়ার জন্য ত্রাণকর্তার আহ্বান তেমন জরুরী কিছু নয়।

(২) সম্ভাবনা

আসলে ইচ্ছার সিদ্ধতা লাভ করা যায় মুহূর্তের মধ্যে - এখনই এবং এখানেই, যেমন: "হে আমার ঈশ্বর, তোমার প্রেমপূর্ণ সেবার জন্য এই আমার হৃদয় গ্রহণ কর"। অপব্যায়ী পুত্রের কাহিনীতে বর্ণিত জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মতো আমাদের অনেক ভ্রাতা ও ভগ্নি আছে যাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য করুণাময় পিতার কাছে গিয়ে অন্তরের সিদ্ধতার জন্য প্রতিনিয়ত মন পরিবর্তন করতে হবে।

দু'জন ব্রাদার একবার এক প্রবীন ধার্মিক পুরোহিতের কাছে গিয়ে বললেন, "আমরা আপনার মত ভালবাসতে চাই, দয়া করে আমাদের উপায় বলে দিন"। "ঈশ্বরকে ভালবাসুন যতখানি ভালবাসতে চান " উত্তর দিলেন সেই পুরোহিত। উত্তরটা বুঝতে আমার বেশ কয়েকটা বছর লেগেছে। এ কথার মধ্যে ইচ্ছার সিদ্ধতার বিষয়টি রয়েছে। গুণ অর্জন করার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অনুশীলন, মুহূর্তে গুণের অধিকারী হতে পারতেন না সেই ব্রাদারগণ। কিন্তু যা তারা পারতেন তা হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রেম নিবেদন দ্বারা তাদের হৃদয় উৎসর্গ করা এবং যে পরিমাণে ঈশ্বর ভালবাসার যোগ্য, ঠিক ততখানি তাকে ভালবাসা - তাকে যতখানি ভালবাসতে চায় তারা – ততখানি ভালবাসা। কেউ বলতে পারে না "আমি তা পারব না"। কল্পনা বা অনুভূতির দিক দিয়ে যতই কষ্ট হোক না কেন, শত্রুর কাছে বলা যে, "আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই" – এতেই যথেষ্ট ভালবাসা প্রদর্শন করা হয়। ঈশ্বরকে যে ভালবাসতে চায় সে তত পরিমাণেই তাকে ভালবাসে যত পরিমাণে সে কামনা বা বাসনা করে। ভালবাসার ইচ্ছা বা কামনা অসীম, কিন্তু সেই অসীম কামনাই সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়ার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। অসীম ঈশ্বরকে আমরা ভালবাসি বলে আমাদের ভালবাসাও এক ধরনের অসীমত্ব লাভ করে এবং আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের জন্য আমাদের ভালবাসার পরিমাণ হচ্ছে অপরিমেয়।

ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা যখন বলেছিলেন যিশুকে তিনি এমন ভাবে ভালবাসতে চান, যেমন করে কেউ কোনদিন তাঁকে ভালবাসতে পারেনি, তখন তার সহ ভগ্নীদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন,"কী ধৃষ্টতা তোমার! আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী সাধ্বী তেরেজার চাইতেও তুমি বেশি ভালবাসতে পার"! একজন পুরোহিত বরং তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রথমে যেন সে তার দোষ সংশোধন করে। কিন্তু ফাদার ইভ্‌লী বলেছেন, সাধ্বী তেরেজার এই আকাঙ্খা মারীয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত। ঐশসন্তান লাভ করাটাই ছিল যিশু ও মা মারীয়ার গৌরব; সন্তানের মতোই, "তোমরা আমার চাইতেও মহৎকার্য করবে"। সর্বপ্রধান আজ্ঞাটি পূর্ণ করতে গিয়ে আমরা ভগবৎ প্রেমে কোন সীমা

টানতে পারিনা। সাধ্বী তেরেজার চাইতেও বেশী ঈশ্বরকে ভালবাসার আকাঙ্খা আমরা পোষণ করতে পারি কারণ আমাদের জীবনরূপ "পরমগীতের" লক্ষ্য সেই একই ঈশ্বর আর তার বাস্তবায়ন সুযোগ্য বাদ্যযন্ত্রে।

(৩) আবশ্যকতা

বাহ্যিক পরিশোধনের চাইতে অন্তরের পরিশোধনই প্রধান, কেননা অন্তর থেকেই সকল ভাল ও মন্দের উৎপত্তি। তাই প্রভু যিশু ফরিশীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন পাত্রের ভেতরটা পরিষ্কার করতে, শুধু বাইরের দিকটা নয়। পর্বতের উপরে উপদেশ প্রসঙ্গে যিশু যখন বলেছিলেন - "যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে কু-নজরে তাকায় সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে"- তখন যিশু স্বেচ্ছাকৃত ঈশ্বর প্রেমের মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে, অসীম প্রেমবান ঈশ্বরকে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সুনিশ্চিতভাবে ভালবাসতে ইচ্ছুক, সে সেই ঐশপ্রেমের এক মহান ক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করছে এবং এই ক্রিয়া সাধনকালে তার যদি মৃত্যুও হয় তাহলে সেই ক্রিয়া তার পাপমোচন ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

ইচ্ছার সিদ্ধতা মুহূর্তের মধ্যে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তা ধরে রাখা সম্ভব নয়। ইচ্ছার সিদ্ধতা একদিকে ঈশ্বরের মহানুভবতার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে তা রক্ষার জন্য চাই নিয়ত সাধনা। আচরণের সিদ্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধতার মাহাত্ম্য ক্ষনিকের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে যায় যদি সেই ব্যক্তি অহংকার ও আত্মতৃপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। আচার আচরণে সিদ্ধ ব্যক্তি এর সত্যতা অনায়াসে স্বীকার করবে।

(৪) অনুশীলন

ইচ্ছার সিদ্ধতা লাভের সাধনা বিনম্র ও দাম্ভিকতাশূন্য এবং জীবনভর সেই সাধনা সর্বদা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলে প্রতিভাত হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের শৈশব অবস্থা সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন করেছি এবং আমি অতীতে সর্বদা শিক্ষা দিয়ে আসছি যে, আধ্যাত্মিক জীবনের শৈশব চারটি গুণের মধ্যে নিহিত ঃ নম্রতা, আস্থা (সন্তান-সুলভ) প্রেম ও আত্মসমর্পণ। কিন্তু তাতে দেখা গেল যে, অন্তরের সিদ্ধতা ঐতিহ্যগত পবিত্রতা চারটি সৎগুণের মধ্যে কেবল মাত্র সীমিত। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, উক্ত চারটি গুণ আসলে ঈশ্বরের দিকে অপব্যয়ী পুত্রের একক মনপরিবর্তনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আর ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতার গুঢ় রহস্য মন ফেরানোর মধ্যে নিহিত ছিল।

স্বর্গীয় পিতার দিকে মন ফেরানোর মনোভাব বারবার অর্জন করার উদ্দেশ্যে সাধ্বী তেরেজা তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবহেলা দোষ ও দুর্বলতাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং বারংবার আত্মিক পাপস্বীকারের দ্বারা ইচ্ছার সিদ্ধতা অর্জনে সফলতা লাভ করেছেন। পবিত্রতার সম্বন্ধে সাধ্বী তেরেজার ধ্যান-ধারণা "অর্জনক্ষম গুণ অনুশীলনের" মধ্যে সীমিত ছিলনা। তাই সিদ্ধতার প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "অন্তরের মনোভাবের মধ্যেই সিদ্ধতার পরিচয় মেলে, যে মনোভাব পিতার প্রতি অনুগত থাকতে ও নিজেকে নম্র হ'তে সক্ষম করে, যে মনোভাব নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন, কিন্তু পিতৃ-হৃদয়ের উত্তমতার প্রতিও গভীরভাবে আস্থাশীল। আমি আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বলতা ও অবিশ্বস্ততা ঈশ্বরের কাছে বিশদভাবে খুলে বলতাম যাতে আমি তাঁর হৃদয়ে স্থান অধিকার করতে পারি"। ঈশ্বরের নিকট প্রেম নিবেদনের জন্য তিনি জীবনের ঘটনাবলীকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতেন। যে-ঈশ্বর ঘোষণা করে বলেছেন যে, হোম, বলি ও মহৎকার্যে তিনি সন্তুষ্ট হন না, সেই ঈশ্বরের হৃদয়ই আবার ভক্তের প্রেমের জন্য ব্যাকুল। যে-সমস্ত ঘটনা স্বার্থপরতার দরুন অসুখী বলে মনে হয়, সেগুলোও ঈশ্বরের জন্য এক বিশেষ সুযোগ স্বরূপ, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছে সাক্ষাৎ দানের অপেক্ষায় থাকেন। উদাহরণ হিসেবে যাকোবের কূপের কাছে যিশুর কথা স্মরণ করা যেতে পারে, "বৎস, আমি পিপাসিত, আমায় একটু জল দেবে? এক্ষুনি এই মুহূর্তে তোমার হৃদয় আমায় দেবে কি?" এমন সময়ে ভক্তের একটি মাত্র উত্তরই সাজে: "হ্যাঁ, তোমায় দিলাম। দেখ! তবে তাই হোক"।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সাধ্বী তেরেজা আমাদের জন্য সিদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত - ক্রিয়াকর্মের দ্বারা অর্জিত সিদ্ধতা নয় বরং মনোভাবের দ্বারা অর্জিত সিদ্ধতা। পরম দয়াবান প্রেমিকের কাছে তাঁর আত্ম-নিবেদনের উদ্দেশ্য ছিল যেন তিনি পরম প্রেমিকের প্রেমে জীবনযাপন করতে পারেন। তাই তিনি সর্বশেষে বলেছিলেন "আমি আমার প্রেমনিবেদন অসংখ্য বার উচ্চারণ করতে ইচ্ছুক"। এই উক্তির দ্বারা তিনি এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, ইচ্ছার সিদ্ধতা আচরণের সিদ্ধতার চাইতে কোন অংশে কম নয়।

আমরা একটা মারাত্মক ভুল করে থাকি যে, আমরা অনেক সময় কর্ম দ্বারাই নিজেদের পরিচয় দিতে চাই। পক্ষান্তরে মন ও হৃদয়ে আমরা কি ধরনের ব্যক্তি তা ঈশ্বর ভাল করে জানেন -"পিতা এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে না"। সাধু পৌল যিনি বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত ক'রে কত মহান কার্য করেছেন, অথচ তিনি তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা নিয়ে গর্ব করেছেন, কারণ এগুলো তার নিজের এবং এর মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছেন। "হে পরমেশ্বর, ক্ষমাদানেই তুমি তোমার সর্বশক্তিময়তা প্রকাশ করে থাক" (পঞ্চাশত্তমীর পর ১০ম রবিবারের উদ্বোধন প্রার্থনা দ্রষ্টব্য)।

সুসমাচার লেখকদের মধ্যে একমাত্র সাধু মথিই এই উক্তিটি করেছেন, "যাও এবং এই কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা কর - দয়াতেই আমি তুষ্ট, বলিদান নয়। আমি ধার্মিকদের জন্য নয়, কিন্তু পাপীদের আহ্বান করতে এসেছি"।

একথা সাধু মথি নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি নিজেই পাপীদের নিয়ে একটা ভোজের আয়োজন করলেন। জনসমক্ষে নিজেকে পাপী বলে ঘোষণা করা পুনরুত্থানের সেই মহা বন্দনা সঙ্গীতের আভাস "ধন্য সেই পাপ!" এটা তার সমগ্র জীবনে স্থায়ী ছিল এবং যিশুর মহানুভবতার স্পর্শে তার জীবনে যা ঘটেছিল তা এমন কি তা এখনও স্বর্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বর্গে আমরাও একদিন স্মরণ

করব ও অন্যের কাছে ব্যক্ত করব আমাদের জন্য ঈশ্বরের মহান দয়া ও কার্য। ঐশপ্রেমের অভিব্যক্তিই হলো আমাদের অনন্ত সুখ, মোক্ষলাভ। সেই অনন্ত জীবনে আমাদের দ্বারা অর্জিত গুণের কোন প্রশংসা করা হবে না। তাদের কোন উল্লেখই সেখানে থাকবে না। শুধু এটাই তখন স্মরণ হবে "ঈশ্বর আমাদের পরিয়ে দেন তার অনুগ্রহের কিরীট" (সাধু আগস্তিন)।

আমাদের জীবনের খ্রিস্টযাগ

(১) জীবনযাপনে খ্রিস্টযাগ

খ্রিস্টীয় জীবনের সমগ্রটাই হল মানব মুক্তিসাধন নিগূঢ় রহস্যের একটি উদ্‌যাপন। সাধু পল এই শিক্ষা দেন যে খ্রিস্টভক্তদের গোটা জীবনই হল একটি যাজকীয় কর্ম। তিনি খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান করছেন যেন তাদের দেহটি একটি আধ্যাত্মিক যজ্ঞরূপে নিবেদন করা হয় (রোমীয় ১২:১; ফিলি ৩:৩; হিব্রু ৯:১৪ এবং ১৩:২৮)। একই সঙ্গে তা হল সম্মিলিত মঙ্গলসাধন ও মহিমাকীর্তনের একটি উপাসনা অনুষ্ঠান (হিব্রু ১৩:১৫, ১৬ইত্যাদি)। খ্রিস্টযাগ উদ্‌যাপন আমাদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। সংস্কারীয় খ্রিস্টযাগ আপনাতেই প্রধান লক্ষ্য নয়, বরং তা মণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টের মতো করে গড়ে তুলতে মণ্ডলী ও মানবমুক্তি সাধনের লক্ষ্যে নিয়োজিত। সংস্কারীয় উপাসনা-অনুষ্ঠানের মধ্যেই মণ্ডলীর সর্বোচ্চ ক্রিয়াকলাপ সীমিত নয়; খ্রিস্টমণ্ডলী শুধুমাত্র উপাসনা-অনুষ্ঠানের সমাজ নয় বরং খ্রিস্টের মরণ ও জীবনের সমাজ। শুধুমাত্র খ্রিস্টযজ্ঞ অনুষ্ঠানের খানিক সময়ের মধ্যে মণ্ডলী খ্রিস্টযজ্ঞ হয়ে ওঠে না বরং যুগ যুগ ব্যাপী, সময়ের অন্তিমকাল পর্যন্ত মণ্ডলী এবং জগতের মুক্তি সাধনে খ্রিস্ট উপস্থিত আছেন। এই জগতে খ্রিস্টের মহা এবং বিরামহীন খ্রিস্টযজ্ঞ হচ্ছে মণ্ডলীর প্রাণ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। মণ্ডলী তার উপাসনা অনুষ্ঠানের বাইরেও খ্রিস্টযজ্ঞ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ক'রে থাকে; সেই উদ্‌যাপন হয় তার সেই সকল ভক্তমণ্ডলীর জীবনের মধ্যে, যারা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের জন্য কাজ করে, প্রচার করে, দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত অনুগত থাকে। মণ্ডলী সেই যজ্ঞানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে তাদের মধ্যে যারা ঐশজীবনের জন্য লড়াই করে, যারা অন্তরের পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিক দীনতার মধ্য দিয়ে, পিতার কাছে গমনরত খ্রিস্টের সঙ্গে নিজেদেরকে এই জগৎ থেকে উন্নীত করে । মণ্ডলী তার সেই সব বিশ্বাসীভক্তদের মধ্যে খ্রিস্টযাগ উদ্‌যাপন করে যারা পরিশ্রম করে, কষ্টভোগ করে এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীদের ভালবাসে, যারা অন্যদের পরিত্রাণার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এদের সকলের মধ্যে মণ্ডলী হ'ল যজ্ঞের বলি, যা একই চেতনা ও বিশ্বাসে উৎসর্গ করা হয়।

যখন কোনও যাজক বা খ্রিস্টভক্ত বিশ্বাস ও ভালবাসা নিয়ে মারা যান, তিনি শেষবারের মত তার খ্রিস্টীয় জীবনের যাজকত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর জীবনের শেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন; তিনি শেষ বারের মত জগতের মুক্তি সাধনে অংশগ্রহণ করেন এবং যিশুর মৃত্যু ও গৌরবের পূর্ণতায় প্রবেশ করেন। বেদীর উপর খ্রিস্ট-যজ্ঞে অকৃত্রিমরূপে যোগদানে ঈশ্বরের করুণায় সেই শেষ খ্রিস্টযাগ হবে পুণ্যতম এবং বিশুদ্ধতম। অন্যদিকে উপাসনা-অনুষ্ঠান যদি খাঁটি হতে হয় তা হলে বিনীত "আত্মবলিদান" স্বরূপ সেই মুহূর্তের মত হয়ে উঠবে যখন খ্রিস্ট ভালবেসে ও আরাধনায় সবকিছু গ্রহণ করে, তখন তাঁর সাথে একাত্মতায় আমরা বলি: "পিতা, তোমার হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম"।

খ্রিস্টযাগ এই জন্য উৎসর্গ করা হয় যাতে সমগ্র মণ্ডলী এবং আমাদের সমগ্র জীবন একটি খ্রিস্টযাগ হয়ে ওঠে, খ্রিস্টের বলিদান যাতে পৃথিবীতে সর্বক্ষণ এবং সর্বস্থানে বিদ্যমান থাকে ।

(২) সহ-উদ্‌যাপিত খ্রিস্টযাগ

আমরা এই সঙ্কল্প নেব যে, আমরা আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে পরিত্রাণের পুণ্য রহস্যে অংশগ্রহণ করব, যাতে কেউ যদি আমাদের প্রশ্ন করে, "তুমি কী করছ ?" আমরা এই উত্তর দিতে পারব, "আমি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করছি" বা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, "আমি অন্যদের সঙ্গে এক সঙ্গে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করছি"। এই খ্রিস্টযজ্ঞানুষ্ঠান সততই অন্যদের সঙ্গে মিলে উৎসর্গ করা, কারণ এক্ষেত্রে খ্রিস্টই সর্বদা প্রধান উৎসর্গকারী যাজক এবং একই সঙ্গে উৎসর্গের বলি, যদিও অদৃশ্য রূপে। পুরোহিত হলেন সেবাকারী বা সহ-যাজক। একজন খ্রিস্টভক্ত দীক্ষাস্নানের দ্বারা যাজকত্ব গ্রহণ করে এবং নিজেকে আবিষ্কার করে, তাকে যে আধ্যাত্মিকভাবে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে হয়, তা-ও একই ভাবে সম্মিলিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ হয়, কারণ প্রথমত, খ্রিস্টই হলেন নব-সন্ধির শাশ্বত এবং চিরস্থায়ী মুখ্য যাজক এবং একমাত্র "তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গে, তাঁরই মধ্যে" পবিত্রআত্মার সংযোগে যুগে যুগে আমরা পিতার মহিমা কীর্তন করতে পারি।

দ্বিতীয়ত: যিশু খ্রিস্টে আমরাও সকল সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে মিলনাবদ্ধ, যারা পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন যজ্ঞে যোগদান ক'রে পরম পিতার মহিমা কীর্তন করছেন এবং আমাদের মধ্যে সৎকর্মের দ্বারা তাঁদের স্বর্গের আস্বাদন দিচ্ছেন। এছাড়াও এই পৃথিবীতে আমরা অতীন্দ্রিয় দেহের অন্যান্য সদস্য, আধ্যাত্মিক যাজকদের সঙ্গে সংযুক্ত, যারা উপাসনা-অনুষ্ঠানে ও আধ্যাত্মিক ভাবে খ্রিস্টের অনন্য বলিদান উৎসর্গ করছেন। তাছাড়া, আমরা শুধু যন্ত্রণাক্লিষ্ট মণ্ডলীর জন্য নয় বরং মণ্ডলীর সঙ্গেও উৎসর্গ করি।

(৩) একটি অপরিহার্য অনুশীলন

এই যে সম্মিলিত খ্রিস্টযাগের সহ-উদ্‌যাপন তা কোনও ঐচ্ছিক ধর্মানুরাগ নয় বরং খ্রিস্টের জীবনের অনুকরণ ও বহমান রাখার জন্য আবশ্যকীয়, যা পিতার প্রতি তেত্রিশ বছরের প্রেমপূর্ণ বাধ্যতার বলিদান, যে বলিদান চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে ক্রুশের উপরে, সেই ক্রুশ যা সূচনা করেছে তাঁর আনুষ্ঠানিক উপাসনার বলিদান এবং একই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক ও চিরস্থায়ী সন্ধি। আমরা আমাদের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তকে করে তুলব সম্মিলিত খ্রিস্টযজ্ঞ-উৎসর্গ অনুষ্ঠান। পুণ্য বলিদানের অর্ঘ্য হবে আমাদের অন্তর্জীবনের অন্তঃস্থল, যেমন তা হবে সমগ্র মণ্ডলীর উপাসনা জীবনের কেন্দ্র।

উপাসনার বাইরে প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত এবং প্রত্যেক যাজক যে আধ্যাত্মিক বলি উৎসর্গ করে তা শুধুই আত্ম-বিসর্জনের ইতিবাচক দিক, যার শুরু দীক্ষাস্নানে এবং খ্রিস্টের সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান একাত্মতার জন্য তা একান্ত আবশ্যক: "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং নিজের ক্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে আমায় অনুসরণ করুক" (মথি ১৬:২৪)। নিজের কাছে মৃত হওয়া কঠোর এবং কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু "তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গে, তাঁরই মধ্যে" সম্মিলিত যজ্ঞ উৎসর্গের মধ্যে জীবনযাপনের জন্য নিজেকে খ্রিস্টের কাছে উৎসর্গ করা আমাদের দুর্বলতার কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

(৪) আধ্যাত্মিক ও সত্যসম্মত উপাসনা

"উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত জাতি-বিজাতির কাছে কত সম্মানিত আমার নাম! সর্বত্র আমার নামের সম্মানে ধুনাহুতি দেওয়া হয়; পবিত্র একটি অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সত্যিই জাতি-বিজাতির কাছে কত সম্মানিত আমার নাম! একথা বলছেন স্বয়ং বিশ্বপতি ভগবান" মালাখির এই ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী (মালাখি ১:১১) নব ও শাশ্বত সন্ধির সেই অনন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান আজও উৎসর্গ করতে হবে, শুধু জেরুসালেম বা আমাদের মণ্ডলীতে নয়, বরং সর্বত্র। খ্রিস্টযাগের উপাসনায় অংশগ্রহণ স্বার্থক হবে না যতক্ষণ না অন্তরের বলিদান এবং আত্মিকভাবে যাজকদের অদৃশ্য কিন্তু সর্বজনীন সম্মিলিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের সাধারণ বাস্তব জীবনে। খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গে প্রধান যাজক খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহে সংযুক্ত হয়ে উপাসনা অনুষ্ঠানের যাজক উৎসর্গ করবে: "মা আমাকে বিশ্বাস কর, এমন সময় আসছে, যখন তোমরা পরম পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, জেরুসালেমেও নয়। এবার সেই সময় এসেছে যখন সত্যিকার উপাসকেরা পিতার উপাসনা করবে আধ্যাত্মিক ভাবে, সত্যসম্মত ভাবে। আর পিতা তো তেমন উপাসকই চান। পরমেশ্বর নিজেই যে আত্মাস্বরূপ; তাই যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদের উপাসনা করা উচিত আধ্যাত্মিক ভাবেই, সত্যসম্মত ভাবেই" (যোহন ৪:২১-২৪)।

(৫) সহ-অর্পণকারী হিসাবে আমাদের ভূমিকা

আধ্যাত্মিক যজ্ঞে, অর্থাৎ আমাদের জীবনের দৈনন্দিন খ্রিস্টযাগে আমরা সবাই সহ-অর্পণকারী যাজক এবং স্বয়ং খ্রিস্ট হলেন অদ্বিতীয় প্রধান পুরোহিত। আমাদের ভূমিকা গৌণ এবং সেবার মধ্যেই সীমিত। আমাদের কাজ মন্ত্রোচ্চারণ নয় বরং অর্ঘ্য আনয়ন। এই যজ্ঞোৎসর্গে আমরা উদ্যোক্তা নই। যে সব উপহার আমরা নৈবেদ্যরূপে নিয়ে আসি, তা একেক সময় একেক রকম। এগুলো হতে পারে আমাদের চাকরি, কাজকর্ম বা দুঃখ-কষ্ট, কিন্তু এসব সর্বদা নিয়ে আসতে হবে ভালবাসার তাগিদে। খ্রিস্টযাগ উপাসনার সঙ্গে এর তফাৎ হলো এই যে, এক্ষেত্রে কোনও মন্ত্রের বা মনোসংযোগের প্রয়োজন হয় না, বরং প্রয়োজন হয় অন্তরের নীরব সমর্পণ, অন্তরের পবিত্রতা। যেহেতু তা কোন কিছু চেয়ে প্রার্থনা নয় বরং নৈবেদ্য, তাই বাইরের কাজ-কর্ম নিয়ে আমরা যত বেশি ব্যস্ত থাকব আমাদের তত বেশি নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে হবে বা খ্রিস্টের সঙ্গে সাহায্যকারীদের এবং সিরেনবাসীদের ভূমিকায় কষ্টভোগ করতে হবে।

আধ্যাত্মিক যাজকত্ব কীভাবে অনুশীলন করব? তা করব আমাদের জীবনের খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে, যা আনুষ্ঠানিক খ্রিস্টযাগ উপাসনার মত ক্ষণস্থায়ী নয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের জীবন একটি আধ্যাত্মিক বলিদান। বলিদানের প্রকৃত অর্থ হ'ল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা এবং তা যে ধ্বংস, যন্ত্রণা এবং মৃত্যু হতেই হবে এমনটা নয়। কাজেই আমাদের সম্পূর্ণ জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা একটি আধ্যাত্মিক বলিদান হতে পারে এই ভাবে যে সেই জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে। সাধু পল (রোমীয় ১২:১) তা সঠিক ভাবে বর্ণনা করেছেন, "এখন ঈশ্বরের শত করুণার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি, ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি তোমরা ঈশ্বরের চরণে নিজেদের দেহ-মন নিবেদন কর এক প্রাণময়, পবিত্র ঈশ্বরেরই গ্রহণীয় যজ্ঞনৈবেদ্য রূপে। এমনই হোক তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা"। এর অর্থ হল আমাদের মধ্যকার আমিটাকে দৈনন্দিন জীবনের নানা পরিস্থিতিতে উৎসর্গ করা। এই যজ্ঞনিবেদনে আমাদের একটি ক্রিয়াও বাদ পড়বে না । এক বিশাল সম্মিলিত যজ্ঞোৎসর্গ চলছে, যেখানে খ্রিস্ট প্রধান পুরোহিত এবং তাঁকে ঘিরে আছে লক্ষ্য লক্ষ্য সহ-যাজক, যারা তাঁর এই পৃথিবীবাসী বা স্বর্গবাসী বা সিদ্ধগণের সমবায়। এমন কি আমাদের নিদ্রা বা বিনোদনমূলক অবসরও এই অনন্ত যজ্ঞনিবেদনে উপযোগী। আমাদের ভূমিকা হল বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে বাস করা এবং সেখানে আমাদের কাছে যে ঐশকরুণা প্রকাশিত হচ্ছে তাতে সাড়া দেওয়া। এই হল পরমেশ্বরের সেই ধ্যানমগ্নতা যা তাঁর নিজের মধ্যে নয়, যেমনটি প্রার্থনার সময় হয় বরং তা তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মে ধ্যানময়তা। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর, সততই ভালবাসেন। ত্রিব্যক্তি অনুযায়ী তাঁর কর্ম স্থিতিশীল, সৃষ্টিমূলক, পরিত্রাণমূলক, এবং পবিত্রীকরণমূলক। তা সদাসর্বদা মঙ্গলকর ও গুরুত্বপূর্ণ। পিতা কর্তৃক পুত্রকে প্রেরণ এবং পিতা-পুত্র উভয় কর্তৃক পবিত্র আত্মাকে প্রদান একটি ধ্রুব সত্য, যদিও এই প্রেরণকার্য অদৃশ্য। প্রতিটি ঘটনা বা কার্যের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের এই বার্তা দেন যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করতে চাইছেন এবং তাঁর ঐশ জীবনে আরও বেশি করে অংশীদার করতে চাইছেন।

(৬) অবিরাম পরিবর্তন

"কত বিস্ময়কর সম্মানের আসনে বসিয়েছ তুমি মনুষ্য প্রকৃতিকে এবং আরও বিস্ময়কর মর্যাদায় তুমি তার নবায়ন করেছ"! এমন কিছুই নেই যা তাঁর চোখে অসংশোধনীয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। অপব্যায়ী পুত্রের পিতা সর্বক্ষণ সংশোধিত সন্তানের ফিরে আসার এবং নতুন ক'রে শুরু করার অপেক্ষায় আছেন: "কাজেই অবিশ্বাসী হয়ে থাক না, বিশ্বাস কর"। প্রতিটি মূহূর্ত ভালবাসার একটি অলিখিত বার্তা ঃ আমি তোমায় ভালবাসি এবং তোমাকে আমার প্রয়োজন, এসো, আমার সঙ্গে যজ্ঞ উৎসর্গ কর। "ধন্য তারা, যারা তাদের পরিচ্ছদ মেষশাবকের রক্তে ধৌত করেছে" (প্রত্যাদেশ ২২:১৪)। "আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাও, তোমাদের হৃদয় পাষাণ ক'রে তুলো না। এই দেখ, আমি তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে করাঘাত করছি"।

বর্তমান মুহূর্তের অনুগ্রহের প্রতি কি ভাবে উত্তর দেব এবং তার উপযুক্ত হয়ে উঠবই বা কি করে, এই মুহূর্তে অতি সাধারণ ঘটনাসমূহের আড়ালে প্রভু যে প্রতিনিয়ত দেহধারণ করছেন তাঁর উপযুক্ত হবই বা কীভাবে ? কথায় নয় বরং অন্তরের স্বীকৃতি দিয়ে তা গ্রহণ ক'রে, হৃদয় দিয়ে, অন্তরের পবিত্রতা দিয়ে, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে জীবন্ত আত্মসমর্পনের নীরব "হ্যাঁ"- এর মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের অবিরত আবেদন উপেক্ষা করা থেকে আমাদের নিবৃত্ত হতে হবে এবং স্মরণে রাখতে হবে প্রথম আজ্ঞা: ঈশ্বর এবং প্রতিবেশীকে ভালবাসতে হবে সমস্ত অন্তর দিয়ে। আধ্যাত্মিক যজ্ঞোৎসর্গে দ্বৈত ভালবাসা বাস্তবায়িত করে। এর দ্বারা খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা বৃদ্ধি লাভ করে। তা হল তেত্রিশ বছরের প্রেমপূর্ণ বাধ্যতার উপাসনা-উত্তর যজ্ঞোৎসর্গের বাস্তব ধারাবাহিকতা, যা খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে উৎসর্গ করেছেন পূর্বকার পশুবলি প্রতিস্থাপন করতে, যেখানে উৎসর্গীকৃত বলির পশু এবং বলিদাতার মানসিকতায় তফাৎ ছিল। যিশু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে এই অবিরত যজ্ঞোৎসর্গ এবং আমাদের জীবনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ সম্পন্ন করব: "আমার পিতার যাতে আনন্দ, আমি সতত তা-ই করি, যা কিছু আমার পিতাকে খুশি করে, আমি সর্বদা তা-ই করি এবং আমার পিতা কখনোই আমাকে ত্যাগ করেন না"। আজও খ্রিস্টের মনোভাব একই আছে: "আমি আমার পিতাকে ভালবাসি" এবং ভালবাসি মানুষকে, আমার ভ্রাতা-ভগ্নিদের। এই হল খ্রিস্টের হৃদয়: পিতার সঙ্গে তাদের পুনর্মিলন ঘটাতে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করি। যিশুর সঙ্গে আমরা এক মন এক হৃদয় হয়ে উঠবো: "তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি খ্রিস্ট যিশুর নিজেরই ছিল" (ফিলি ২:৫)। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলেন। আমাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন অবিরত সংশোধনের, পাপ থেকে অনুগ্রহে না হলেও, অন্তত স্বার্থপরতা থেকে ভগবত প্রেমে। এই পরিবর্তন কঠিন হলেও খ্রিস্টের বিধান মত নিজেকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন এবং তাঁকে অনুকরণ করা ও আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সবদিক দিয়ে পবিত্র, তেমন পবিত্র হওয়ার অন্তত ইচ্ছা থাকার জন্যও প্রয়োজন সেই পরিবর্তন।

(৭) উপাস্য প্রতিমূর্তি থেকে সাবধান

পুরাতন সন্ধির ইহুদীরা পরমেশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অসার মূর্তির সামনে নত হয়ে পূজা করতো; তাদের এই বিচার বুদ্ধিহীন প্রবণতা নিয়ে আমরা উপহাস করি। বর্তমান যুগে যদিও সরাসরি মূর্তি পূজার রীতি নেই, তবুও মূর্তি পূজার আরও ভয়ঙ্কর এক রীতি চালু হয়েছে। কিছু পাবার লোভ, জীবনের উচ্চাকাঙ্খা এবং অহংকার, কামনা-বাসনা ঘোর সংসারীদের পূজ্য। আপাতঃ ভাল খ্রিস্টভক্ত এবং ধর্মব্রতীরাও প্রত্যেকে স্বভাবতই পরমেশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের অজান্তে যুদাস ম্যাকাবিয়াসের সৈন্যদের মতো তাদের পোশাকের অন্তরালে রাখা প্রতীমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমাদের নিজেদেরকে খুঁজে বেড়ানোর এটি একটি লজ্জাজনক এবং স্বার্থপর প্রচেষ্টা। আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করছি: চেষ্টা করছি দুই মনিবের সেবা করার। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি আসল প্রভুকে ত্যাগ না করতে কিন্তু স্বভাবসিদ্ধভাবে আমাদের নিজেদের মধ্যকার মূর্তির দিকে ঝুঁকে পড়ি তার সেবা করতে। এমন কি সাধু পলও আমাদের এই স্বভাব এবং ঐশকরুণার মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্য আক্ষেপ করেছেন। "হায়, কি হতভাগ্য মানুষ আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহটা থেকে কেই বা আমাকে উদ্ধার করবে?" (রোমীয়, ৭:২৪)। তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন: "পরমেশ্বরের করুণা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমেই তো আমাদের উদ্ধার করে"। আমাদের এই দুঃখ-যন্ত্রণার অবস্থা সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। পরমেশ্বর চান আমরা সৃষ্ট সবকিছু এবং আমাদের নিজেদের প্রতি ভালবাসা নয় বরং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিই। তিনি চান আমরা যেন আমাদের আমিটাকে হারিয়ে ফেলি যাতে আমরা তাঁর মধ্যে আরও উত্তম এক আমাকে খুঁজে পাই। প্রতিটি ঘটনার মাধ্যমে পরমেশ্বরের করুণা আমাদের আবার তাঁর কাছে ফিরে আসতে আহ্বান করে, অথচ আমরা আমাদের স্বার্থপরতা নিয়ে হামেশাই তাঁর কাছ থেকে দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই। "পুত্র আমার, তোমার হৃদয় আমার কাছে সমর্পণ কর"। তোমার নিজের প্রচেষ্টার কথা ভুলে যাও, আমার সঙ্গে এবং আমার ত্রিমাত্রিক যাজক মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত যজ্ঞ-উৎসর্গ কর । তোমার এই মুহূর্তের কর্ম উপহার হিসেবে আমার কাছে নিয়ে আস। তোমার সেই ক্ষণকাল আমি রূপান্তরিত করব অনন্তকালের একটি অংশে। অন্যথায় চিরদিনের জন্য তা হারিয়ে যাবে। নিখিল যজ্ঞবলির জন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন। এই আহ্বানের প্রতি এই যেন হয় আমাদের উদার সাড়া "এই যে প্রভু যিশু, আমি এসেছি, এসো আমরা একসঙ্গে যজ্ঞ উৎসর্গ করি"।

(৮) আদর্শ সহ-উৎসর্গকারী যাজক

শিশু যিশুর সাধ্বী তেরেজা, যিনি যন্ত্রণাভোগের অংশীদার হতে নিজের নামের সঙ্গে "পুণ্য মুখচ্ছবি " শব্দ দুটি যুক্ত করেছেন তিনি আধ্যাত্মিক যজ্ঞ-উৎসর্গের সহ-উদ্‌যাপনকারীর একজন খাঁটি আদর্শ। নিগূঢ়দেহের প্রতি তার কী ভূমিকা, খুঁজতে গিয়ে তিনি তাঁর স্থান পেয়েছেন মণ্ডলীর হৃদয়ে এবং তাঁর বাকী জীবনের জন্য যোগ দিয়েছেন সহ-উদ্‌যাপনকারী যজ্ঞোৎসর্গের অপূর্ব উপাসনায়। দীক্ষাস্নানের দ্বারা তিনি যে একজন খাঁটি যাজক হয়ে উঠেছেন, এই শিক্ষায় মনে সান্ত্বনা লাভ না করলেও যখন তিনি পুণ্য পদাভিষেকের জন্য আকুল হয়ে ওঠেন, করুণাময় ভালবাসার কাছে নিজেকে জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ ক'রে তার সকল কাজকর্ম আনন্দ ও দুঃখ-বেদনা নৈবেদ্যর উপহার রূপে আনয়ন করেন, তখনই তিনি হয়ে ওঠেন যজ্ঞোৎসর্গে একজন নিখুঁত সহ-উদ্‌যাপনকারী যাজক।

"আমি মণ্ডলীর হৃদয়ে আমার আহ্বান পেয়েছি। মণ্ডলীর হৃদয়ে আমি হব প্রেমস্বরূপ। এভাবেই আমি হয়ে উঠব সবকিছু এবং পূরণ হবে আমার স্বপ্ন। ভালবাসার প্রমাণ কাজে, আমার ভালবাসা কীভাবে দেখাব? আমি পুষ্প ছড়িয়ে দেব এবং সেই পুষ্পগুলি হবে আমার মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথা এবং আমার প্রতিটি আচার-আচরণ, আমার প্রতিদিনের ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার। আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম থেকেও আমি লাভবান হতে চাই এবং সেই সব কর্ম সম্পন্ন করতে চাই ভালবাসার খাতিরে । ভালবাসার খাতিরে আমি কষ্টভোগ করতে চাই এবং আনন্দভোগ করতে চাই, যাতে আমি আমার পুষ্প ছড়িয়ে দিতে পারি। একটি কুসুমও বাদ যাবে না, মৃদুমন্দ গুঞ্জনে আমি পুষ্পপত্র ছড়িয়ে দেব তাঁর চরণে। কন্টাকাকীর্ণ শাখার মধ্য থেকে আমার গোলাপগুলি আহরণ করতে হলেও আমি গান গেয়ে যাব,

কাঁটাগুলি যত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ হবে, আমার গানও তত মধুর হবে -- আমি নিশ্চিত জানি, তোমার জন্য সন্তজনেরা মহৎ কাজ করে গেছেন। তার তুলনায় আমার প্রচেষ্টা অতি নগন্য । আমার নির্বুদ্ধিতা হল এই যে, আমি বিশ্বাস করি, তোমার ভালবাসার গুণে তুমি আমায় ভুক্তভোগী হিসাবে দেখছ । কিন্তু হে প্রিয় যিশু, আমার এই পুষ্প, এই গান, এর কী মূল্যই-বা আছে তোমার কাছে? কী-ই-বা দাম আছে এর? তবুও আমি নিশ্চিত জানি যে, এই সুগন্ধধারা, হতভাগা এই আমার হৃদয়ের এই নগণ্য পুষ্পপত্র, ভালবাসার গান তোমার কাছে প্রীতিকর হবে। এ কথা সত্যি যে, এ সবই অতি তুচ্ছ, তবুও তুমি স্মিতমুখে ওগুলোর দিকে ফিরে তাকাবে। মণ্ডলী আনন্দ ধ্বনি দেবে, তার সন্তানের প্রতি আনত হয়ে ছড়িয়ে থাকা সেই গোলাপ-পাপড়ি সংগ্রহ করে তোমার পুণ্য করতলে সযত্নে রেখে দেবে যাতে সেগুলি অমূল্য হয়ে ওঠে, বারিধারার মতো সেগুলিকে বর্ষণ করাবে মণ্ডলীর দুঃখ-কষ্টের বহ্নিশিখা নির্বাপিত করতে এবং মণ্ডলীকে বিজয়ী করতে বর্ষণ করাবে তার যোদ্ধাদের উপর" (The story of a soul)।

(৯) ব্যক্তিগত উপসংহার

আধ্যাত্মিক খ্রিস্টযাগের সহ-উদ্‌যাপন, তথা এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনের খ্রিস্টযাগ বর্ণনা করার পর আমার মনে হয়েছে যে, আমি চেষ্টা করেছি অন্যদের কাছে সুন্দর খ্রিস্টীয় জীবন তুলে ধরতে, যা আমি নিজে বার্ধক্যে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি এবং যা আমি এ পর্যন্ত বাস্তবে অনুশীলন করতেও পারিনি; কিন্তু তা প্রৈরিতিক জীবনে পরমেশ্বরের সঙ্গে সক্রিয় এবং বাস্তব মিলন রূপে বিবেচিত হবে, কেননা তা বিশ্বাস, আহ্লা ও ভলোবাসার অনিন্দ্য সুন্দর পবিত্র জীবন অবহ্লার পূর্ণতার সাথে যথাযথ ভাবে সংযুক্ত। এই অবহ্লা আসলে ক্ষুদ্র মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। সবকিছু তালগোল না পাকিয়ে আমরা যদি আমাদের সমগ্র জীবনকে একটি খ্রিস্টযাগে পরিণত করতে সক্ষম হই, তাহলে তা হবে ঐশ করুণার একটি মহৎ ফল এবং আমরা তখন এতটাই বিনম্র হয়ে উঠব যে আমাদের প্রতিবেশীদের আর হেয় নজরে দেখবো না, যে প্রতিবেশীরা হয়তো সেই শিষ্যদের মতো হ্রদে সারা রাত বিফল পরিশ্রম করে যাচ্ছে, যতক্ষণ না পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তাদের সামনে আবির্ভূত হচ্ছেন । আমরা তখন ক্ষুদ্র-পুষ্পের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব: "পরমেশ্বর ব্যাপারটা তাঁর হাতে নিয়ে নিয়েছেন" এবং খ্রিস্টযাগ সহ-উদ্‌যাপনে আমাকে তাঁর হৃদয়ের কাছে হ্লান দিয়েছেন। আন্তরিকভাবে আমাদের শুভ ইচ্ছা উৎসর্গ করলে আমরা সেই শুভক্ষণের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব – "খ্রিস্টানুকরণের" সেই প্রার্থনার মাধ্যমে: "হে প্রভু! আমার এই দুর্বল প্রয়াস দিয়ে যা অর্জন করতে চেষ্টা করছি, তোমার করুণা-ভান্ডার থেকে তুমি তা (উপহার রূপে) প্রদান কর "।

ভক্তিমূলক পাপস্বীকার

(১) জীবনের দুটি স্তর

শুদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা সবাই স্বীকার করে। সাধু পল বলেছেন "তোমরা যেন পবিত্র হয়ে ওঠ - এই হল ঈশ্বরের অভিপ্রায়"। আমরা সবাই এ-ও জানি যে, আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র, তেমন পবিত্র হওয়ার মহৎ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আমরা একা নই। কারণ পবিত্রতা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আমাদের প্রচেষ্টার ফল। এই দুই–এর অনুপাত সমান তো নয়-ই, বরং এদের তফাৎ বিশাল। যদি শতাংশের হিসাবে এর তুলনা করা হয়, তবে আমার মতে তা এই রকম দাঁড়াবে ঐশ অনুগ্রহ ৯৯ শতাংশ এবং মনুষ্য প্রচেষ্টা–এক শতাংশ। তবে এই ১ শতাংশ যে ঐশ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে হয় নি, তা হলফ করে বলতে পারব না। এ কথা সত্যি যে, শিক্ষানবীসদের ক্ষেত্রে সাধনার ব্যাপারটি অধিকতর লক্ষণীয় এবং অগ্রগতি লাভ করেছে এমন মানুষের ক্ষেত্রে ঐশ অনুগ্রহের প্রভাব অধিকতর। তবে এই ক্ষেত্রে যারা উন্নতির সোপানে উন্নীত হচ্ছে, তারা যদি শুরুতে ঈশ্বরের কর্তব্যপরায়ন সন্তান হিসেবে ঐশ করুণার গুণে প্রেমের স্তরে বাস না ক'রে শুধু মাত্র ঈশ্বর ভীতি, ন্যায় নীতির ভীতি এবং মনুষ্য প্রচেষ্টার স্তরে বাস করে, তবে তা ভুল হবে ।

(২) অনুতাপ জীবিতদের সাক্রামেন্ত

অনেক ধার্মিক ব্যক্তি ন্যায়নীতির স্তর থেকে প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে ভুলে যায়, যা সাপ্তাহিক পাপস্বীকারের একটি উদাহরণ। অনুতাপ, যা মৃতদের সংস্কার এবং যা পাপীকে গুরুপাপের ক্ষমা দান ক'রে ঐশ করুণায় ফিরিয়ে আনে এবং যে সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ঐশকরুণার মধ্যে অবস্থান করছে - তাদের ভক্তিমূলক পাপস্বীকার - এই দুই-এর মধ্যে দিন রাতের তফাৎ। প্রথমটি, অর্থাৎ অনুতাপ, প্রকৃত পক্ষে ন্যায়নীতির স্তরে অবস্থান করে এবং দ্বিতীয়টি, তথা ভক্তির পাপস্বীকার অবস্থান করে প্রেমের স্তরে। প্রথমটির ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে অনুতপ্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টা, মন-পরীক্ষা, প্রতিটি গুরুপাপের পূর্ণ স্বীকারোক্তি, অনুশোচনা এবং ক্ষতিপূরণ - এগুলির উপর। ভক্তিমূলক পাপস্বীকারে কিন্তু এমনটি হয় না। লঘুপাপ, যদি সত্যি সত্যি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়, তবে তা সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু তবুও সেগুলি পাপস্বীকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এই পাপের প্রত্যেকটি স্বীকার করতে বা তাদের সংখ্যা এবং অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে উল্লেখ করতে আমরা বাধ্য নই। এমন কি এ গুলির কোন একটি দ্বারা আমাদের নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করা না-করার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। পাপস্বীকার সংস্কারের ক্ষেত্রে এ গুলি খুবই নগণ্য বিষয়। এই সংস্কার আমাদের দান করা হয় যখন আমরা আমাদের বিগত জীবনের পাপের জন্য নিজেরা নিজেদের দোষী সাব্যস্ত ক'রে নতুন ভাবে জীবন শুরু করি। সেই পাপের ক্ষমা ইতিমধ্যে আমাদের দান করা হয়েছে, কিন্তু তার জন্য আমাদের আরও অনুশোচনার প্রয়োজন আছে। কিছু কিছু পাপের ক্ষেত্রে যে বিশেষ আজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়, তা এই জন্য করা হয় যাতে আমাদের অনুতাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, আমরা আরও বেশী অনুতপ্ত হই, যদিও তার প্রয়োজন পড়ে না। সারা জীবনের পাপের জন্য যদি কেউ নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে, সে গুলো যদি নিছক লঘু পাপও হয়, তবে সেই সব পাপের জন্য পাপমোচন এবং প্রকৃত অনুতাপের জন্য যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য কারণ দেখাতে হবে। অভিজ্ঞতা বলে যে, লঘুপাপ স্বীকার ক'রে আমরা খুব বেশী উপকৃত হই না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সেগুলি সাধারণত একই রয়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি বাস্তবিকই ইচ্ছাকৃত পাপ নয়। এগুলির জন্য প্রকৃত অনুতাপ প্রায় নেই বললেই চলে। আমরা অতি মানবসুলভ অনুশোচনায় ভুগী, কারণ কোন ভুল কাজের জন্য আমরা নিজেরা নিজেদের চোখে অবনমিত হই, সেই মুহূর্তে আমরা নিজেদের আরও ভাল বলে মনে করি। অতীত অভিজ্ঞতার ফলে আমরা সেই একই ভুল যে আবার করব না, তার জন্য বলিষ্ঠ কোন কারণ প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই সবচেয়ে ভাল হবে সেই একঘেয়ে আবৃতি করা থেকে বিরত থাকা, যেগুলি পাপশ্রোতা এবং পাপস্বীকারকারী উভয়েরই মুখস্থ হয়ে গেছে, যেমন ছোট বেলা এই সূত্র শেখানো হয় "হে পিতা, আমায় আশির্বাদ কর, আমি পাপ করেছি..." তা না হলে পাপস্বীকার একটি রুটিন মাফিক সংস্কার হয়ে দাঁড়াবে এবং এই তুচ্ছ ব্যাপার গুলি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলি শোধরাবার ও উৎকর্ষতার পথে উত্তীর্ণ হবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মুশকিল হল এই যে, লঘুপাপের দিকে বেশী নজর দেবার ফলে আমরা মোটামুটি আমাদের নিজেদের এখতিয়ারের পথে সীমাবদ্ধ থাকি এবং অবস্থান করি ন্যায়নীতির স্তরে; অন্য দিকে ভক্তিমূলক পাপস্বীকার সম্পন্ন হওয়া উচিত প্রেমের স্তরে। ফাদার এভিলি তার "ভ্রাতৃসংঘের" খ্রিস্টভক্তদের শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন: "তোমরা পাপ করা থেকে বিরত থাকবে বলে পাপস্বীকার করতে যাচ্ছ না, বরং নতুন করে এই কথা শুনতে যাচ্ছ যে, ঈশ্বর তোমায় ভালবাসেন, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং তোমার পাপ মোচনের অনুগ্রহ এই উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে, যাতে তুমি তোমার অপরাধের চেয়ে ঈশ্বরকে বেশী ভালবাস"।

(৩) অনুতাপ ভালবাসার সাক্রামেন্ত

মেষশাবকের রক্তে আমাদের জামাকাপড় ধূতে আমরা পাপস্বীকার করতে যাই। পাপস্বীকার আমাদের কাছে হতে হবে একটি সাক্রামেন্ত, প্রেমের সংস্কার, মৃতদের সংস্কার নয়। আরও বেশী করে সাক্রামেন্তীয় অনুগ্রহ লাভ করতে হলে যে নিখুঁত অনুতাপের প্রয়োজন তা হ'ল আমাদের সমগ্র জীবনের পাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, কেবল মাত্র সাম্প্রতিক কালের ভুলত্রুটির উপর নয়, যেগুলি ঈশ্বরকে সামান্যই দুঃখ দিয়েছে বা অসন্তুষ্ট করেছে। কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি অবশ্য অভিযোগ করে বলবে, "কিন্তু এভাবে কি আমার ভুলত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে অবহেলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না"? সাধু ফ্রান্সিস দ্য স্যাল এর উত্তরে বলেছেন, একদমই নয়, ভালবাসা বৃদ্ধি পেলে তুমি

সেই সকল কর্ম এড়িয়ে চলতে আরও বেশী তৎপর হবে, যে কর্মগুলি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে। ঘরে আগুন লাগলে আসবাবপত্র গুলি দ্রুত সড়িয়ে ফেলা হয়। অন্তরে যখন ভালবাসার আগুন জ্বলে ওঠে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দ্রুত অপসারিত হয়।

(৪) আধ্যাত্মিক পাপস্বীকার

ভুলত্রুটি সংশোধনের শ্রেয়তর উপায় হল নিজের দোষ-অপরাধগুলি সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। তা করা হয় আধ্যাত্মিক পাপস্বীকারের মাধ্যমে। সাধ্বী তেরেজা তাঁর শৈশবে এই পদ্ধতি শিখেছিলেন। তিনি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেললে তা তাঁর পিতার নজরে আনতেন এবং তাঁর পিতা শিশু তেরেজার অনুতাপের অশ্রু মোচন করতে তৎক্ষনাৎ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমার চুম্বন দিয়ে তাঁর দোষমোচন করতেন। এক দিন যখন তাঁর পিতা বাড়িতে ছিলেন না, তিনি দেয়ালে কাগজের ছোট্ট এক টুকরো ছিড়ে ফেলেন। চার ঘন্টা পর যখন তাঁর পিতা বাড়ি ফেরেন, তখন এই সামান্য ক্ষতির কথা সবাই ভুলে গেছেন কিন্তু তেরেজা সোজা মারিকে গিয়ে বলল, "যাও শিগগির বাবাকে আমার কাগজ ছেড়ার কথা বলে দাও"। অন্যান্য বারের মত এবারও সে ক্ষমা পেল। তাঁর শিশু মস্তিষ্কে ইতিমধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, সে যে-ভুলই করুক না কেন খুব সহজেই তার ক্ষমা পেয়ে যাবে এবং পিতার ক্ষমাদানে আরও অধিক স্নেহ লাভ করবে। কার্মেল সংঘের সন্ন্যাসব্রতী জীবনে তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতা পরমেশ্বরের কাছেও তাৎক্ষনিক ভাবে পাপস্বীকার করতেন। তিনি বলেছেন "আমার সামান্যতম সংশয়ের কথাও আমি তাঁর কাছে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতাম এই অন্ধবিশ্বাস নিয়ে যে, তাঁর হৃদয়ে আমি আরও বেশী স্থান অধিকার করে নেব"। আধ্যাত্মিক পাপস্বীকার এবং অন্তরের পবিত্রীকরণ অভিন্ন। এ হল এক রকমের আধ্যাত্মিক শৈশব। আবার নতুন করে শুরু করা, এ যেন অপব্যায়ী পুত্রের নতুন করে ফিরে আসা: পিতা আমি তোমার বিরুদ্ধে অতীতে পাপ করেছি এমন কি এখনও করছি, তবুও আবার আমায় তোমার পরিচারক মহলে এক দাসীর মত গ্রহণ কর, আমায় আশির্বাদ কর, আমার দুষ্টাচার সত্ত্বেও তুমি আমায় বুকে টেনে নাও – আমি এই মিনতি করি"। এমন কি এই আধ্যাত্মিক পাপস্বীকারের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত পাপগুলিও ভাল কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে: আমি হতভাগা আমাকে দয়া কর, ব'লে দাও, আমার নিঃসঙ্গ দুর্বলতার মুহূর্তে কী করব আমি। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা আর একটি ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক পাপস্বীকার করতেন; প্রার্থনায় মনোনিবেশ করতে না পারলে বা বদান্যতা প্রদর্শনে ঘাটতি থাকলে "তা মন-প্রাণ শান্তিতে পূর্ণ করে দেয়"। এ কথা সত্যি যে ক্ষমালাভে বা আত্মসন্তুষ্টিতে কিছু কম শান্তি লাভ করব, কিন্তু পরের বার আরও সজাগ থাকতে সচেষ্ট হব। আমরা যখনই অনুতাপ করি ঈশ্বর তখনই আমাদের কাছে ফিরে আসেন"। এই হল তাঁর "ক্ষুদ্র পথের" প্রধান বৈশিষ্ট এবং তিনি তাঁর নবিশদেরও এই শিক্ষা দিয়েছেন। এখনও তিনি সবাইকে সেই একই শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন তার জীবনী ও লেখার মধ্য দিয়ে।

(৫) ভালবাসার স্তর

আমাদের মানবীয় প্রচেষ্টা নিস্ফল হলেও তা পরিত্যাগ না ক'রে, আমাদের গুণাবলীর নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করার জন্য একান্তভাবে ঈশ্বরের করুণার উপর ভরসা রাখতে হবে। তার বিশ্বাস কেমন ছিল তা বোঝাতে সাধ্বী তেরেজা একটি শিশুর উদাহরণ দিয়েছেন। শিশুটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চাইছে। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা তুলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু বার বার মেঝের উপর পড়ে যাচ্ছে। উপর তলা থেকে ঈশ্বর দেখছেন, যেমন একজন পিতা তার শিশুকে তুলে আনার জন্য সবল হাত বাড়িয়ে শিশুর দিকে দেখেন। সবল হাত, তথা ঐশ অনুগ্রহ। যতক্ষণ না শিশু তার দুর্বলতা মেনে নিচ্ছে এবং তার দয়ালু ও প্রেমময় পিতার দিকে দৃঢ় আস্থা নিয়ে তাকাচ্ছে, ততক্ষণ তিনি সেই করুণা দান করতে পারছেন না। শুধুমাত্র নম্রতা এবং অন্তরের দীনতা ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সেই ঈশ্বর, যিনি "দীনজনকে গোবরগাদার মধ্য থেকে উদ্ধার করেন" এবং নিজের উপর আস্থাশীল দাম্ভিককে ফিরিয়ে দেন খালি হাতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অন্তরের শূচিতার জন্য আমাদের বিনম্র প্রচেষ্টা আরও বেশী মূল্যবান। উৎকর্ষতা লাভের ক্ষেত্রে কোন ফলপ্রসূ উপায় অবলম্বনের চেয়ে নীরবে ঈশ্বরের কাছে নীরব আকুতি অধিকতর বেশী মূল্যবান।

(৬) ঐশ অনুগ্রহের সঙ্গে সংযোগের দুটি উপায়

পবিত্রতা লাভের যে-সকল গুণাবলী প্রয়োজন তা সবই ঐশ্বরিক এবং ঐশকরুণা ব্যতিত আমরা সেই গুণাবলী অর্জন করতে পারি না। কাজেই, সেই ঐশ উপহার লাভ করার এবং প্রেমের স্তরে অবস্থান করার প্রথম উপায় হ'ল প্রার্থনা, বা বলা যেতে পারে কাতর অনুনয়: আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা সর্বদা নিভৃতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আর্তনাদ ক'রে বলবে: এই পাপীকে দয়া কর। দ্বিতীয় উপায় হ'ল: প্রেম। একাগ্র ভালবাসা ছাড়া আমরা আর কোন গুণ দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি না, কেননা তাঁর অনুগ্রহ সেই মহান আজ্ঞা প্রেমের সাথে আমাদের প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন করে। চাইলেই আমরা যত খুশি ভালবাসতে পারি। অন্যদিকে নৈতিক আচরণের পূর্ণতা ইহজীবনে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায় না, হৃদয় এবং মনের সিদ্ধতা লাভ করা যায় ঈশ্বরের প্রতি একমাত্র ভালবাসা–নিবেদনে, যা হচ্ছে ঈশ্বরীয় জীবনে নিজের জীবনের রূপান্তর। আমাদের হৃদস্পদন যেমন কখনও ক্ষান্ত হয় না, তেমনি আমরাও ভালবাসতে কখনও ক্ষান্ত হব না। আমার ভালবাসার খাঁটি নিবেদন থেকেই সম্পূর্ণ অনুতাপ উৎসারিত হয়, যার ফলে সারা জীবনের সকল গুরুপাপ মুছে যায়, এমন কি সংস্কারীয় মার্জনার আগেই, কেননা এই ক্ষেত্রে উক্ত মার্জনা মূলত ক্ষমার ঘোষণা। তাহলে কোনো কোনো লঘুপাপের ক্ষমার জন্য পাপ স্বীকার সংস্কারের বাইরে কেন আমরা প্রেম নিবেদন করব না? পবিত্রতার নীতিবাচক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে আরও বেশী ক'রে প্রেম নিবেদন করতে হবে। "ভালবেসে আমরা ভালবাসতে শিখি"। কিন্তু ভালবাসার উত্তম প্রমাণ মেলে কার্যে। খ্রিস্টের নীতি বাক্য ছিল এই: "আমি সতত তা-ই করি যা আমার পিতাকে সন্তুষ্ট করে"। এ কথা শুনতে আর্শ্চয লাগে যে, ধর্ম শহীদ হওয়া ছাড়া ভালবাসা প্রদর্শনে আর এক শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রলোভন প্রতিহত করা। ঈশ্বর আমাদের ঐ সকল প্রলোভন দেন, যাতে আমরা আমাদের আত্মতুষ্টির চেয়ে ঈশ্বরকে গ্রহণ ক'রে ভালবাসা প্রদর্শন করতে পারি। জয় আংশিক মনে হলেও এবং মনে অপরাধবোধ থেকে গেলেও ঈশ্বর অনেক

আগেই এর প্রমাণ পেয়ে গেছেন যখন তিনি স্বাধীন সত্ত্বা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে সেই নিষিদ্ধ ফল বর্জন ক'রে তাঁকে গ্রহণ করুক। ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজা ভালবাসার খাতিরে নিগূঢ় দেহের সঙ্গে জীবন যাপন করার আধ্যাত্মিক আহ্বান পেয়েছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের মধ্যে বাস করতে তিনি নিজেকে দয়াময় প্রেমের কাছে বলি রূপে উৎসর্গ করেন। তার মনে এই প্রত্যয় ছিল যে, ঈশ্বরের কাছে যাবার তার এই সরল পথ হতভাগ্য পাপীদের কাছেও অভিপ্রেত: "আমি জোর দিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, যত রকম পাপ করা সম্ভব সেই সব পাপের ভারে ভারাক্রান্ত বিবেক নিয়েও অনুতাপের চূর্ণ-বিচূর্ণ হৃদয়ে আমি প্রভুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমি জানি, কোন অপব্যায়ী সন্তানের জন্য তাঁর কতটা স্নেহ আছে"। এই লাইনগুলি তাঁর ইচ্ছা পত্রে সাক্ষী হয়ে আছে এবং এই শেষ লাইন গুলি তিনি তাঁর অসমাপ্ত জীবনীর শেষের দিকে পেন্সিল দিয়ে লিখেছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বোন পলিন যেন সেই মহিলার কথা যোগ করেন, যিনি পাপস্বীকার না করেও, ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ অনুতাপ নিয়ে দেহ ত্যাগ করেছেন।

চতুর্থ ভাগঃ ধর্মপ্রদেশ ও পালকীয় নির্দেশনা

ধর্মপ্রদেশের নীতি-নির্দেশনা

॥ ক ॥ কর্মীবৃন্দ বিষয়ক

(১) দলগত মনোভাব ও সমবেত কাজ

দলগত মনোভাব ও সমবেত কাজ হবে আমাদের ধর্মপ্রদেশে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রৈরিতিক কাজের কর্মপদ্ধতি। কোন ব্যক্তি বা দলের পরোক্ষ আনুগত্য অথবা একক প্রচেষ্টা, তা যতই সফল হোক-না-কেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি না।

(২) সন্ন্যাসব্রতী জীবন এবং প্রৈরিতিক জীবন

প্রত্যেক মিশনারির প্রৈরিতিক জীবনই হবে যথার্থ "নিরাপদ" স্থান। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্মীয় দায়িত্ব আর প্রৈরিতিক দায়িত্বের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে না। মিশানারিদের জীবন হবে ঐক্যভুক্ত জীবন। কেবলমাত্র ভাল ও সাধারণ উদ্দেশ্য থাকলেই সেই ঐক্য আপনা-আপনি হবে না। মিশনারিদের আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে ঐক্য ও "সক্রিয় স্থিতিশীলতা" অর্জন করা সম্ভব যদি তারা ধর্মপ্রদেশীয় প্রৈরিতিক কাজের মধ্যে সামগ্রিক ভাবে অংশগ্রহণ করে।

আন্দোলন একজন মিশনারিকে বাঙালি জীবন, সংস্কৃতি এবং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, যেখানে শুধু খ্রিস্টভক্ত বা যাজক নয় বরং ব্রাদার ও সিস্টারগণও তাদের নিজ নিজ দক্ষতা বা ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ অনুযায়ী ঐশবার্তা ঘোষণা করতে পারেন। উপরন্তু, একজন মিশনারির আন্দোলনের মাধ্যমে তার কার্যসকল নির্ভর করবে শিক্ষা-সংক্রান্ত দৃঢ় নীতিমালার উপর। অন্যভাবে বলা যায় যে, একজন সুদক্ষ মিশনারিকে হতে হবে একজন শিক্ষাবিদ বা শিক্ষাবিদ হওয়ায় জন্য আগ্রহী ব্যক্তি।

(৩) দেশীয় মণ্ডলী

খ্রিস্টবিশ্বাস, ভক্তি ভালবাসা এবং ধর্মোপসনা-প্রসূত মণ্ডলী এমন এক মানবগোষ্ঠি জন্ম দেয় বা আহ্বান জানায়, যেখানে শ্রম, অর্থনীতি, বিবাহিত জীবন, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি অনেক গুরুত্ব লাভ করে। আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের বিদেশী ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের পাশাপাশি রয়েছে দেশীয় যাজক, ব্রাদার এবং সিস্টারগণ। তাছাড়া কয়েকজন মিশনারি খ্রিস্টভক্তজনও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; এবং আশা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে আরো যোগ দেবে।

এই সব কর্মীরা তাদের সমান্তরাল পর্যায়ে, অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে অন্যদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। শুধুমাত্র ধর্মপালের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যথেষ্ট নয়, কারণ তাতে পালক একাকী এবং অন্যের কাছ থেকে হারিয়ে গেছেন বলে অনুভব করবেন। আদেশ দিয়ে মিলন বা ঐক্য অর্জন করা যায় না; পবিত্র আত্মার সহযোগিতায় তা সম্ভব; ঐক্য শুরু হতে হবে তৃণমূল পর্যায় থেকে যা চলমান থাকবে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত। সুতরাং প্রত্যেককে ধর্মপ্রদেশের কর্মীদলের দলের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে, কেননা ধর্মপ্রদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলী হিসেবে গড়ে ওঠা।

(৪) গঠন প্রশিক্ষণ ঃ বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়

সাগরদি ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে মিশনারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যেন তারা বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং এই দেশ ও দেশের মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। শুরু থেকেই পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও, সম্প্রতি, বাংলাভাষা আয়ত্ত করার জন্য, এই কেন্দ্রে তিন বছরের একটি যাথার্থ পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে (দুই বছর কেন্দ্রের ভিতরে এবং তা একটানা নাও হতে পারে)। একজন মিশনারির কাছ থেকে আমরা ন্যুনতম একটি দাবি করতে পারি যে, যে-দেশে সে বাণীপ্রচার করবে সেই দেশের ভাষা তাকে জানতে হবে। বাংলা ভাষার সামান্যতম জ্ঞান অর্থাৎ সঠিকভাবে এবং অনায়াসে কথা বলা, পড়া ও লিখার জন্য, অন্তত তিন বছর পড়াশুনা করা প্রয়োজন। যারা মনে করে আরও কম সময়ে ভাষা শেখা যায়, তাদের জন্য ভাষা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা (এবং তার সাক্ষ্যও অনেক) প্রমাণ করেছে যে, কোনো মিশনারির জন্য "ভাসাভাসা" জ্ঞান নিয়ে ও আঞ্চলিক ভাষা জেনে কাজ করা যথেষ্ট নয়, তা যে-কাজই হোক। তবে সে যদি ভাষা অর্জন করতে অসমর্থ হয় তা হলে সে কথা আলাদা। নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠির মধ্যে কাজ করার আগে আমরা প্রথমে প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের কাছে। বর্তমানে তাদের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। মিশনারি তার কর্মক্ষেত্রে যত বেশী দক্ষ এবং যোগ্য হবে, তত বেশী সে অনুভব করবে জনগণের ভাষা শেখার তাগিদ। মঙ্গলবার্তার সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং যাদের কাছে সেই বার্তা পৌছে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে তাদের অধিকার, যতদূর সম্ভব, অবিবেচনাপূর্ণ সহজ পথ বা অনায়াসলভ্য প্রচেষ্টা সমর্থন করে না। এ কথা বিশেষভাবে মুসলমান-প্রধান দেশের জন্য প্রযোজ্য। আমরা এখানে কোনও মানবসভ্যতার সাক্ষি দিতে আসিনি, আমরা এসেছি ঐশমানব দেহধারী যীশু খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে। কেউ হয়তো বলতে পারে আমরা আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চড়া মূল্য দাবী করি। সত্যি কথা বলতে কি এর চেয়ে কি কোন সস্তা উপায় আছে?

॥ খ ॥ কার্যক্ষেত্র বিষয়ক

মিশনারীদের কাজ মূলত সামাজিক উন্নয়ন নয়; এর ধরন আলাদা: ভালবাসা ও দয়া। কিন্তু জাগতিক বাস্তবতা মণ্ডলীর কাছে একটি কল্যাণকর চ্যালেঞ্জ। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, মণ্ডলী হলো জগৎ সংসারের পরিত্রাণ; এই পরিত্রাণ সাধন করতে হবে এই জগৎ সংসারে, বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে এবং আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, এই সময়ে খ্রিস্টের সাক্ষীদের কাছ থেকে পরিচালনা লাভ করবে। মানবীয় বাস্তবতার পক্ষে আমাদের সমর্থন ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে পরিত্রাণ নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে; অন্যথায় মণ্ডলী অবাস্তব বা লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার বিপদে পড়তে পারে। এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের একটি শিক্ষা-সেমিনারের প্রয়োজন ছিল, যার জন্য বর্তমানের এই আয়োজন।

মানব বাস্তবতার প্রতি আমাদের আন্তরিক মনোযোগ আমাদের যাজকত্ব ব্যহত করতে পারে। তোমরা যারা ঐশতত্ত্ববিদ তোমরা ভুলে যেওনা যে, যাজকরাও ঈশ্বরের সন্তান এবং পবিত্র আত্মার সহযোগী। যারা ঐশতত্ত্ববিদ নয় তারা যেন তাদের দায়িত্ব কম গুরুত্বের মনে না করে, কারণ ঈশ্বরের পরিবার মাত্র একটি এবং পবিত্র আত্মাও একজন।

যদিও তোমরা মন-মেজাজের দিক থেকে বিচিত্র চরিত্রের মানুষ, তথাপি আমি চাই তোমরা সবাই সর্বোপরি সেই চুড়ান্ত সর্বজনীন ভালবাসার বন্ধনে এক হয়ে থাকবে। ধর্মপ্রদেশকে মণ্ডলী রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেককে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন কোন কাজ পালকীয় বা মঙ্গলসমাচারীয় কাজ বলে গণ্য হবার যোগ্য নয়। আমাদের মিশনারি প্রৈরিতিক দায়িত্ব পালনের দিকনির্দেশনা অনুসসন্ধান করার জন্য এই সেমিনারই যেন শেষ কথা নয়। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পথ ও পদ্ধতির মোকাবেলা করার জন্য আমাদের একাধিক দরজা খোলা রাখতে হবে।

প্রতিদিন যে কাজ করা হয় তার মধ্যে যেন নতুন পথের সন্ধান করা হয়।

যখনই কোন জরুরী বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হবে তখন সজীব বিশ্বাস প্রয়োজনীয় দিশা দেখাবে এবং শক্তি জোগাবে।

আমার বিশ্বাস যে, কর্মের মাধ্যমে পরিশোধিত প্রত্যাশা দ্বারা আমাদের সদুদ্দেশ্য এবং সদ্বিচ্ছা যাচাইকৃত হবে, যা মানবীয় বাসনার কাছে সর্বদা স্পষ্ট নয় এবং যার সময় ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবনতিও ঘটতে পারে।

একসঙ্গে কাজ করার মনোভাব

(১) নতুন এবং পুরাতন

শেখার কোনও বয়স নেই। ধর্মপ্রদেশে মিশনারি প্রচারাভিযানে দলীয় কাজকর্মের পনের বছরের অভিজ্ঞতা লাভ করার পর আমি ফাদার লোয়েসের লেখা "Comme s' il voyait l' invisible" *"যেভাবে অদৃশ্যকে দেখলো"* বইটি পড়ি। বইটিতে আধুনিক যুগের একজন প্রচারকের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। যারা আমার সাথে একমন, একপ্রাণ হয়ে কাজ করতে চায়, তাদের সাথে আমি আমার সেই লব্ধ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেব। প্রথমতঃ আমি এই বুঝেছি: বর্তমান মুহূর্তে এটি উপলব্ধি করতে এবং বর্তমান ঘটনা ও যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে আমরা একা একাই পারি, কিন্তু তা আরও সুন্দর করে হবার সম্ভাবনা থাকে যদি আমরা দলগতভাবে একে অপরের সাহায্য নিয়ে কাজ করি। আমি এ-ও বুঝেছি যে "জীবন-পর্যালোচনা"-র (কথাগুলি আমার কাছে নতুন, যদিও ফাদার পাইয়া এবং ব্রাদার ম্যাডোরের প্রৈরিতিক কাজের ধরণ আমার খুব ভাল লেগেছে; এরা দু'জনই বর্তমানে অন্য ক্ষেত্রে কাজ করছেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিকভাবে সাহায্য করছেন; ঈশ্বর এদের প্রৈরিতিক কাজ আর্শীবাদ করে এদের পুরস্কৃত করুন) –– মধ্যে রয়েছে যথাযথ এবং সমষ্টিগত ভাবে বর্তমান ঘটনাসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের বার্তা খুঁজে পাওয়া। আমি ভাবতাম, আমি সব জানি, কিন্তু আমি আরও ভালভাবে বুঝতে পেরেছি যে, দলগত অবদান না থাকলে প্রকৃত প্রৈরিতিক কাজ হয় না। আর গভীর সঙ্গভাব না থাকলে সেখানে দলীয় কাজও হয় না; এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বেড়ে উঠতে হলে এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ঐশপ্রেমে সমৃদ্ধ হতে হলে প্রয়োজন পারস্পারিক সাহায্য। প্রৈরিতিক কাজের চালিকা শক্তি হল ভালবাসা, যা সেবার আহ্বান সার্থক করে তোলে। ভালবাসা দলগত কাজে পুষ্টি যোগায় এবং অন্যদের মধ্যে ভালবাসা জন্ম দেয়। প্রকৃত ভালবাসা কোনো আবদ্ধ পাত্রে রাখা যায় না। কোন জীবন্ত সমাজ তার নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

(২) "জীবন-পর্যালোচনা" দলগত কাজের জন্য অপরিহার্য

আমাদের প্রৈরিতিক কাজ হবে বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তবধর্মী, যখন আমরা সমবেত ভাবে সেই গভীর ঐক্য লাভ করি, যা নিজে নিজেকেই সেই "জীবন-পর্যালোচনা" মাপকাঠিতে ঝালিয়ে নেয়। দলগত ভাবে বর্তমান ঘটনাসমূহের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রৈরিতিক কাজের প্রতিফলনই হল ঐক্যের সংকেত।

(৩) দলটি হবে ছোট

সম্প্রতি আমি বুঝতে পেরেছি যে, একটি প্রাণবন্ত দল গঠিত হবে অল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে। ফাদার Loew এর কারণ হিসাবে বলেছেন যে, দল যদি একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় তাহলে প্রয়োজন পারস্পরিক নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সকলের জন্য করণীয় সাধারণ কাজের প্রতি মনসংযোগ। এছাড়াও থাকবে আস্থা, নিঃসংকোচ এবং পারস্পরিক নৈতিক উন্নতি সাধন।

এই রকম পরিবেশ বড় দলে সম্ভব নয়; এবং যখন সঙ্গভাব Team spirit নিস্প্রভ হয়ে আসে, তখন আমরা কখনই তা সঞ্জীবিত করতে দলের পরিচালক বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন ক'রে, দলের সকল সদস্যদের মধ্যে, নতুন জীবন সঞ্চার করতে চেষ্টা করব না। কুড়ালের আঘাত করতে হবে গাছের শেকড়ে, মাথায় নয়। সমস্যার প্রতিকার হল ছোট ছোট দলের মধ্যে এবং তৃণমূল স্তরে সঙ্গভাব তৈরী করা, যেমন ছোট ছোট ধর্মীয় সংগঠন, পরিষদ-সভা, ধর্মপ্রদেশীয় কমিশন এবং সর্বোপরি স্থানীয় পালকীয় কমিটি (এলপিটি LPT)।

(৪) ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং বার্তা

অবশেষে আমি এই বুঝেছি যে, একটি দলের জীবনীশক্তি হল ঈশ্বরের তিন রকম উপস্থিতি। প্রথমত, ঈশ্বরকে সবচেয়ে সহজে পাওয়া যায় বর্তমানে ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে এবং অন্যদের সংস্পর্শে এসে। বলা হয় যে, অভিজ্ঞতা হল আমরা যে সব ভুল করি তার সমষ্টি; অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে আমাদের ভুলগুলির দিকে ফিরে তাকাতে হবে এবং বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, ঈশ্বর ঐ সমস্ত ভুলের মধ্য দিয়ে আমাদের কী শেখাতে চাইছেন। যেহেতু আমরা কেউই নিজেরা নিজেদের বিচার সার্বিকভাবে করতে পারি না, তাই আমাদের দলের বন্ধুদের সাহায্যের প্রয়োজন একথা জানতে যে, প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কী বলতে চান।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর দলের মধ্যে উপস্থিত আছেন, কারণ দলের সদস্যরা স্বীকার করে যে, তারা খ্রিস্টের রহস্যাবৃত দেহের জীবন্ত সদস্য। তারা অনবরত চেষ্টা করে নিজেদের উন্নতি সাধন ক'রে খ্রিস্টের মত হতে, খ্রিস্টের জন্য আরও মানব-স্বভাবী হতে, আরও অনেক খ্রিস্ট হতে, খ্রিস্টকে অন্যদের ও নিজের মধ্যে খুঁজে পেতে এবং এই খ্রিস্টীয় বা ঐশ অন্তঃসত্ত্বায় একে অপরকে সাহায্য করতে।

তৃতীয়ত, সদস্যদের মধ্যে খ্রিস্টের বিশেষ উপস্থিতি। "দু-তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি" (মথি: ১৮:২০)। খ্রিস্টধর্ম অন্যদের কাছে পৌঁছেছে দলের মাধ্যমে, সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে। একথা সত্যি যে, খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্বে পরিবর্তন আনা সম্ভব। একটি জীবন্ত দল হল ঐশরাজ্য থেকে পড়ে যাওয়া এক টুকরো খাবার। দলের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ এবং দলের প্রৈরিতিক কাজের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। দলের সদস্যরা একে অপরের

দোষত্রুটির দিকে নজর না দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভালবেসে যাবে। সদস্যরা দলে এমন ভাবে থাকতে সম্মত হবে যে, কেউ নিজের বলে কোন কিছু দাবি করবে না; সব কিছু সবাই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবে, যেমন করা হত প্রথম খ্রিস্টানদের মধ্যে।

দলে ঈশ্বর উপস্থিত আছেন, কাজেই দলের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে; দল তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে খ্রিস্টকে বয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু যখনই পারস্পরিক ভালবাসায় আঘাত লাগে, তখন খ্রিস্টকে দরজা দিয়ে বের করে দেওয়া হয় –– শুধু দলের মধ্য থেকে নয়, অন্যদের মধ্য থেকেও, কারণ খ্রিস্ট সেখানে আর থাকেই না। আমরা যখন অন্যদের মধ্যে কোনো খুঁত দেখতে পাই, তখন আমরা নিজেদের এই কথা বলব যে, ঈশ্বর আমাদের তাঁর কষ্টের অংশীদার করছেন; কিন্তু আমরা কখনই তাঁকে আমাদের সহচরদের প্রতি একই আচরণ করতে সাহায্য করব না। অন্যদের আমরা যে দুঃখ দিতে চাই তা লাঘব করার পথ সবসময়ই খুঁজে পাওয়া যায়। যখন কোনো দল সজীবতা ও পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে, তার একমাত্র কারণ ঈশ্বর সেখানে আর উপস্থিত নেই। খাঁটি প্রেমিক হবার বিশেষ কোন উপায় নেই; পথ খুঁজে পেতে হলে খ্রিস্টের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে। আর সব কিছুই অজুহাত।

(৫) ঐক্যের মূল্য এবং ফল

অন্যের সঙ্গে ঐশ্বরিকভাবে একাত্ম হওয়ার অর্থ নিজের "আমি"টার মৃত্যু ঘটানো; প্রতিবেশীদের মধ্যে মিলন ঘটাতে চাইলে ক্রুশ মৃত্যুর প্রয়োজন। প্রতিবেশীদের মধ্যে ঐক্যের জন্য প্রয়োজন বিনয়, দীনতা, নিঃস্বতা, আনুগত্য, বাধ্যতা। সবার মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া; যারা ঐক্যের জন্য বেঁচে থাকতে চায়, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা। এক অর্থে তারা নিঃসঙ্গ। ভেঙ্গে যাওয়া টুকরো জোড়া লাগাবার মূল্য যারা দিতে চায়, তাদের ভাগ্যে জোটে প্রত্যাখ্যান। এমন অনেকে আছে যারা ঐক্য চায় কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়।

যিশু হলেন আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত; মানুষে–ঈশ্বরে এবং মানুষে–মানুষে দ্বন্দ্বের যে মূল্য পরিশেষে যিশু দিয়েছেন তা হল ক্রুশের উপর প্রত্যাখ্যান, জগৎ সংসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, যাদের জন্য তিনি কত কিছু করেছেন তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, তাঁর বন্ধুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং (যাতনা ও ভালবাসার চরম মুহূর্তে) আমাদের বোধাতীত ভাবে পিতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

যিশু শুধু অনৈক্যের বলি নন, তিনি পুনর্মিলনেরও কারিগর; যে পাপীদের পাপের লজ্জার ভাগী তাঁকেও করা হয়েছিল, সেই পাপীদের মধ্যে যিশু তাঁর গৌরবের মধ্য দিয়ে এনেছেন সন্তানসুলভ মিলন।

আধ্যাত্মিক জীবনের চরম অবস্থা হল, যিশুর মতো জীবনযাপন করা; জগতে পুনর্গঠনের জন্য কাজ করতে হলে ক্রুশবিদ্ধ এবং প্রত্যাখ্যাত যিশুর মত জীবন-যাপন করতে হবে। তা করতে হবে বাস্তবসম্মতভাবে; ক্রুশই হবে জীবনের বিধান। অর্থাৎ দিতে হবে, অনবরত দিয়ে যেতে হবে, যেমন যিশু দেন – জাগতিক জিনিসপত্র, ভাবনা চিন্তা, মৌলিক ধারণা, বাছ-বিচারে অগ্রাধিকার। আমাদের জীবন ক্ষয় হবে আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য।

আমাদের এই জীবন ব্যর্থতায় হতাশ হবার গোপন রহস্য নয়, কারণ যিশুর জীবনও আপাতঃভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনে হয়েছিল। এই হল ক্ষমতার রহস্য; ঐক্য সাধন যখন অসম্ভব মনে হয় তখন ঐক্যের জন্য চেষ্টা করা। এ হল বাধ্যতার রহস্য, যিনি আদেশ করছেন তাঁকে এবং বাধ্যতা, উভয়কে ভালবাসা। এ হল জীবনের সব নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে রূপান্তরিত করা – দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট-অপমান, মতানৈক্য, ক্লেশ ইত্যাদিকে ইতিবাচক রূপ দেওয়া। এমন কি আমাদের নৈতিক অসততা – আমাদের নিজেদের ও অন্যদের পাপ – আমাদের এগিয়ে যাবার প্রেরণা হতে পারে; হতে পারে যে, বিষন্নতা ও নিঃসঙ্গতা নিয়ে আসে তার মূল্য মেটাবার সুযোগ।

এই ত্যাগস্বীকারের ফল হল, যিশু প্রকৃতই এক আর্শীবাদ নিয়ে আসেন দলের কাজ কর্মে সহায়তা দিতে ও পরিচালনা করতে। ভালবাসার খাতিরে যখন কেউ নিজেকে নিঃস্ব করে, যিশু তাকে এবং তার কাজকর্ম পরিচালনা করেন। যে-কোন সংঘের মধ্যেও একই ব্যাপার ঘটে, যখন সব রকমের আত্মকেন্দ্রিকতা মুছে গিয়ে প্রতিটি সদস্য অপরের জন্য বাঁচার অদম্য কামনা মনে পোষণ করে। এ রকম একটি সংঘ, নিজের কাছে নিজে মৃত হওয়ার জন্য এবং সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য যাচ্না করে; এই রকম সংঘ শুধু যিশুকে যাচ্না করে; এবং যিশু ঐ সংঘে বিশেষ ভাবে উপস্থিত আছেন।

"দু-তিন জন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি" (মথি: ১৮-২০)। যিশুর এই কথা প্রার্থনার চির অভ্রান্ততার প্রমাণ রাখে, কিন্তু এর আরও ব্যাপক প্রয়োগ আছে : "রহস্যাবৃত দেহে" যিশু প্রধান হিসেবে উপস্থিত, যখনই কোন দল সেই 'দেহের' ঐক্য সাধনে ব্রতী হয়, সেখানেই এর সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

'আমার নামে'- এর অর্থ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন উদ্দেশ্যে, তাঁর গৌরব বা মহিমার জন্য; এ সব তাঁর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। বাইবেলের নববিধানে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের মাঝে যিশুর এই উপস্থিতির ফল হল এক উজ্জ্বল আলো, যা আমাদের সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করে, যারা এক সঙ্গে কাজ করছে তাদের মধ্যে, সেই আলো হল এক অনস্বীকার্য আনন্দ, শান্তি, আন্তরিকতা এবং প্রৈরিতিক কাজের জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

আমাদের মাঝে যিশুর এই উপস্থিতির তীব্রতা এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে, প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত যিশুর জন্য পারস্পরিক ঐক্যের স্বার্থে নিজেকে নিঃস্ব করে দেবে। দলে ঐশ করুণার জন্য প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব আছে, প্রতিটি খ্রিস্টীয় দলে একটি মাত্র হৃদয় এবং একটি মাত্র আত্মা থাকবে।

আদি মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের ভালবাসা দেখে সেই সময় পৌত্তলিকরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। সেই একই ভালোবাসার মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীতে আবার পরিবর্তন আনা সম্ভব; প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন নিজেকে যেমন ভালবাসে তেমনি অপরকে ভালবাসা; পারস্পরিক ভালবাসা জাগরিত করা; যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে দলটি বাস করে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংহতি বজায় রাখা; সব রকমের ঐক্যের সঙ্গে সেই স্বর্গীয় ঐক্য, অর্থাৎ মণ্ডলীর সঙ্গে সংহতি গড়ে তোলা। যিশু আমাদের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষার এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। *(ফাদার লম্বার্ডি-র বুলেটিন Atmosphere, Jan- Feb '65 থেকে গৃহীত)*

ORIGINAL TITLES OF THE ARTICLES

1. Perfection of the will	ইচ্ছাশক্তির সিদ্ধতা	পৃষ্ঠা
2. The Confession of Devotion……	ভক্তিমূলক পাপস্বীকার	
3. Mystery of the Incarnation ……..	দেহধারণের নিগূঢ় তত্ত্ব	
4. Mystery of the Redemption	পরিত্রাণের নিগূঢ় রহস্য	
5. Resurrection- The Era of the Holy Spirit..	পুনরুত্থান – পবিত্র আত্মার যুগ	
6. The All Holy Trinity ……..	সর্বপবিত্র ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর	
7. The Handmaid of the Lord…….....	প্রভুর দাসী	
8. The Mass of our life…….	আমাদের জীবনের খ্রিস্টযাগ	
9. Heaven.....	স্বর্গলোক	
10. Our Way to Heaven.....	স্বর্গ রাজ্যে যাওয়ার পথ	
11. The Beginning of Heaven.....	স্বর্গ রাজ্যের সুচনা	
12. Christian Life	খ্রিস্টিয় জীবন	
13. The Theology of the Sacred Heart ……	যিশুর হৃদয়ের ঐশতত্ত্ব	
14. Sanctity for All ……	সর্বজনীন পবিত্রতা	
15. The Priesthood of the Laity ……...	খ্রিস্ট-ভক্তজনগণের যাজকত্ব	
16. The Mystical Body.....	নিগূঢ় দেহ	
17. The Church, Mystical Body of Christ ……	খ্রিস্টমণ্ডলী : খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহ	
18. Faith that Operates through Charity.....	ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্বাস সক্রিয়	
19. Faith and Action.....	বিশ্বাস এবং কর্ম	
20. True Existentialism	প্রকৃত বাস্তববাদ	
21. The Missionary Spirit……..	মিশনারি প্রেরণা	
22. Team Spirit.....	একসঙ্গে কাজ করার মনোভাব	
23. Active Spirituality.....	কার্যকরী আধ্যাত্মিকতা	
24. Biblical Spirituality ……	বাইবেলীয় আধ্যাত্মিকতা	
25. Our Determined Policy	ধর্মপ্রদেশের নীতি-নির্দেশনা	

মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সংঘের প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পূর্বেই, উনিশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ, পুরোহিত ও সন্ন্যাসব্রতীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, মণ্ডলী নবীকরণের উদ্দেশ্যে নানা উদ্যোগী চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম প্রচেষ্টা। মণ্ডলীর বিশ্বজনীনতা মূর্ত ক'রে তোলার জন্য এদেশের মণ্ডলীকে অবশ্যই স্থানীয় হতে হবে এবং তাকে পরিগ্রহ করতে হবে দেশীয় রূপ। বাংলার মাটিতে, ফুলগাছ-সদৃশ স্থানীয় মণ্ডলীতে, দেশীয় সন্ন্যাসজীবন, ফুল আকারে ফুটে উঠে শোভা-সৌন্দর্য ও সুগন্ধ দান করবে। খ্রিস্টের মানব দেহধারণের রহস্যাবৃত ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা অনুভব করেছিলেন এই প্রাবক্তিক আহ্বান।

গোড়াপত্তন

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশস্থ মাতা মণ্ডলীর ক্রোড়ে, বরিশাল ব্যাপ্টিস্ট পাড়ার অন্তর্গত, একটি ভাড়াটে ঘরে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর একটি স্থানীয় সন্ন্যাস সংঘের সূত্রপাত হল। আধ্যাত্মিক পিতা ও মাতা হিসেবে শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ রেমণ্ড লারোজ সিএসসি এবং মাদার আলফোন্স দ্য লিগুরি সিএসসি –– যাঁরা ছিলেন সেবিকা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-প্রতিষ্ঠাত্রী। সেবিকা সংঘের গর্ভধারণ মূহূর্ত থেকে, তার ক্রমবৃদ্ধির জন্য, পবিত্র ক্রুশ সংঘের ভগ্নিগণ, তাদের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার মরোর আর্দশে অনুপ্রাণিত উত্তরসূরী সংঘ হিসেবে, সার্বিকভাবে সেবিকা সংঘটিকে সাহায্য-সহযোগিতা ক'রে এসেছেন।

সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ লারোজ সিএসসি এদেশের যুবতীদের জন্য একটি সন্ন্যাসসংঘ সুরু করার মনোবাসনা প্রকাশ করেন। উক্ত সন্ন্যাসসংঘটি একদিকে হবে ঐতিহ্যগত খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসজীবনের আর্দশে গড়া, অন্যদিকে হবে খাঁটি বাংলাদেশী। সংঘের লক্ষ্য হবে: সন্ন্যাসব্রতী জীবনযাপন ক'রে নিজেদেরকে পবিত্র করা এবং ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা। সংঘটির বিশেষ উদ্দেশ্য হবে: গ্রামের তৃণমূল স্তরে, মহিলা, যুবতী ও শিশুদের শিক্ষা দেওয়া এবং স্থানীয় মণ্ডলীর প্রেরণকর্মে সহযোগিতা করা। এই মর্মে বিশপ লারোজ, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী, মাণ্ডলিক বিধান জারী ক'রে "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ" নামে ধর্মপ্রদেশীয় একটি সন্ন্যাসসংঘ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। রোমে অবস্থিত ধর্মবিশ্বাস বিতার সংস্থার অনুমতিক্রমে, ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তিনি সংঘের প্রথম সংবিধান অনুমোদন করলেন।

সংঘের ক্যারিজম, ভাবমূর্তি ও আধ্যাত্মিকতা

স্থানীয় কৃষ্টি অনুসারে, ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বাস ক'রে, পরিবার ও সমাজের নারী, যুবা ও শিশুদের মধ্যে, যিশুর দেহধারণ রহস্য বাস্তব করার সাধনায়, মণ্ডলীর মিশনকর্মে সহযোগিতা করা হচ্ছে "মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ"-এর ক্যারিজম বা আত্মার বিশেষ দান। মানবদেহধারী যিশুখ্রিস্টের মাতা কুমারী মারীয়ার আদর্শে, রিক্ততা, তৎপরতা ও পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ হচ্ছে সংঘের ভাবমুর্তি বা বৈশিষ্ট্য। মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হচ্ছে মানবদেহধারী খ্রিস্টের নিগূঢ় রহস্যে জীবনযাপন করা এবং ক্ষুদ্রদের মাঝে ক্ষুদ্র হয়ে বাস করা।

সংঘের মিশনকর্ম

মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের ভগ্নিগণ যে-সকল মিশনকর্মে নিয়োজিত তা হল: ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পরিবার পরিদর্শন ও ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান ও গঠন; দরিদ্র ছেলেমেদের জন্য স্কুল, হোম ও হোস্টেল পরিচালনা ও শিক্ষাদান করা; রোগী-পরিদর্শন, প্রতিবন্ধীদের সেবা, নার্সিং এবং স্বাস্থ্যসেবা; খ্রিস্টবাণী প্রচার, ধর্মপ্রদেশের প্রয়োজনীয় পালকীয় সেবাকাজে সহযোগিতা প্রদান, ইত্যাদি।

সংঘের আশ্রমগৃহ

সংঘের গোড়াপত্তনের পর থেকে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাত্রীর সুযোগ্য পরিচালনায় সংঘের ভগ্নিদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর পাদ্রীশিবপুরে প্রথম একটি আশ্রম খোলা হয়। পরবর্তীতে সংঘের কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় ও ভগ্নিদের প্রচেষ্টায় সংঘের ভগ্নিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, বর্তমানে তিনটি ধর্মপ্রদেশে মোট আটটি আশ্রমগৃহে অবস্থান ক'রে, মণ্ডলীর সেবিকা সংঘের ভগ্নিগণ বিভিন্ন প্রৈরিতিক সেবাকাজে নিয়োজিত আছে। তাছাড়াও রয়েছে সংঘের মাদার হাউজ, প্রার্থীগৃহ ও নবিশিয়েট।

(পেছনের কাভার)

BIO – DATA OF
MOST REV. RAYMOND LAROSE ,CSC

Born:	January 10, 1897 in St. Paul Abbosford, Quebec, Canada in the Diocese of St. Hyacinthe, Quebec, Canada.
Parents:	Octave Larose and Rose – Anna Stebbins
Education:	Primary: St. Paul Abbotsford School, Quebec, Canada Higher Studies: Holly Cross Juniorate, St. Laurent : 1916 St. Laurent College, Montreal Quebec, Canada : 1914-22
Novitiate:	July 22, 1917 at Ste, Genevieve, Quebec, Canada
First Profession:	July 22, 1919
Theology/D.D:	Laval University Major Seminary, Quebec, Canada: 1922-26
Ordained:	February 7th, 1926, by Bishop Langlois, at the Cathedral of Quebec City, Canada
Arrived of Bengal: December 1926	
1927:	Asst. Priest- Gournadi, Noakhali
1928 – 1946:	Parish Priest, Narikelbari
1947-1952:	Parish Priest, Gournadi
1938- 1950:	Religious Superior
March 20, 1952:	Nominated Bishop of Chittagong
July 2, 1952:	Consecrated Bishop of Chittagong
Consecrator:	Archbishop L.L Graner, Archbishop of Dhaka
Co- Consecrators:	Bishop Joseph Obert of Dinajpur, Bishop Stephen Fernando of Shillong
Coat of Arms :	TO THE LIGHT THROUGH CHARITY
1967:	Letter of Resignation and acceptance, Titular See of Thysdrus
1968:	Rangamati: Parish Priest/Prayer life
1975- 1982	Padrishibpur: Life of Contemplation and Apostolate of Prayer
1983:	Bishop`s House, Chittagong
May 17, 1984:	Died and buried in Chittagong